২০১১ সাহিত্য অকাদেমি যুবা পুরস্কৃত
বিনোদ ঘোষাল
ডানাওলা মানুষ

বাংলা আধুনিক ছোটগল্পের জগতে
বিনোদ ঘোষাল পরিচিত নাম।
লেখালেখির বয়স বেশি নয়, কিন্তু খুব
স্বল্পসময়ের মধ্যেই তিনি পাঠকের
কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছেন।
বিনোদের গল্পের মূল উপজীব্য আলো
নয়, অন্ধকার। আনন্দ নয়, আধুনিক
মানুষের একাকীত্ব, অসহায়তা।
সেই অর্থে বিনোদ ব্ল্যাক স্টোরি রাইটার।
এই সময়ের মানুষের কথা তাঁর কলমে
বড় নির্মমভাবে উঠে আসে। তাঁর লেখার
সব থেকে বড় গুণ হল পাঠযোগ্যতা।
পাঠক তার লেখা একবার পড়তে শুরু
করলে ছাড়তে পারবেন না। এই
সংকলনের গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে
আমাদের মতোই খুব সাধারণ
মানুষদের কথা। অথচ তার আবেদন
কলমের মুন্‌শিয়ানায় হয়ে উঠেছে
বিশ্বজনীন।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বইটি অর্জন করে
সর্বভারতীয় সাহিত্য অকাদেমির প্রথম
যুবা পুরস্কার।

ডানাওলা মানুষ

বিনোদ ঘোষাল

ডানাওলা মানুষ

২০১১ সাহিত্য অকাদেমি যুবা পুরস্কৃত

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম পত্র ভারতী প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫

DANAOLA MANUS
A Collection of Bengali Short Stories
Awarded Sahitya Akademi 'Yuba' in 2011
by
Binod Ghoshal

ISBN 978-81-8374-334-1

প্রচ্ছদ গৌতম দাশ

অলংকরণ রাজীব পাল

মূল্য
২৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com *website*
www.bookspatrabharati.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
Price ₹ 250.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বাবাকে

লেখকের কথা

আমাদের বাড়িতে ড্রেসিং টেবিলে বাবার একান্ত নিজস্ব একটি ড্রয়ার ছিল। তার চাবি থাকত বাবা পইতেয় বাঁধা। মাঝেমধ্যে ওটা খুলে গোপনে কী সব খুটখাট করত। আমার, মা-র, দিদির কারও অধিকার ছিল না সেই ব্যক্তিগত দেরাজে উঁকি দিই। ছোট্টবেলা থেকে আমার ভীষণ কৌতূহল ছিল দেরাজটির ভেতর কী আছে জানার। কিন্তু কোনওদিন সেই সুযোগ মেলেনি। শ্মশানে বাবার শরীর থেকে চাবি সমেত পইতেটা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। ঘাটকাজের দিন রাত্রে হঠাৎ চাবিটার কথা মনে পড়ল। ড্রয়ারটা খুলতে গিয়ে কেমন শিরশির করেছিল আমার গোটা শরীর, মনে হচ্ছিল এই যেন বাবা ধমকে উঠবে। খুললাম ওটা। বাবার গায়ের গন্ধ দেরাজটার ভেতর। হাত বাড়িয়ে একে একে বার করতে থাকলাম কিছু পুরোনো তামার পয়সা, ঠাকুর-দেবতার ছবি, কিছু পুরোনো চাবি যাদের তালা নেই, কয়েকশো টাকা, বাবার নিজের লেখা একটা ডায়েরি আর...আর ক্লিপে আটকানো একগাদা বিভিন্ন মাপের খাতার, ডায়েরির কাগজ।

যে লেখাগুলো আমি লিখে অপছন্দ হত বলে দলা পাকিয়ে ঘরের এখানে-ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম—বাবা কখন যে সেগুলোকে আমার আড়ালে তুলে নিয়ে নিজের প্রিয় দেরাজে যত্ন করে রেখে দিত। সেজন্যই কি আমাকে মাঝেমধ্যে বলত, ভালো না লাগলেও ফেলিস না কোনওদিন কাজে লাগবে। কেন জানি না তারপর থেকেই বোধহয় আমি কোনও লেখা পছন্দের না হলেও ফেলি না, কোথাও রেখে দিই। নিজের বইয়ের ভূমিকা লিখতে বসে আচমকা সবার আগে কেন কে জানে এই ঘটনাটাই মনে পড়ল! আর কী লিখব ভূমিকায়?

ছোট থেকে শখের নাটক (পরে গ্রুপ) আর ছবি আঁকতেই ভালোবাসতাম। আর একটু বয়স বাড়ার পর ছবি আঁকা কমে গিয়ে কবিতা এল। তারা স্রেফ ডায়েরির মধ্যেই থাকত। কোনওদিন সূর্যের আলো দেখেনি। কলেজ পাশ করে বন্ধুরা সব দু-বেলা পাড়ার রিকশা স্ট্যান্ডে রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে বিড়ি টানি আর আড্ডা দিই। আমাদের এক বন্ধুর মা মারা গেল। ক্যান্সার হয়েছিল। খুব সুন্দর দেখতে ছিল কাকিমাকে। হাসপাতাল থেকে যখন বাড়িতে আনা হল তার মৃতদেহ, তাকিয়ে দেখি চেনা যাচ্ছে না। মৃত্যুর পর কাকিমার অমন সুন্দর মুখটা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। সহ্য হয়নি আমার দৃশ্যটা। তারপর শ্মশানে গেছি। কাকিমাকে দাহ করে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু মাথার ভেতর কী যেন একটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। কী সব যেন বলার জন্য ভেতর থেকে ঠেলা দিচ্ছে। ক'দিন পর গলগল করে বেরিয়ে গেছিল একটা লেখা। গল্পই। লিখে বেশ হালকা লাগল। পড়েই রইল লেখাটা। তার বেশ কিছু কাল পর

আমার এক দাদা স্থানীয় সাহিত্যিকবন্ধু আমাকে নিয়ে গেল এক সাহিত্যসভায়। বলল নিজের কোনও লেখা থাকলে নিয়ে আসবি। পড়বি।

কোনও লেখা তো নেই। মনে পড়ল ওই লেখাটা। ওটাই নিয়ে গেলাম। পড়লাম। সবার ভালো লাগল। বলল 'দেশ' পত্রিকায় পাঠাতে। পাঠিয়ে দিলাম। মাসে কয়েকের মধ্যে ছেপেও গেল সেটা। আমার প্রথম গল্প, 'একটু জীবনের বর্ণনা'। যেদিন দেশ পত্রিকার চিঠি এসেছিল বাড়িতে, বাবার সে কী আনন্দ! বার বার চিঠিটা খুলে পড়েছিল। হাতে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করেছিল। সেই থেকেই শুরু। সেটা দু-হাজার তিন সাল।

কী লিখতে চাই। কেন লিখি। এই সব প্রশ্ন নিজেকে করলে উত্তর পাই না। ভেতরটা চুপ মেরে থাকে। সারা দেয় না। কাজেই ওসব প্রশ্ন থাক। শুধু এটুকু মনে হয় আসলে আর সব মানুষের মতন আমিও বড় অসহায়। আর সেই অসহায়তাটা বার বার নানাভাবে নিজের কাছে লুকোতে গিয়ে বার বারই ধরা পড়ে যাই। এই কষ্টটাই মাঝেমধ্যে লিখে ফেলি। খুব যে লিখতে পারি তা নয়। চেষ্টা করি।

কৃতজ্ঞ থাকব সেই সব পাঠকদের কাছে, যারা একবারের জন্য হলেও আমার প্রথম বইটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন, কিংবা চোখ ছোঁওয়ালেন। অথবা এসব কিছুই করলেন না।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

ডানাওলা মানুষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব নিলেন খুব স্বাভাবিকভাবেই পত্র ভারতীর ত্রিদিবদা। 'খুব স্বাভাবিকভাবেই' এই কারণে বললাম, প্রকাশক এবং সুলেখক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় আমার মতো তরুণ লেখকদের উৎসাহ দিতে সবসময় একপা এগিয়ে। সব থেকে বড় কথা একজন তরুণ লেখকের বই প্রকাশ করার আগেও সেই বই নিয়ে তার ভাবনা-চিন্তা এবং যত্ন দেখবার মতো।

এই বইয়ের নতুন সংস্করণ নিয়েও অনেক আলোচনা পরিকল্পনা তার সঙ্গে সাক্ষাতে এবং টেলিফোনে হয়েছে। কীভাবে বইটিকে আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করা যায় সে বিষয়ে তাঁর ভাবনা আবারও আমাকে অবাক করেছে।

বইটি নতুন চেহারায় প্রকাশিত হল। পাঠকদের ভালো লাগলে কৃতিত্ব অবশ্যই প্রকাশকের।

কলকাতা বইমেলা ২০১৫
নবগ্রাম, হুগলি

বিনোদ ঘোষাল

সূচিপত্র

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের বই

মাঝরাস্তায় কয়েকজন

একটু জীবনের বর্ণনা

খাটে শোয়ানো মাকে কাঁধে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে দাঁড় করানো ম্যাটাডোরে তোলবার সময় রমিত একঝলক মেয়েটাকে দেখতে পেল। আত্মীয়-প্রতিবেশীদের মতোই মুখটা তার থমথমে হলেও চোখ দেখে কাঁদেনি বোঝা গেল।

বুবাই বলল, 'ডেথ সার্টিফিকেটটা নিয়েছিস তো?'

রমিত বলল, 'মামার কাছে আছে।'

'কই মামা? ওটাকে কয়েক কপি জেরক্স করে নিতে হবে', বলে বুবাই মামাকে খুঁজতে চলে গেল।

রমিত ম্যাটাডোরে উঠতেই জামাইবাবু বললেন, 'মা-র মাথার কাছটায় বসে হাতটা ছুঁয়ে থাক।'

আজকে সবাই কেমন যেন রমিতকে একটা বিশেষ খাতির করছে। মা মারা গেলে মানুষ কি হিরো হয়ে যায়? অটোগ্রাফ চায়? সকালের প্রথম দিকটায় সবার কাছ থেকে এমন একটা এক্সট্রা কেয়ার বেশ অস্বস্তি লাগছিল

রমিতের। এখন অনেকটা সয়ে গেছে। বুকের ভেতর দুঃখের গুমগুম শব্দটার ফাঁকে-ফোঁকরে পরিজনদের এই আলাদা নজরটায় একটা অদ্ভুত নরম নরম ভালো লাগছে। তিরিশ বছর বয়সেও যে ছেলে পাঁচ-ছ'টা টিউশনি ছাড়া কোনও চাকরি-বাকরি জোটাতে পারে না, তার যে অন্য কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করতে নেই, রমিত সেটা জানে। করেও না। দুটো সেলসম্যানের চাকরি করেছিল কিছুদিন। প্রথমটা ছিল নাইলনের ঝাঁটা আর ফিনাইল বিক্রি। মাসিক বারোশো। এক মাস ধরে ডোর-টু-ডোর পাবলিকের খিস্তি শোনার পর মজুরিটা খুব কম মনে হতে ছেড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়টা আঠেরোশো। ওয়াটার পিউরিফায়ার। শৌচাগার নিঃসৃত জলও মিনারেল ওয়াটার বানিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টিযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচ দিন দুপুরবেলা কলকাতা চাটবার পর পঞ্চাশ দিন জন্ডিস আঁকড়ে শুয়েছিল। আর যায়নি।

'হ্যাঁ রে, কাকু কেমন আছেন?' দীপু জিগ্যেস করল।

'আছে। দিদি আর ছোটকাকু রয়েছে কাছে।'

বাবা যে ঠিক কেমন আছে সেটা বোঝার ক্ষমতা একমাত্র ডাক্তারেরই রয়েছে। গত বছর ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন তুলে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে পড়ে গিয়ে প্যারালাইসিস। কথা বলার শক্তিটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারে। দৃষ্টিটাও কেমন যেন অসার, শূন্য। বাবা বুঝছে হয়তো সবই। শুধু প্রকাশের ক্ষমতা নেই। মানুষ কি ভেতরে ভেতরে চোখের জল ফেলে কাঁদতে পারে? পারলে ভালো হয়। অন্তত বাবার মতো মানুষের।...আবার মেয়েটা। ম্যাটাডোরে মাকে ছুঁয়ে থেকে দেখতে পেল রমিত। মেয়েটা একবার রমিতের দিকে তাকাল। তারপর অদূরে দাঁড়ানো নীল রঙের মারুতি ভ্যানটায় উঠে বসল। তার মানে শ্মশানে যাবে। আশ্চর্য, কথাটা ভেবে ভালো লাগছে কেন রমিতের? গাড়িটা বড়কাকুর। তা হলে কাকুর কেউ হবে কি? মুখটা আগে কখনও দেখেছে কি না একবার মনে করবার চেষ্টা করলও। না, মনে পড়ছে না। ধু-স্-স্ এখন এইসব...। তবে বড়কাকুর কেউ নাও হতে পারে। এই সময় তো সবাই সবার খুব আপন হয়ে যায়। ওই যে জামাইবাবু, সকাল ন'টা

থেকে এন্তার ভলান্টারি সার্ভিস দিয়ে চলেছেন, নইলে অন্য সময় এইরকম ফ্রিতে নিজের বউকে ভালোবাসেন কি না সন্দেহ। বড়লোক ঘরে বিয়ে হয়ে দিদিও এই বছর দুয়েকের মধ্যে কেমন যেন কাগজের ফুল হয়ে উঠেছে। রূপে অমর কিন্তু গন্ধ নেই। একটা হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ পরে এসেছে। কেন এসেছে? শোকের বাড়িতে এরকম হালকা রং মানায় বলে! এসব কথা এখন মাথায় আনতে ভালো লাগছে না। মা-র মুখে একটা মাছি বসেছে। হাত দিয়ে উড়িয়ে দিল রমিত। কটকটে রোদ্দুরটাও সটান মা-র মুখের ওপর। একটা ছাতা চাইবে কি না ভাবল ও। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরা চটপট উঠে পড়ল। পরপর দুটো গাড়ি চলতে শুরু করল। মা বোধহয় কনভয় মানে জানত না। জানলে ভালো লাগত। খাটের পাশে গোঁজা একগোছা ধূপ জ্বলছে। ধোঁয়ায় চোখ-মুখ জ্বালা করছে। রমিত মারুতির দিকে তাকাল। মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা কি দেখছে রমিতকে?...

'যাহ্, কাকিমার পায়ের ছাপটা নেওয়া হল না তো,' অয়ন বলল।

রমিত সামান্য ভুরু কুঁচকে বলল, 'উঁহু, এসবের দরকার নেই।'

জামাইবাবু ল্যাজ জুড়লেন, 'না-না ওসব আজকাল আর কেউ করে না।' আরও বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তখনই ওঁর বুকপকেটের মোবাইলটা বেজে উঠল। ওটাকে কানে তুলে—'হ্যালো...হুঁ...সাতটায়...ওকে' বলে রেখে দিলেন।

রমিত বুঝল জামাইবাবু সাতটার আগে কাট মারবেন। নিশ্চয়ই অফিসের মিটিং আছে। একজিকিউটিভ বলে কথা! নিজের এক্সপায়ারি ডেটের পরেও মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারে লোকটা। কথাটা ভেবেই ওর মুখটা মনে পড়ল। দুর, এসব কী হাবিজাবি ভাবছে ও! সুজয় খই ছিটোচ্ছে। খইয়ের মধ্যে খুচরো পয়সা মেশানো। একটু আগে বাড়ির পিছনে কয়েকটা বাচ্চা দৌড়োচ্ছিল। পয়সাগুলো তুলছিল। বেশিক্ষণ দমে কুলোয়নি, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে কখনও? রাস্তার ধারে একটা টিভির দোকানের সামনে একগাদা লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা ট্র্যাফিক সিগনাল না পেয়ে দোকানটার পাশে দাঁড়াতেই হঠাৎ 'আ-আ-উ-উ-ট' বলে ভয়ংকর চিৎকার

করে গাড়ির সামনেই ছেলে-বুড়োগুলো আনন্দে নাচতে শুরু করল। ওহ্ হো আজকে তো ইন্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান ডে ছিল। নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার কেউ আউট হয়েছে। রাস্তার রাস্তায় ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ। পনেরোই অগাস্টেও এত ঝোলে না। বন্ধুরা সবাই ম্যাটাডোর থেকেই যতটা সম্ভব ঘাড় নীচু করে দোকানের টিভিটার দিকে একবার তাকাতে চেষ্টা করল কে আউট হয়েছে জানার জন্যে।

সত্যিই বন্ধুগুলোকে খেলা দেখা ছেড়ে রমিতের সঙ্গে একপ্রকার বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে। খেলার দিনে মানুষের মারা যাওয়াটা যথেষ্ট অন্যায়ের।

নিমতলার গলিতে গাড়ি দুটো ঢুকতেই এতটা রাস্তার পরিবেশ যেন ঝুপ করে পালটে গেল। এই জায়গাটা ভারি অদ্ভুত! মানুষগুলো বোধহয় আজীবন দু-বেলা মৃত্যু দেখতে দেখতে হেদিয়ে গেছে। আর মনে দাগ কাটে না। ওদের গাড়ি দুটো শ্মশানের সামনে এসে দাঁড়ানোর পরেও আশেপাশের মানুষগুলো নির্বিকার। একবার ফিরেও তাকাল না। দিব্যি খালি গায়ে বসে মাটিতে গামছা পেতে তাস খেলছে। হ্যা হ্যা করে হাসছে। কালো কালো বাচ্চাগুলো হইহই করে ছুটোছুটি করছে। জামাইবাবু তাড়া লাগলেন, 'বুবাই তুমি আমার সঙ্গে কাগজগুলো নিয়ে অফিসে এসো। আর তোমরা বডি নামাও।'

বডি! গত পরশু দিনও জামাইবাবু মাকে 'মা কেমন আছেন?' জিগ্যেস করেছিলেন। ম্যাটাডোর থেকে লাফ দিয়ে নামার সময়ে জামাইবাবু একটু হড়কে গেলেন। পায়ে লেগেছে বোধহয়। চোখ-মুখ কুঁচকে অল্প খোঁড়াতে খোঁড়াতে বুবাইয়ের সঙ্গে অফিসের দিকে গেলেন। ওরা সবাই মাকে গাড়ি থেকে নামনোর সময় রমিত একবার আড়চোখে মারুতির দিকে তাকাল। মাসি, বড়কাকু, কাকিমা গাড়ি থেকে নামলেন। মেয়েটা...আসেনি। তবে যে...নাহ্ ওই তো নামছে। মাকে অফিসঘরটার সামনে রাখা হল। জামাইবাবু ততক্ষণে নিজের কাজ শেষ করে ফেলেছেন। উনি রমিতের কাছে এসে বললেন, 'এদিককার কাজ সব কমপ্লিট বুঝলি। এখন বাকি রইল কাজের জন্য চাল-কলা ওইসব আর তোর ধড়া।' বলে উনি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সুজয় তুমি পুরুতের কাছ থেকে কী কী লাগবে জেনে নিয়ে ওগুলো

কিনে ফেলো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। অনেক টাইম আছে, চুল্লিতে একটা বডি রয়েছে এখন। ওটার পর আমাদের। এই টাকাটা রাখো', বলে উনি দুটো একশোর নোট বার করে দিলেন। সুজয় টাকাটা নিয়ে অয়ন আর দীপুকে নিয়ে চলে গেল।

জামাইবাবুও পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে 'তুই এখানে থাক আমি আসছি একটু' বলে চলে গেলেন। রমিতেরও সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মা-র মাছে কেউ নেই। এই সময় বড়কাকুরা এলেন। সঙ্গে মেয়েটা।

'কী রে একা দাঁড়িয়ে আছিস? ওরা সব কোথায়?' মাসি জিগ্যেস করলেন।

'ওই জিনিসপত্রগুলো কিনতে গেল।'

মেয়েটা রমিতের থেকে মাত্র ফুট চারেক দূরে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে মেয়েটাকে কাছ থেকে ভালো করে দেখতে পেল ও। মাঝারি হাইট, ছিপছিপে চেহারা, একটা হলুদ রঙের সালোয়ার পরেছে। সাদা ওড়না। গায়ের রংটা বেশ ফরসা, চুলটা লালচে, মনে হয় হেনা করা। গরমে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। সত্যি আজকে গরমটাও পড়েছে সাংঘাতিক।...কিন্তু মুখের গড়নটা যেন...ধুস্‌স, আসলে আজকে সারাদিন ধরে মা-র মুখটা মনে আসছে বলে বোধহয় সবাইকে...। সত্যি, সামনে শুয়ে থাকা চোখে তুলসীপাতা নাকে তুলো গোঁজা মা-র ফ্যাকাশে মুখটা ভুলে থাকতে চাইছে রমিত। সেই ছোট্টবেলার নরম নরম মা...বুকের ভেতরটায় ঝং করে শব্দ হল। নাহ্‌, এখন ওসব ভাববে না ও। কান্না-টান্না পেয়ে গেলে বিচ্ছিরি ব্যাপার। মেয়েটা মাঝেমধ্যে ওর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। কেন? কে ও? এখন জিগ্যেস করে জানার উপায়ও নেই। অথচ কাকু, মাসি ওরা যেন টেরই পাচ্ছেন না মেয়েটা ওঁদের সঙ্গে রয়েছে। আদৌ আছে তো সত্যি সত্যি?...ধ্যার, ভুলভাল ভাবতে শুরু করেছে ও। একটু ঘুরে আসতে হবে।

'কাকু তোমরা একটু মা-র কাছে থাকো। আমি আসছি এখুনি' বলে মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে রমিত আস্তে আস্তে চুল্লির ঘরটার দিকে গেল। কেমন শিরশিরে শান্ত ঘরটা। একটা অদ্ভুত ওম ছড়িয়ে রয়েছে। ওখান

থেকে সরে এল রমিত। গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির প্রথম ধাপটার এক কোণে দুজন মাঝবয়সি লোক বসে দার্শনিক কথা আলোচনা করছেন, 'বুঝলে হে কেন যে মানুষ শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে আসে! সংসারে প্রতিটি মানুষই তো আজীবন ধরে শুধু পোড়ে। আবার যে কেন নতুনভাবে আয়োজন করে...।' যে ভদ্রলোক শুনছেন সম্ভবত তাঁরই বাবা কিংবা মা এখন চুল্লির ভিতরে রয়েছেন। ভদ্রলোক বেশ স্বাভাবিকভাবেই অল্প অল্প মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। চোখে-মুখে তেমন কোনও শোকের ছাপ নেই। এই বয়সে বাপ-মা মারা গেলে তেমন দুঃখ কেন লাগে না কে জানে! ভদ্রলোকের মাথা জোড়া টাক। ঘাটকাজে আর নতুন করে নেড়া হতে হবে না। রমিত গঙ্গার দিকে তাকাল। এখন গঙ্গাটা কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, শান্ত, গরিব বৃদ্ধদের বাইফোকাল চশমার মতো ঘোলাটে। ভালো লাগছে না। মা-র কাছে ফিরে এল ও।

জামাইবাবু আর বন্ধুরা এসে গেছে। এর মধ্যে আর একটা শরীরও এসেছে। এও মহিলা। দুটো শরীর পাশাপাশি রাখা। প্রায় একইরকম লাগছে দুজনকে। ওদের একটা মেয়ে একঘেয়ে সুরে কেঁদে চলেছে। চোখে জল নেই। ফুরিয়ে গেছে বোধহয়।

জামাইবাবু বললেন, 'খাটটাকে ধরো, এবার আমাদের নম্বর।' 'আমাদের নম্বর' কথাটা বিচ্ছিরি শোনাল। জামাইবাবু নিজেই এবার খাটের এক প্রান্ত ধরে কাঁধে নিলেন। কাকু-কাকিমার সামনে ওঁর ব্যস্ত ভাবটা যেন একটু বেশি বলে মনে হল। সবাই মিলে খাট তোলার সময় বুকের ভেতরটা আবার অসম্ভব থমথমে হয়ে উঠল রমিতের। মা চলে যাবে! একেবারে! মৃত এই শরীরটাকে ও আর জীবনে কক্ষনো দেখার ভীষণ ইচ্ছে হলেও দেখতে পাবে না। মাকে চুল্লির ঘরটার সামনে এনে ফুলমালাগুলো তুলে বাখারির মাচায় শোয়ানো হল। মাচার গাঁটগুলো উঁচু-নীচু ছুঁচলো। পুরুতমশাই রমিতকে পাশে বসালেন, তারপর আচমন করিয়ে মাটির খুরিতে খানিকটা কালো তিল, চাল আর কাঁঠালি কলা দিয়ে বললেন, 'এটাকে মাখো ভালো করে।'

রমিত আর মাকে সবাই গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে রমিতের। মেয়েটা রমিতের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

'নাও এবার এটাকে ছোট পিণ্ড বানাও। আর একটা পিণ্ড হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে মন্ত্র বলতে বলতে ডান হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝখান দিয়ে এমনি করে...।'

পুরুতমশাইয়ের কথা আর কানে আসছে না রমিতের। মা চলে যাবে। সম্পূর্ণ চলে যাবে! একটুও থাকবে না! কাছের বলে আর কেউ...। এতক্ষণ পাঁজরের ভেতর আটকে থাকা কালবৈশাখী প্রচণ্ডভাবে আছড়ে পড়ছে রমিতের গোটা শরীরে। সমস্ত শিরা-উপশিরা-তন্তু যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে...গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মাথা...হাড়...পাঁজর, তবু আশ্চর্য, জল আসছে না চোখে! সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ চোখ। তখনই এক ফোঁটা জল রমিতের ডান হাতের ওপর পড়ল। জল! তবে কি...মেয়েটা কাঁদছে! কাঁদুক, আপ্রাণ কাঁদুক। পিছনে তাকাল না রমিত, যদি মেয়েটা না কাঁদে?...যদি অন্য কোনও জল হয়?...তাহলে...।

তা না হলেও মা-র গলার ওপর চাল-তিল-কলার পিণ্ড, তা না হলেও মা-র হাতে-পায়ে-মুখে জবজবে ঘি। তারপরেও মা-র গায়ে একটুকরো সাদা থান, মা-কোমর থেকে লাল সুতোর বাঁধা মাদুলি খুলে নেওয়া। তারপরেও পাটকাঠির মুখে আগুন নিয়ে মাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে মা-র মুখের দিকে একবার তাকাল রমিত। কী ভয়ংকর হয়ে উঠেছে মুখটা! চেনা যাচ্ছে না। মানুষ মারা যাওয়ার পরেও অত অসহায় হয়ে ওঠে! আগুনটা মা-র মুখে ছোঁয়ানোর সময় চোখ দুটোকে প্রচণ্ডভাবে বন্ধ করে ফেলল রমিত। তারপর...আর নয়, লোহার চাকাগাড়ি করে মা গড়গড় করে চলে গেল হাঁ-করা আগুনমুখের দিকে। রমিত শেষ একবার, একবার শেষ তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই মা-র থানটায় আগুন ধরে গেছে। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কী প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগছে। পা দুটো থিরথির করে কাঁপছে। জামাইবাবু, বন্ধুরা সবাই রমিতকে ধরে বাইরে নিয়ে এল। গঙ্গার ঘাটের সামনে এসে জামাইবাবু বললেন, 'এখানে বোস। শরীর খারাপ করছে? চা খাবি?'

রমিত বলল, 'আমি ঠিক আছি। এখন কিছু খাব না। বরং বন্ধুদের কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। ওরা সেই সকাল থেকে না

খেয়ে রয়েছে।'

সুজয় আর অয়ন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমাদের জন্য ভাবতে হবে না তোকে।'

জামাইবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না, সেই সকাল থেকে খাটছ তোমরা। ছি-ছি, আমারও খেয়াল নেই। ভেরি সরি। এখানে ভালো রেস্টুরেন্ট কোথায় আছে জানো কেউ?'

দীপু বলল, 'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা কিছু খাব না এখন। আর তো ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার।'

কিন্তু ভয়ংকর লজ্জিত জামাইবাবু আরও পীড়াপীড়ি শুরু করাতে বুবাই বলল, 'ঠিক আছে, বরং একটু চা খাওয়া যাক।'

রমিতের কানের সামনে 'আর তো ঘন্টাখানেকের ব্যাপার' কথাটা ভনভন করছে। ছাপ্পান্ন বছরের জীবনটা মাত্র ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার!

অয়ন বলল, 'তোরা যা, আমি রমিতের কাছে থাকছি।'

রমিত বলল, 'যা না, কিছু হবে না, আমি ঠিক আছি।'

'বেশি দূরে যাস না কিন্তু কোথাও এখন' বলে জামাইবাবু ওদের চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। অদূরে কাকু-কাকিমা, মাসি বসে মা-র জীবনের সব খুচরো ঘটনা নিয়ে গল্প করছেন। সবক'টা গল্পেই মা-র মাহাত্ম্য মেশানো। বেশ হালকা মেজাজ এখন ওদের। গঙ্গাতেও সেই ন্যাতানো ঝিমোনো ভাবটা কেটে গিয়ে ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে ঘাটে বসে থাকা সেই বয়স্ক দুজনকে দেখতে পেল না রমিত। ওই দার্শনিক কথার ভদ্রলোক এখন থাকলে কি বন্ধুকে বলতেন, 'বুঝলে হে, মানুষের মৃত্যু শোক তৈরি করে না। পরিবেশ শোক তৈরি করে।' আসলে মৃত্যুতে শোক পাওয়া একটা ভদ্রতা, একটা সামাজিকতা। যার দায় শেষ হলে মানুষ...শুধু মানুষ কেন সবাই স্বস্তি পায়।...কিন্তু মেয়েটা? তাই তো, মা চুল্লিতে চলে চলে যাওয়ার পর আর দেখা যাচ্ছে না কেন মেয়েটাকে? এতক্ষণে মনে পড়ল রমিতের। কোথায় গেল? আশ্চর্য! তবে কি...নাহ্ ওই তো, ঘাটের সিঁড়ির একেবার ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রমিতকে দেখছে। গঙ্গার হাওয়ায় হলুদ সালোয়ারটা ওর শরীরটাকে আরও জড়িয়ে ধরেছে। চোখ সরিয়ে নিল রমিত। এখন এসব

ভালো লাগছে না। তবু একবার যদি মেয়েটা ওর কাছে আসত। যদি দুটো-একটা অতি সাধারণ সান্ত্বনার কথা...দুর! ভাববে না মেয়েটাকে। বরং বিচ্ছিরি হয়ে থাকা মনটাকে অন্য কিছু ভাবানো যেতে পারে।...উঁহু কোনও ভাবনাই জমাট বাঁধছে না। বাধ্য হয়ে আবার ঘাড় ফেরাল রমিত। যাহ্, আবার নেই।

জামাইবাবু, বন্ধুরা চা খেয়ে চলে এসেছে। কাকুদের জন্যও এনেছে। বুবাই একটা ভাঁড় নিয়ে রমিতের কাছে এসে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে নে চা-টা। ভালো লাগবে। বিস্কুট খাবি?' রমিত মাথা নাড়িয়ে না বলে ভাঁড়টা নিল। ঠান্ডা হয়ে এসেছে।

দু-চুমুকে শেষ ভাঁড়টা গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও ফেলল না। পাশের বটগাছটার নীচে তাকাল ও। সেখানেও চুল ওঠা রং ধোওয়া শনিঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে। ভাঁড়টাকে নিজের পাশে রেখে দিল। বুবাই ঘড়ি দেখে বলল, 'আর বেশিক্ষণ নেই। সময় হয়ে এসেছে। তুই বোস আমি একটু খবরটা নিয়ে আসছি।' বুবাই উঠে গেল।

আরও বেশ কিছুক্ষণ সময়। তারপর জামাইবাবু ডাকলেন, 'রমিত চলে আয়। হয়ে গেছে।'

রমিত উঠে এল। গরম চুল্লির গা ঘেঁষে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে মাটির কলসিতে করে লাল টকটকে নাভিকুণ্ডর ওপর জল ঢালার সময় বুকের ভেতরটা ভস্‌স করে উঠল রমিতের। সবাই একে একে জল দিল। তারপর পিছনে না তাকিয়ে কলসি ভেঙে দিয়ে গঙ্গামাটি চাপানো মালসার ওপর মা-র 'অস্থি' নিয়ে উঠে এল রমিত। এই সেই 'অস্থি' অর্থাৎ নাভিকুণ্ড। জীবনের যোগসূত্রটা কি এতই শক্ত যে ছ-হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসও তাকে পোড়াতে পারে না? তাহলে গোটা মানুষটা কেন থেকে যেতে পারে না আজীবন?

গঙ্গায় মালসাটা ভাসিয়ে দেওয়ার সময় রমিতের মনে হল আরও কত অযুত-নিযুত 'অস্তি' রাখা আছে এই গঙ্গার নীচে। মা-র সঙ্গে তাদের পরিচয় হবে। হয়তো ওদের সঙ্গে শুরু হবে মা-র নতুন জলজীবন। সেখানে সম্পর্কের কোনও নাম নেই। শুধু পরিচিতি।

'আর নামিস না। তিনটে ডুব দিয়ে উঠে আয়', কাকিমা বললেন। রমিতের

ডুব দেওয়ার অভ্যাস নেই। ডুব দিতে গিয়ে বারে বারে জল ওকে ঠেলে ওপরে তুলে দিচ্ছিল। নাক আঙুল দিয়ে চেপে কোনওমতে তিনটে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এল ও। ভিজে সাদা ধুতির ভেতরে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আড়চোখে দেখে নিয়ে কোমরে বাঁধা গামছাটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে রমিত। জামাইবাবু প্যাকেট থেকে থান বার করতে করতে বললেন, 'গামছাটা দিয়ে মাথাটা ভালো করে মুছে নে। নইলে অবেলায় চান করেছিস, ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।'

রমিত বলল, 'কাপড়টা পরে নিয়ে মুছছি।'

কাছা দিয়ে কাপড় পরার কায়দাটা খুব কঠিন। শেষে কাকুই পরিয়ে দিলেন। রমিত এই ফাঁকে চারদিক দেখে নিল। সবাই আছে মেয়েটা নেই। ভালো হয়েছে এখন নেই। না হলে অস্বস্তিতে পড়তে হত। ওদের সামনে দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রমিত ভিজে ধুতিটা ছাড়তেই 'কাকু কাপড়টা নেব?' বলে বাচ্চা দুটো হাত বাড়াল। জামাইবাবু ধমক লাগালেন। কাকু বললেন, 'যাক গে নিক, ফেলেই তো দিতে হবে।'

ওরা দুজনে কাপড় নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে ছুট। ধড়া নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর জামাইবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, 'এবারে সব যাওয়া যাক তাহলে।'

রমিতের এই গ্রীষ্মের বিকেলেও বেশ শীত শীত করছে। মাথাটা ভালো করে মোছা হয়নি। কপালে সামনের চুল থেকে টুপটুপ করে জল ঝরছে। ম্যাটাডোরে ওঠার সময় গাড়িটা কেমন খালি খালি লাগল। সবাই আছে শুধু মাঝখানে রাখা সেই খাটটা নেই। রমিত কাকুদের মারুতির দিকে তাকাল। মেয়েটা উঠেছে নিশ্চয়ই। হাওয়া লেগে মাথাটা টিপটিপ করে ব্যথা করছে।

জামাইবাবু বললেন, 'বাড়ি গিয়ে রাত্তিরে মা-র একটা ভালো দেখে সিঙ্গল ফাটো বার করে রাখবি। কালকেই বাঁধাতে দিয়ে দেব।'

ফ্ল্যাটে ফেরার পর কাটারি ছুঁয়ে নিমপাতা দাঁতে কেটে আর একটা করে রসগোল্লা খেয়ে বন্ধুরা বাড়ি চলে গেল। ঘর ভরতি ফ্ল্যাটের লোকজন। রমিত প্রথমেই বাবার ঘরে ঢুকল। বাবা একইভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

বাবার মুখের কাছে ঝুঁকে তাকাল রমিত। ভাবলেশহীন চোখ দুটোর কোণে কোনও জল জমে রয়েছে কি না দেখল ও। তারপর নিজের ঘরে গেল।

দুই

রাত্তির প্রায় সাড়ে এগারোটা। সারা দিনের ধকলের পর সবাই শুয়ে পড়েছে। আজকে কোনও ঘরে টিউব নেভেনি। আলো জ্বালিয়েই শুয়েছে সবাই। কেন! ভয়েতে? শ্মশানের পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের সময় 'প্রেত' শব্দটা বার কয়েক উচ্চারণ করেছিলেন। কানে হুল ফোটাচ্ছিল শব্দটা। ছোট থাকলে রমিত ঠিক বলে দিত—'আমার মা প্রেত নয়।'... কিন্তু বাড়ি ফিরে মেয়েটাকে আর একবারও দেখা গেল না কেন? কাকিমা বা মাসিকেও জিগ্যেস করার উপায় নেই। জিগ্যেস করলেই হয়তো বলবে 'সত্যিই তোর এই সময়ও মেয়ের খোঁজ!' অথচ ওরা নিজেরাও একবার মেয়েটার কথা বলল না। কেন?—ধ্যাত্তেরি, হাবিজাবি চিন্তায় ঘুম আসছে না। ওহ্ হো, মা-র ছবিটাই তো বার করা হয়নি। কাল সকালে বাঁধাতে দেওয়া হবে। অ্যালবাম বাবার ঘরের আলমারিতে। রমিত বাবার ঘরে গেল। শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে মানুষটা। রমিত আলমারি খুলে অ্যালবামটা বার করে মেঝের ওপর বসল। বেশিরভাগই দিদির বিয়ের ছবি। মা-র কোনও সিঙ্গল ছবি নেই। সবই গ্রুপের মধ্যে। আর কয়েকটা নৈনিতাল বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল যেবার, তখন তোলা। সেখান থেকে একটা মাত্র মা-র একার ফটো পাওয়া গেল। কিন্তু সস্তার ক্যামেরায় তোলা ছবিতে মা-র মুখটা খুব ছোট। মৃত মানুষের শুধু মুখটুকু প্রয়োজন। যেটা মনে আসে। মনে থাকে। শরীরের আর দরকার নেই।

আচ্ছা আর একটা অনেক পুরোনো অ্যালবাম ছিল না? কোথায় সেটা? আলমারির ভেতর মা-র শাড়ি, বাবার ধুতি-পাঞ্জাবি ঘেঁটেঘুঁটেও পেল না রমিত। শেষে কী মনে করে লকার খুলে দেখতে পাওয়া গেল ওটাকে, লকারে অ্যালবাম, কত দামি!

অ্যালবামটা মোটকা, কালো রঙের। কেমন একটা পুরোনো পুরোনো গন্ধ

মেশানো। শেষ এটাকে কবে দেখেছে মনে পড়ল না রমিতের। অনেক ছোটবেলায় দেখে থাকবে হয়তো। পাতা ওলটাতে শুরু করলও। সবই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ঠিক হোয়াইট আর নেই। ফিকে হলুদ হয়ে গেছে। পাতায় পাতায় বাবা-মা-র বিয়ের ছবি। অনেক অচেনা মুখও দেখতে পেল ও। হনিমুনে পুরী যাওয়ার ছবিগুলো পাতা উলটে দেখতে দেখতে একটা পাতার বাঁ-দিকের পৃষ্ঠায় একটা ফটো দেখে যেন মগজে হঠাৎ চাবুক খেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল ও। এ কে! এ যে...এ যে সেই মেয়ে যাকে আজ সারাদিন ধরে রমিত দেখে এসেছে। সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা। হয়তো বাবাই তুলেছিল। সমুদ্রের হাওয়ায় সালোয়ারটা শরীরটাকে আরও জাপটে ধরে বুক আর...। ঠিক সেই মেয়েটা যখন গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে রমিতকে দেখছিল তেমনিভাবে। হাত-পা কাঁপছে রমিতের। ও আস্তে আস্তে কালো পাতা থেকে ফটোটাকে খুলে আনল। ছবিটার গা ছোঁওয়া মাত্র হাতটা কেমন শিরশির করে উঠল রমিতের। ফটোর পিছনে কী যেন লেখা। পড়ল রমিত। 'আমার মিষ্টি সোনা তপু'। বাবার হাতে লেখা। নীচে লেখা 'ইস, মিষ্টি সোনা, না ছাই'। মা-র হাতের লেখাটা কোনওদিনই ভালো ছিল না। মিষ্টি বানানটাও ভুল লিখেছে। বাবার দিকে তাকাল রমিত। এই সেই লোক। ফ্যানের হাওয়ায় সাদা চুলগুলো উড়ছে। চোখের পাশে চামড়ার ভাঁজ। ঠোঁটের কোণে লালা জমে উঠেছে ঘুমের মধ্যে। এই সেই বিছানা, হয়তো এমনই কোনও রাত্রে মা আর বাবা বিছানায় শুয়ে এই ছবি নিয়ে খেলতে খেলতে লিখেছিল। ফটোটাকে অ্যালবামে আটকাতে গিয়ে পরের পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় তাকাল রমিত। ওর নিজের খুব ছোটবেলার ছবি। চোখে মোটা কাজল, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে। মা-র আর ওর ছবি দুটো মুখোমুখি। অ্যালবামটা বন্ধ করতে করতে রমিত দেখতে পেল মা নয় সেই মেয়েটা রমিতের বাড়ানো হাত দুটোর মাঝখানে চলে আসছে।

দেশ
জুন-২০০৩

শূন্যস্থান

সকালে বিছানা ছেড়ে মাটিতে পা রাখতে গিয়ে শিউরে উঠল বিজন। সঙ্গে সঙ্গে পা তুলে নিল। ভাবল মনের ভুল। আসলে এখনও হয়তো স্বপ্ন দেখছে। প্রকৃত ঘুম থেকে ওঠেনি। চোখদুটো চিপে বন্ধ করে আবার খুলল, ইচ্ছে করে কাশল দুবার। স্পষ্ট শুনতে পেল নিজের সর্দিবসা বুকের ঢংঢং কাশির শব্দ। তার মানে সত্যিই সে জেগেছে। আবার নিশ্চিন্তে পা ফেলতে গেল মেঝেতে। একই শিহরন!

পা দিয়ে জোরে চাপ দিতে চেষ্টা করল নীচের দিকে। কিছুতেই হচ্ছে না! হচ্ছেই না! মেঝেতে পা পৌঁছোচ্ছে না কিছুতেই। মাটি থেকে ঠিক ইঞ্চি কয়েক ওপরে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। আর একটা পা নামিয়েও দেখল। একইরকম। নিজের শরীরটাও মনে হচ্ছে বিছানার ওপর আলগাভাবে বসানো। কোনও ভয় নেই। এটা কি গতরাতের টিচারসের খোয়ারি?...নাহ্, হতেই পারে না, কাল রাতে অনীক ট্রিঙ্কাসে ট্রিট দিয়েছিল। আইটিও, যে মাসে অতিরিক্ত বাঁহাতি হয়ে যায়, সে মাসের শেষের দিকে যেকোনও একদিন

কলকাতার এক একটা বারে বন্ধুদের ট্রিট দেয়। কাল রাতে ক'পেগ নিয়েছিল মনে করার চেষ্টা করল বিজন।...উঁহু, চারের বেশি নয়। এটুকু তরল বিজনের পাকস্থলী প্রায় গ্রাহ্যই করে না।

'ধ্যাস শা-হ্ যা হয় হবে' বলে দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ দাঁড়াল, তবে মাটিতে নয়, মাটি থেকে ইঞ্চি কয়েক ওপরে বা শূন্যে। আচমকা মাথাটা ঘুরে গেল। বিছানায় বসে পড়ল বিজন। এসব কী! সামনের দিকে তাকালেই দেখল টিভিটা মিউট হয়ে চলছে। তার মানে সারারাত চলেছে। রাত্রে দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়ালই নেই। বালিশের পাশে রাখা রিমোটটা হাতে নিয়ে সুইচ অফ করতে গিয়েও কী খেয়াল হতে চ্যানেল সার্ফ করতে শুরু করল। এমনিই। একটা বাংলা নিউজ চ্যানেলে হঠাৎ চোখ আটকে গেল। গোটা শহর জুড়ে হুলস্থুল কাণ্ড! সমস্ত মানুষ বিজনের মতোই মাটি থেকে ওপরে ভাসছে। কারও পায়ের নীচে মাটি নেই। টিভিতে সাউন্ড দিল। লাইভ বলে নীচে লেখা। রিপোর্টার সাংঘাতিক উত্তেজিত, গলগল করে বলে যাচ্ছে, '...এ এক আশ্চর্যজনক ঘটনা, গোটা পৃথিবীজুড়ে মাধ্যাকর্ষণ বল কোনও অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ অস্বাভাবিক মাত্রায় কমে গেছে। অবশ্য কমে গেছে বলা ভুল। সমস্ত জড় পদার্থ, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে একইরকম রয়েছে, শুধু মানুষের ক্ষেত্রে আকর্ষণ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে পৃথিবী। এখনও পর্যন্ত এর যথাযথ কারণ...' টিভি অফ করে দিল বিজন। প্রথমে হাসি পেল তার পরেই তীব্র বিরক্তি। আজকের প্ল্যানটা তার মানে ভোগে! বিষণ্ণ হয়ে উঠল মনটা। 'শাল্লা, হারামি, ম্যাজিক দেখানোর আর দিন পেলি না' বলে মেঝেতে জোরে লাথি মারতে গেল। ছিটকে ওপরে উঠে গেল পা। কুঁচকিতে খিঁচ লাগল। কী করা উচিত বিছানা ছুঁয়ে বসে বা বসার মতো হয়ে ভাবল বেশ কিছুক্ষণ।

মাস কয়েক ধরে ফেলে রাখা টোপ যখন আজকের দিনে মাছ সবে গিলতে আসার কথা ছিল সেদিনই। আজ শনিবার, রোজি পাত্রর সঙ্গে গাদিয়াড়া যাওয়ার দিন। বিজন কর্মকার নামকরা এমএনসি-র সিনিয়র সেলস ম্যানেজার। বয়স চৌত্রিশ। গড়িয়াহাটে কোম্পানির দেওয়া বারোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে একা। ঠিক একা নয়, রবি নামে একজন কুক কাম সারভেন্ট

এবং আলম নামে ড্রাইভার। রোজি পাত্র সেল্‌স এক্সিকিউটিভ। মাস ছয়েক আগে চাকরিতে জয়েন করেছে। বিজনই ইন্টারভিউ নিয়েছিল। বয়স ছাব্বিশ (দেখতে আরও বছর দুয়েক কম মনে হয়), ফিগার, চামড়ার কালার, দাঁত, মাড়ি, হাত, বুক পেট, বগল সব কিছু ঠিকঠাক। রাজি হতে বড্ড বেশি সময় নিয়ে নিল মেয়েটা। এর আগেরজনেরা কেউই এত টাইম নেয়নি। বড়জোর মাস দুয়েক। বিছানায় শুধু একটাই প্রবলেম হয় বিজনের। সবক'টা মেয়েকেই মনে হয় এক। আর নিজেকে প্রত্যেকের সঙ্গে অন্য একজন। মানে এক-একটা মেয়ের সঙ্গে এক-একটা বিজন। এর ফলে একই বিজনের ভ্যারাইটি টেস্ট নেওয়ার অহংকারটা ঠিকমতো হয়ে ওঠে না। এর জন্যে একবার সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবে ঠিক করেছিল। এখনও হয়ে ওঠেনি। রোজি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে। যেভাবে সকলে হয়। কিন্তু বিজনের ফ্ল্যাটে নয়। এ পাড়ায় নাকি ওর কোন রিলেটিভ থাকে। অন্য কোথাও রাজি। সকাল আটটায় রবীন্দ্রসদনের সামনে থেকে ওকে পিক আপ করার কথা। মোবাইলটা সুইচ অন করল বিজন। স্ক্রিনে দুটো হাত পরস্পরকে ছুঁয়ে চালু হল মোবাইল। নাম্বার ডায়াল করার আগে রিমোটে চ্যানেল পালটাল টিভির। একটা ইংলিশ চ্যানেলে দুজন বিশেষজ্ঞ আলোচনায় বসেছেন। ডঃ রবসন নামে নিগ্রো এক পরিবেশ-বিজ্ঞানী দু-হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আসলে দূষণ, দূষণ, আমরা বহুদিন ধরে সাবধান করে আসছি মানুষকে। কেউ শোনেনি। এতদিন ধলে জলে, হাওয়ায়, মাটিতে আকাশে বিষ ঢেলে ঢেলে পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছি আমরা। ইট ইজ এ রিভেঞ্জ'। শেষ শব্দটা বেশ প্রিয় বিজনের। রিভেঞ্জ। কেন কে জানে, এমনিই।

ভূ-বিজ্ঞানী (নামের উচ্চারণটা মনে মনে করার আগেই স্ক্রিন থেকে লেখা উঠে গেল) পালটা প্রশ্ন করলেন, 'রিভেঞ্জ বলছেন কেন। কোনও কারণে পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'বেশ, যদি তা-ই হয় তবে শুধু মানুষের ক্ষেত্রে কেন? গাছ-পশু-পাখি অন্য কোনও কিছুর থেকে তো এতটুকু আকর্ষণ যায়নি।'

'সেটা হতে পারে মানুষের শারীরিক গঠনের কোনও বিশেষত্বের...' কচকচি একদম ভালো লাগছে না। টিভি বন্ধ করে দিল বিজন। রোজির

ফিগারটা একঝলক চোখের সামনে ভেসে উঠল। নাম্বার ডায়াল করল। কানে কিছুক্ষণ কিশোর কুমারের 'রিম ঝিম গিরে সাওয়ান' হওয়ার পর রোজির আরও সুরেলা 'হ্যাঁ স্যার মর্নিং'।

'হ্যাঁ মর্নিং, কী নিউজ তোমার?'

'একইরকম অবস্থা স্যার, কী যে হচ্ছে কিছু মাথায় ঢুকছে না।'

'যাবে আজকে?'

'শিওর স্যার। আমার কোনও প্রবলেম নেই, মানে আমি বাড়িতে আজকের জন্য ম্যানেজও...'

'ওকে ওকে, আমারও কোনও প্রবলেম নেই। দেন ডোন্ট বি লেট।'

'আচ্ছা স্যার।' শব্দদুটোয় দুখানা বড় নিশ্বাস ফেলে রাখা ছিল মনে হয় বিজনের। চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে। বাথরুমে ঢুকে কমোডে কিছুক্ষণ বৃথা নিষ্ফল সময় কাটিয়ে ভালো করে দাঁত ব্রাশ, তারপর শাওয়ারের নীচে। আপাদমস্তক অনেকক্ষণ নিজেকে ধুল বিজন। সময়ের পর সময় পার করে চান করতে কী-ই যে ভালো লাগে! মনে হয় কী সব যেন ধুয়ে ধুয়ে যায়। এটাও কি কোনও মনোবিকার? পাক্কা চল্লিশ মিনিট ধরে স্নান সেরে ড্রেস আপ। টেবিলে ব্রেকফাস্ট লাগিয়ে ঘরের কোণে শূন্যে দাঁড়িয়ে ছিল রবি। চোখে-মুখে আতঙ্ক। বিজন ভাসতে ভাসতে টেবিলের সামনে এসে রবিকে হেসে জিগ্যেস করল, 'কী হল, এত ভয় করছে!'

'ভগবানের অভিশাপ স্যার, এত পাপ চান্দিকে...'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা নেই।' রবি হাওয়ায় পা ঠেলতে ঠেলতে কিচেনে চলে গেল। স্যান্ডুইচ আর জুস খেয়ে টুকটাক কয়েকটা জিনিস কিটে ভরে নিয়ে নিজের স্যান্ট্রোয় করে পনেরো মিনিটের মধ্যে রবীন্দ্র সদন। আজ আলম নয়, বিজন নিজেই ড্রাইভ করছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা প্রায়। দোকানপাট বেশিরভাগই বন্ধ। সব মানুষ কি আতঙ্কে? মজা লাগল বিজনের। রাস্তায় যে ক'টা লোক দেখল সবাই মাটি থেকে প্রায়ই ইঞ্চি কয়েক উঁচুতে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ হাঁটছে। ঠিক হাঁটা নয়, হাঁটার মতো করে শরীরটাকে কোনওমতে সামনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। একজন মাঝবয়সি লোক আজকের দিনেও সকালে কুকুরকে হাগাতে বেরিয়েছেন।

কুকুরটা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে উপযুক্ত জায়গার জন্য এখান-ওখান গন্ধ শুঁকছে। চারটে পা-ই মাটিতে। মালিকের হাতে চেন। পা দুটো শূন্যে। কুকুরের টানে দমকে দমকে এগিয়ে চলেছেন। বিজনের মনে হল এখন মানুষ অবাক হয় অনেক কম। ভয় পায় বেশি। রবীন্দ্রসদনের সামনে এসি গাড়ি থামাল। সামনে একটা পাগল। মাটিতে বসে চুপচাপ। পাগল কি তাহলে মানুষ নয়, অন্য কিছু! প্রায় ন'টা নাগাদ হাঁপাতে হাঁপাতে রোজি এল। স্লিভলেস রয়্যাল ব্লু ব্লাউজ। ম্যাচিং শাড়ি। এসে বলল, 'ভেরি সরি স্যার। খুব লেট হয়ে গেল। আসলে আজকে রাস্তার যা অবস্থা, বাস-ট্যাক্সি কিছু নেই।'

বিজন শুধু বলল, 'লেটস গো।' গাড়ির সামনের দরজা খুলে বিজনের পাশে এসে বসল রোজি। পরিচিত হালকা পারফিউমের গন্ধে ভরে গেল কাচতোলা স্যান্ট্রো। নীল শাড়ির ফাঁক দিয়ে ফরসা পেটের পাশে ভাঁজ দেখল বিজন। অল্প ঘাম জমে চিকচিক করছে। ওখানটায় একবার ছুঁয়ে আঙুল ভেজাতে ইচ্ছা করল। কিন্তু করল না, আরও জমুক ইচ্ছেটা। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বিজন বলল, 'আজ অনেক লেট হয়ে গেছে, গাদিয়াড়া গিয়ে কাজ নেই, বরং চলো ডায়মন্ডহারবারটা ঘুরে আসি। কী বলো তুমি?' রোজি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। যেন বিজন নিজেকেই প্রশ্নটা করেছিল আর নিজেই রাজি হল। হু-হু চলছিল গাড়ি। গাড়ির ভেতর দুজন মানুষ সিটে আলতোভাবে বসে। রাস্তাঘাট প্রায় বন্‌ধের দিনের মতো। কয়েকজন বিক্ষিপ্ত মানুষ আর টুকটাক সামান্য কয়েকটা গাড়ি চলতে দেখল বিজন। একটা জিনিস এতক্ষণে ভালো করে খেয়াল করল ও, সকাল থেকে যে-ক'টা মানুষ দেখেছে কেউই কিন্তু মাটি থেকে সমান উচ্চতার শূন্যে নেই। কেউ একটু বেশি উঁচুতে, কেউ তার চেয়ে একটু কম। যেমন বিজনের চেয়ে রোজি ইঞ্চিখানেক বেশি মাটির কাছাকাছি। এমনটার কারণ বুঝতে পারল না বিজন। অবশ্য আজকের পুরো ঘটনাটার কারণটাই তো এখনও কোনও শালার ঘটে ঢোকেনি। রোজিকে বলল, 'কী অদ্ভুত দিন না, স্বপ্নেও ভেবেছ কখনও?'

'না স্যার ভাবিনি' উত্তরটায় দায়সারা ভাব বেশি। কিন্তু লুকোনো।

'ডোন্ট সে স্যার, টুডে উই আর পার্টনার...ইয়ে ফ্রেন্ডস অনলি। ওকে?'

'ওকে, স্য...' থেমে গিয়ে অল্প হাসল রোজি। ওর চোখদুটো আজকে

ঈষৎ ঘোলাটে, লাল। হেনা করা খোলা লম্বা চুল, মাখন রঙের কাঁধ, তেলতেলে নিটোল হাত দুটো সবই কেমন যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক মনে হয় বিজনের। রোজি বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'রোজি।'

খেয়াল করল না।

'এই-ই'

'অ্যাঁ-হ্'

'আরে এত স্টিফ হয়ে আছ কেন? রিল্যাক্স।'

'না-না, আমি ঠিক আছি।'

'অ্যান্ড হাউ ইজ ইয়োর চাইল্ড,...কী নাম যেন?'

'শিবাঙ্গী।'

'একেক বারে কতটা করে ব্লাড লাগে তোমার মেয়ের?'

'তিন-চার ইউনিট। সামনের মাসে ডেট পড়েছে।' কালেক্ট করা এত কঠিন, ব্ল্যাক ছাড়া পাওয়াই যায় না। তার ওপর নার্সিংহোম-মেডিসিন...এত খরচ...কী করে যে...' গলগল করে বলে বিজনের দিকে তাকাল রোজি।

হাসল বিজন। বলল, 'বিজন কর্মকার কিছু ভোলে না। ইয়োর অ্যাডভান্স উইল বি অ্যাট ইয়োর ডেস্ক ইন টাইম।...অ্যান্ড ইট মাইট বি নন রিফান্ডেব্যল'।

'থ্যাঙ্ক উই স্যার, ওহ্ সরি ফর দ্য স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। সো কাইন্ড অফ...'

হাত তুলে থামাল ওকে বিজন। 'থ্যাঙ্ক ইউ' শব্দটায় তেতো ভাব ছিল, ভালো লাগল না। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। এই ফালতু প্রসঙ্গটা এখন না টানলেই হত। অবশ্য ফালতু নয়, বরং ওই কারণের জন্যই আজ রোজি পাত্রর মতো 'সন্দরী ফরসা স্লিম প্রকৃত ঘরোয়া পাত্রী' বিজন কর্মকারের সঙ্গে একই গাড়িতে ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছে। রোজির দু-বছরের মেয়ের মেজর থ্যালাসিমিয়া। কয়েক মাস অন্তর ব্লাড চেঞ্জ করতে হয়। ওর হাজব্যান্ড কী এক লেদার কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্ট। শাল্‌লা এসব পাতি ফেকু লোকগুলোর আচমকা কী করে এমন সুন্দর বউ জুটে যায় কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। এ এক অদ্ভুত রহস্য! রোজির কাছে শুনেছে লাভ

ম্যারেজও নয়। ঢপ ঝেড়েছে কি না অবশ্য জানা নেই। মেয়ের ট্রিটমেন্টের খরচ আর একার রোজগারে কুলোচ্ছে না, সুতরাং ঘরের বউকে মার্কেটে চাকরি করতে পাঠিয়েছে। এবার মর শালা। রোজি এসেছিল মৃণালের রেফারেন্স নিয়ে। বিজনের বন্ধু, আবার ওদিকে রোজির বরেরও পরিচিত। বিজনকে ফোন করে বলেছিল, 'পাঠাচ্ছি একটু দেখিস। এক্সপিরিয়েন্স নেই। তোর কাছে থাকলে অবশ্য...' সেই এক্সপিরিয়েন্সই তো করাচ্ছে বিজন। কাজের, জীবনের। আর একবার রাগ হল রোজির বোগাস হ্যাজব্যান্ডটার জন্য। পকেটের উপযুক্ত ওজন না থাকলে কীভাবে দুটো একসঙ্গে থাকার মানুষ একা হয়ে যায়...অবশ্য সবাই যে এই কারণে তা তো নয়। সোনালির বর যে বিজন কর্মকার ছিল সে তো কম টাকা রোজগার করত না। এরকম পাঁচটা থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টের জন্য খরচ করলেও প্রতি মাসে ঝুড়ি উপচে থাকত। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিল সোনালি। অসম্ভব ওপরে ওঠার ইচ্ছে নিয়ে জন্মেছিল মেয়েটা। চাকরি করত। উঁচু চাকরি। বিজনের মতোই।

রূপ-মেধা কেউ কারও চেয়ে কম ছিল না ওর মধ্যে। বিয়ের বছর দুয়েক পরেও ইস্যু চায়নি কেউ। তারপর বিজনের ইচ্ছা হল। সোনালির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'এখন! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

'তাহলে কবে? আমরা ইমপোটেন্ট হয়ে যাওয়ার পর?'

'আগে কেরিয়ার ঠিক হোক। ওসব পরে ভাবা যাবে।'

জীবন আর কেরিয়ার যে বিপরীত শব্দ সেদিন বুঝেছিল বিজন। সোনালি পিল ইউজ করতে চাইত না। বিজনকে প্রোটেকশন নিয়ে হত সব সময়। খাটে ম্যাট্রেসের নীচে রাখা থাকত প্যাকেট। এক রাতে ঠিক ওই মুহূর্তটায় ম্যাট্রেসের তলায় হাতড়ে বিজন বুঝল প্যাকেট খালি। প্রোটেকশন নেওয়ার নিপুণ অভিনয় করে সেদিন সোনালিকে ঠকিয়ে দিয়েছিল ও। মাস কয়েক পরেই অ্যাবরশন।

'ইউ চিট, লায়ার, ইরেসপনসিবল, তুমি ইচ্ছে করে।...আমি জানি, সব বুঝি।'

'কিচ্ছু বোঝো না তুমি, নিজের কেরিয়ার ছাড়া।'

'ওটাই সব।'

'হ্যাঁ একদিন ওটাই তোমাকে শব বানাবে।'

এর পরেও মাঝেমধ্যে বিছানায় দেখা হত শরীরে শরীরে। সোনালি ওই অবস্থাতেও মাথা তুলে দেখে নিত সত্যি সত্যি গার্ড নিচ্ছে কি না। কাজ কাজ—অফিস ছাড়া আর কিছু জানত না মেয়েটা। অফিসে ঢুকলে রাত্রে বাড়ি ফেরার ঠিক থাকত না এক-একদিন। চড়চড় করে ওপরে উঠেছিল। একদিন আচমকা বলল, 'গুগুল্স সফটওয়্যার থেকে অফার পেয়েছি।'

'ভালো, কোথায় অফিসটা?'

'ক্যালিফোর্নিয়া'। এমনভাবে বলল যেন শ্যামবাজার।

'ও, তা কী করবে?'

'ভাবছি। অবশ্য এখানেও ব্রাঞ্চ অফিস রয়েছে, শুধু প্রথমে বছরখানেক ওখানে ট্রেনিংয়ে থাকতে হবে। যা প্যাকেজ না, শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।' নিজের মনেই আনন্দে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল সোনালি। ভাবছি বলেছিল কিন্তু ভাবেনি, একদিন পরেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিল নিজের। এক বছর না। বেশ কয়েকটা বছর পার। হয়তো ওখানেই সেটল করে যাবে। ওখানে যেতে হলে কোন মহাসাগর যেন পার হতে হয়? প্রথমদিকে সপ্তাহে দিন দুয়েক করে ফোন, তারপর পনেরো দিনে...স্রেফ সৌজন্যমূলক... মাসে...আচ্ছা ও কি ওখানে এখনও একাই থাকে? মোটেই নয়। নিশ্চয় কোনও পার্টনার জুটে গেছে এতদিনে।...শা-হ্-হ্। ও-ও এখন ভাসছে নিশ্চয়। কতটা শূন্যে?...ধু-স এসব ভাবতে ভালো লাগছে না। পাশের মেয়েটা তো সিটে হেলান দিয়ে রাখা পাথরের মূর্তি। এফ এম চালাল বিজন, 'আজ দেশের সমস্ত অফিস, স্কুল, কলেজ...' চ্যানেল পালটে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল...' ধ্যাৎ শালা, কিছু ভালো লাগছে না। বন্ধ করে দিল। ভাঙুক চুরুক...সব চুরমার, তছনছ হয়ে যাক, কিস্যু এসে যায় না বিজনের। আজ শুধু রোজি পাত্রকে চাই। চাই-ই। ভীষণভাবে। গাড়ি অনেকক্ষণ ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে নিয়েছে। কোন হোটেলে উঠবে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে বিজন। 'রূপসী বাংলা'য় আগেও একবার, কী যেন নাম মেয়েটার...ওহ্ শ্বেতা, কায়দা করে নাম বলত সোয়েতা, ওর সঙ্গে উঠেছিল ওখানে। ব্যবস্থা ভালোই। সেফ।

'ব্রেকফাস্ট করেছ কি না জিগ্যেস করতে ভুলেই গেছি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

'কী খেয়েছ?'

'চা-বিস্কুট।'

'এটা ব্রেকফাস্ট হল! এতক্ষণে তো খিদে পেয়ে যাওয়ার কথা, কিছু খাবে?'

'উঁহু।'

'জল?'

'উহুঁ।'

মেয়েটা কি বিজনের কথা আদৌ মন দিয়ে শুনছে না। আন্দাজে ঠেকা দেওয়া উত্তর মেরে যাচ্ছে। কার কথা ভাবছে এখন? নিজের মেয়ে না মেয়ের বাপকে নিয়ে?

'কী ভাবছ কী অত?' মৃদু ধমক লাগল বিজন।

'নাহ্ কিছু...কিছু না' দাঁত বার করল রোজি। ওপরের পাটির ডান দিকে একটা গজদাঁত। হাসলে সুন্দর লাগে। 'আসলে মেয়েটার পরশু থেকে জ্বরজ্বর মতো হয়েছে।'

'ও', বলে সোজা সামনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল বিজন।

বিজনের মৃদু বিরক্তিটা বোধহয় রোজি ধরতে পেরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তেমন কিছু নয়। আসলে প্রত্যেকবারই ডেট এগিয়ে আসার ক'দিন আগে থেকে এইরকম হয়। ওর বাবা আছে। ঠিক সামলে নেবে।'

'ডায়মন্ডহারবার গেছ কখনও আগে?'

'না। শুনেছি খুব সুন্দর। সত্যি?'

'চলো, আর একটু পরে নিজেই দেখতে পাবে।'

'আপনি অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছেন, না?'

বিজন সামান্য গর্বিত হেসে বলল, 'কাজটাই তো এমন, যে আসমুদ্রহিমাচল পাক খেতে হয়। অফিসে দেখই তো, ক'দিনই বা চেয়ারে বসি। তুমিও সিনিয়র হলে ইন ফিউচার আমার মতোই করতে হবে।'

'আপনি কিন্তু একটু বেশি প্রেশার নেন।'

'ও ঠিক আছে। একা মানুষ। ঘরে কাজকম্ম তো কিছু নেই। অফিসই সব।'

উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রোজি। বলল না, থেমে গেল। এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করল বিজন। রাস্তার মোড়ে একটা রিকশাস্ট্যান্ড। সবক'টা রিকশা লাইন দিয়ে দাঁড় করানো। আজ রাস্তায় কোনও হাতেটানা রিকশা নেই। শূন্যে পা দিয়ে রিকশা টানা যায় না। রোজি থাকে পাইকপাড়ায়। বিজন জিগ্যেস করল, 'বাড়ি থেকে ক'টায় বেরিয়েছিলে আজকে?'

রোজি প্রশ্নটা শুনে প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর বেশ অপ্রস্তুতের মতো বলল, 'আমিই...মানে আসলে ঠিক বাড়ি থেকে আসিনি এখন।' ভুরুতে সামান্য প্রশ্ন রেখে ওর দিকে তাকাল।

'...মানে...এত সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়াটা...কাল বিকেলে ভবানীপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়ি চলে গেছিলাম। আজকে ওখান থেকেই...।'

বিজন বুঝল। বাড়ি থেকে এত সকালে বেরোতে হলে দুনিয়ার মিথ্যে, কৈফিয়ত, সন্দেহও হতে পারে। সুতরাং বন্ধুর বাড়ি এক দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া। মিথ্যে, বেশ কথা, বিজনও তো বন্ধু। বন্ধুই তো আদর করে, খাওয়ায়, গাড়ি করে ঘোরায়। ওর ক্যালানে বর এসব পারবে? কাজ হয়ে যাওয়ার পর রোজির হাতেও মেয়ের ট্রিটমেন্টের জন্য কিছু দিয়ে দেবে ভেবে রেখেছে বিজন। ডাইরেক্ট হয়তো নিতে চাইবে না। সেন্টুতে লাগতে পারে। বলতে হবে এটা কোম্পানির থেকে দেওয়া হচ্ছে। বিজনেস প্রমোশন এক্সপেনডিচার।

'প্রায় এসে পড়েছি। আর কিছুক্ষণ।' বলে রোজির দিকে তাকাল। নীল শাড়ির আঁচলটা আজকে যেন একটু বেশি করে বুকের সামনে জড়িয়ে রেখেছে মেয়েটা। কী লাভ? সেই তো...। মিনিট পনেরোর মধ্যে বিশাল...বিশাল চওড়া আদিগন্ত বিস্তৃত গঙ্গার ধারে 'রূপসী বাংলা'র ভেতর ঢুকিয়ে দিল গাড়ি।

রোজি বলল, 'গঙ্গা এত বড়, এত চওড়া। আমি ভাবতেই পারিনি।' গলার বিস্ময়টা সত্যি কি না বোঝার জন্য বিজন জিগ্যেস করল, 'ভালো?'

'দারুণ।' শুনেও সন্দেহটা পুরোপুরি গেল না। বিজন চাইছিল মেয়েটা মনেপ্রাণে তরতাজা টাটকা হয়ে উঠুক। মনে খিট থাকলে ওই সময়টায় ঠিক ততটা জমে না। এর আগে দু-একটা মেয়ে বিছানায় বার বার এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, ভীষণ বিরক্ত লাগে তখন। একজনকে তো পরে কী একটা কারণে স্যাক পর্যন্ত করে দিয়েছিল রাগে।

গাড়ির দরজা খুলে শূন্যে সাঁতরানোর ভঙ্গিতে হোটেলে উঠল দুজনে। রিসেপশনে লোক নেই। ডাকাডাকির পর এল। একই অবস্থা। আজ সমস্ত মানুষদের সাঁতার কাটার দিন। সুইমিং ডে। আর গোটা পৃথিবী শূন্যে ভরা সুইমিংপুল। রিসেপশনিস্ট লোকটা কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। আজকের দিনেও! ওরা ঠিক বুঝতে পারে কারা স্বামী-স্ত্রী আর কারা ইয়ে। রেজিস্টারে দুটো অদ্ভুত নাম আর হ্যাজব্যান্ড-ওয়াইফ বলে একটা অদ্ভুত রিলেশন লিখে দিয়ে দোতলার দুশো পাঁচ নম্বর রুম।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই বিজনের একবার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল ভীষণ। আবার আটকাল নিজেকে। আর একটু, আর একটু সবুর। এখনও পর্যন্ত এতটা রাস্তায় অঙুলে আঙুল পর্যন্ত ঠেকায়নি। মেয়েছেলে, হল খবরের কাগজ। শালা, ছোঁওয়া মাত্র বাসি। বিজন বলল, 'তুমি আগে টয়লেটে যাও। ফ্রেশ হয়ে নাও। আমি ব্রেকফাস্ট বলে দিচ্ছি।' বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নয়তো শুধু একটু চা আর বিস্কিট বলি, বেলা হয়ে গেছে। একটু পরে লাঞ্চই বলে দেব, কী বলো?'

উত্তরে সেই একইরকম ঘাড় কাত করে নিজের ব্যাগ খুলে সালোয়ার বার করে টয়লেটে ঢুকে গেল রোজি। মাইরি এ মেয়ের সঙ্গে জমবে তো! যা রেটে লেতিয়ে রয়েছে, না ডোবায়। আজকের দিনটাই ফালতু। অফিসে তো মেয়েটা দিব্যি দিলখুশ থাকে। তবে হয়তো লাইফে প্রথম বার বলে ঘাবড়ে রয়েছে। সেই কেস হলে টেনশনের কিছু নেই। রাত্রে দু-পেগ গলায় ঢেলে দিলে সব ফিট হয়ে যাবে। সাদা ধবধবে চাদর পাতা বিছানায় বসল বিজন। সিগারেট ধরাল। শরীরটা হালকা হয়ে রয়েছে বলে বিছানার গদিটা কত নরম বুঝতে পারল না। সোনালি কতটা উঁচুতে ভাসছে? বিজনের চেয়েও ওপরে কি?...ভাসুক। ভাসতে ভাসতে ফানুসের মতো আকাশে উড়ে

যাক। ওপরে উঠতেই তো চেয়েছিল সে। সবচেয়ে ওপরে...। একটা খিস্তি দিল। তারপর বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা রিমোটটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কের মতো টিভিটা চালাল।

বাংলা সিরিয়াল হচ্ছে। একা মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে কী কারণে দূর করে দেওয়া হয়েছে বলে উৎকট নেকু নেকু ভাবে কাঁদছে সে। চ্যানেল পালটাল। নিউজ। আর ভালো লাগছে না, সকাল থেকে শুধু এক গল্প। এক-একটা চ্যানেল এক-এক স্টাইলে স্টোরি কভার করছে। কোথাও লাইভ টেলিকাস্ট। বড়বাজারে মুটেদের ইন্টারভিউ। একটা মুটে বলছে, 'অগর কাল ভি অ্যায়সা চলা তো ভুখা মর যায়েঙ্গে হামলোগ। জমিন পর প্যায়ের ন রাখ সকে তো মাল ক্যায়সে টানেঙ্গে।' মাঝখানে অ্যাডভারটাইজ। সাবান, টুথপেস্ট, মোটরবাইক। আর একটা চ্যানেল। সেখানেও মিটিং গোছের। পালটাতে গিয়ে কী একটা শব্দ শুনতে পেয়ে গিয়ে থমকে গেল বিজন। একজন লোকের ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। স্টুডিয়োতে। কোনও বিশেষজ্ঞ হবেন বোধহয়। প্রশ্নকর্তা তাকে বললেন, 'যেখানে চাঁদে মাধ্যাকর্ষণ বা g-এর মান ছয়ভাগের একভাগ, মানুষ ওখানে গেলে মাটিতে মিনিমাম নিজের পা-টুকু রাখাতে বা ছোঁওয়াতে পারে, সেখানে খোদ পৃথিবীতেই দুর্ভাগ্যবশত শুধু মানুষের ওপরে g-এর মান কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র। মানুষ শূন্যে ভাসছে। এর পিছনে বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণের কথা তবু আমরা শুনছি। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন এই যে একজন মানুষ আরেকটা মানুষকে কিছুতেই ছুঁতে পারছে না, স্পর্শ করতে গেলেই দুটো চুম্বকের সমমেরুর মতো পরস্পরের তীব্র বিকর্ষণ ঘটছে এর কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?' বিশেষজ্ঞ কিছুক্ষণ মুখ বেঁকিয়ে নিজের দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে উত্তরটা ঠিক করে নিলেন, তারপর বললেন, 'দেখুন, প্রথম ঘটনাটাই এমন অদ্ভুত, এবং একই সঙ্গে আকস্মিক যে তার আসল কারণ কী সেটা এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারা যায়নি। আমার যেটা ধারণা যে, পৃথিবীর কেন্দ্রের কোনও অজ্ঞাত গোলযোগের কারণেই তার গ্র্যাভিটি মানুষের ওপর প্রায় কাজ করছে না এবং এর ফলেই আমার মনে হচ্ছে মানুষের নিজস্ব আকর্ষণ ক্ষমতাও ডি-অ্যাকটিভেট হয়ে গেছে।

আফটার অল...অ্যা...পৃথিবীই তো সব কিছু। মানে এমন অবস্থা, মানুষের বর্জ্য পর্যন্ত মাটিতে পড়ছে না। এ সত্যিই এক বিস্ময়!' নিজের উত্তরে বেশ খুশি বিশেষজ্ঞ।

'হ্যাঁ, সেকথা বুঝলাম। কিন্তু মানুষে মানুষে আকর্ষণ না থাক। ছুঁতে গেলে এত তীব্র বিকর্ষণ কেন। এ তো বিপরীত বল কাজ করছে। এই যে আমি আপনাকে ছুঁতে যাচ্ছি।' বলতে বলতে প্রশ্নকর্তা ডেমো দেওয়ার ভঙ্গিতে ওই ভদ্রলোকের হাতের দিকে নিজের হাতটা বাড়াল। ঠিক ইঞ্চিখানেক আগেই ছিটকে সরে গেল ওর হাতটা। যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। 'কেন এমনটি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?'

লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে স্টুডিয়োতে। উত্তরদাতাকে বাঁচিয়ে দিয়ে তক্ষুনি একটা ফোন এল 'হ্যালো আমি সিউড়ি থেকে কোঁ...ওঁ...ওঁ...'

'আপনি টিভির ভল্যুমটা...'

শুনে শিউরে উঠল বিজন। টিভি অফ করে দিল। মানে! কপালের দু-পাশের রগ দপদপ করছে। কোনওমতে বাথরুমের কাছে গিয়ে দরজায় দমাদম ধাক্কা দিতে থাকল। 'রোজি-রোজি'। ভেতরে কল থেকে জল পড়ছিল। জলের শব্দ বন্ধ হল। 'কী হয়েছে?' ভেতর থেকে জিগ্যেস করল রোজি।

'দরজা খোলো এক্ষুনি...তাড়াতাড়ি...'

'জাস্ট এ মিনিট', মিনিটখানেকের মধ্যেই দরজা খুলল রোজি। গোটা শরীর সপসপে ভিজে। গায়ে শাড়িটা কোনওমতে জড়ানো। বিজন আচমকা প্রচণ্ডভাবে জড়িয়ে ধরতে গেল রোজিকে। আর তক্ষুনি ফুটখানেক দূরে ছিটকে সরে গেল। অবাক হয়ে গেছে রোজিও।

'এ কী হচ্ছে এসব?' আহত বাঘের মতো তীব্র আক্রোশে বিজন বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল মেয়েটার শরীরের ওপর আর কে যেন প্রতি বারেই ঠিক ইঞ্চিখানেক দূর থেকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিচ্ছিল ওকে। রোজিও হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল বিজনকে। পিছলে সরে গেল হাত। আবার...আবার। দাঁতে দাঁত ঘষছিল বিজন। মুখে ফেনা জমে উঠছিল। থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। থুতুটা মাটিতে পড়ল না। বিচ্ছিরি নোংরা সুতোর

মতো সরু হয়ে ভাসতে থাকল শূন্যে...

'হা-রা-ম-জাদি তুই—তুই জানতিস না? বল জানতিস না?' রোজির দিকে আঙুল তুলে গর্জে উঠল বিজন।

'বিশ্বাস করুন...আমি...আমি সত্যি কিছু জানি না...আমি' হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল রোজি।

'আ-আ-হ্-হ্', বিকৃত জান্তব চিৎকার করে উঠল বিজন। টলতে টলতে ভাসতে ভাসতে বিছানার কাছে গেল। নিজের ব্যাগটা খুলে ভদকার বোতল বার করে কোত কোত করে তিন-চার ঢোক খেয়ে 'ধ্যাস শা-হ্' বলে ছুঁড়ে মারল বোতলটা মেঝেতে। ভেঙে চুরমার হয়ে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। টয়লেটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থিরথির করে আতঙ্কে কাঁপছে রোজি। অনেক—অনেকক্ষণ দু-হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে রইল বিজন। গোটা শরীর তেল উপচে ওঠা জ্বলন্ত আগুনটা। মাথা তুলে তাকাল রোজির দিকে। মেয়েটা এখনও ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দু-চোখে ভরতি অদ্ভুত এক ভয়। আরাম লাগল দেখে। বিমর্ষ হয়ে উঠল বিজন।

বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কী হয়েছে, এখানে বসো।...এসো।' মেঝেতে ছড়ানো কাচের টুকরোর একটু ওপর দিয়ে নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে বিজনের এক ফুট দূরে বিছানায় এসে জড়সড় হয়ে বসল। এখনও ফোঁপাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু শাড়িতে ঢাকা বাঁধনছাড়া দুটো বুক। 'ডোন্ট ক্রাই। ফর গড সেক প্লিজ ডোন্ট ক্রাই। জাস্ট টেল মি এ সিঙ্গল ট্রুথ। তুই কি সত্যি জানতে না?' কথাগুলো দাঁতের অল্প ফাঁক দিয়ে চিপে চিপে বলল বিজন। মাথা নীচু করে ফেলল রোজি। কোনও উত্তর দিল না, শুধু বুকের ওঠানামা বেড়ে গেল। আবার মাথাটা গরম হয়ে গেল বিজনের। 'স্পিক আউট...কেন বলনি আমায়...কি ভেবেছ এক দিনে পার পেয়ে যাবে? ইউ চিট, লায়ার।...' শব্দ দুটো ঠিক এভাবেই বলেছিল না সোনালি, হঠাৎ মনে এল বিজনের। ওর চিৎকারে চমকে উঠল মেয়েটা।

'বিশ্বাস করুন আমি চাইনি...আমি আসলে...আমি আবার আসব যেদিন খুশি যেখানে আপনি বলবেন;'

'আহ্ জাস্ট শাট আপ।' বলে পায়ের কাছে পড়ে থাকা ভাঙা বোতলের একটুকরো কাচ হাতে তুলে টুকরোটা প্রাণপণে শক্ত করে চেপে ধরে সামনের দেওয়ালে প্রচণ্ডভাবে ছুঁড়ে মারল বিজন; তারপর বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নিজের দু-হাত পিছনে রেখে পিঠ হেলিয়ে বসে থাকল।

'ও কী?' আচমকা চিৎকার করে উঠল রোজি।

'কীই!' ভুরু কুঁচকে তাকাল বিজন।

রোজির প্রায় বেরিয়ে আসা চোখদুটো বিজনের হাতের দিকে। 'কী হয়েছে' বলে নিজের হাতের দিকে তাকাল বিজন। কাচের টুকরো ছোঁড়া, হাতটার তালু কেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে না।

'কী হবে...ওমা আমি কী করব...কী করব' হঠাৎ যেন পাগলের মতো হয়ে উঠল মেয়েটা।

'আরে বাবা অত বাড়াবাড়ির কিছু নেই, রিসেপশনে ফোন করে কিছু একটা যাস্ট এইড পাঠিয়ে দিতে বলো' সামান্য বিরক্তি রেখেই কথাটা বলল বিজন। তার পর বলল 'আমার পেইন হচ্ছে না।'

'না—না—ইশ...নষ্ট হচ্ছে...সব পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কী হবে...কী হবে এখন।'

হাত বাড়িয়ে—বিজনের কেটে যাওয়া তালুটা ধরতে গেল রোজি। তার আগেই হাত সরিয়ে নিল বিজন। 'আরে বলছি তেমন কিছু নয়, তোমাকে যেটা করতে বললাম করো।' আঙুল চুঁইয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরে ভেসে যাচ্ছে সাদা চাদরের বিছানা।

'আমি—আমি' কোনও কথাই কানে ঢুকছিল না রোজির।...'স্যার প্লিজ স্যার নষ্ট করবেন না...ভীষণ দাম...স্যার ব্ল্যাক ছাড়া...এই ইউনিট...' উন্মাদের মতো এলোমেলোভাবে বকে যাচ্ছিল মেয়েটা। 'একটা কিছুতে...একটা' বলতে বলতে হঠাৎ সাইড টেবিলে রাখা জলের জাগটার সব জল উপুড় করে মেঝেতে ঢেলে দিয়ে জাগটা বিছানার ওপর রেখে বলল, 'এর ভেতরে হাতটা রাখুন...রাখুন, ইস...সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, রাখুন।' ঘরের মধ্যে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করছিল, অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বিজন রোজির দিকে। বুকের আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। ফর্সা ফুলোফুলো এতদিনের কাঙ্খিত খোলা

বুকদুটোর দিকে কেন কে জানে একটুও তাকাতে ইচ্ছে করছিল না বিজনের। এমনিই। রোজি ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে 'কত নম্বর অ্যাঁ কত' বলেই ওটা ফেলে নিয়ে নিজের ছোট ব্যাগটা খুলে উপুড় করে সব কিছু ঢেলে দিল বিছানায়। কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার পরে মেঝেতে খাবলে ঘাঁটতে থাকল জিনিসগুলো। হঠাৎ আবার সেই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে মেঝেতে পা ফেলতে যাওয়ার সময়ের মতো শিউরে উঠল বিজন। রোজির পা-দুটো প্রায় মাটিতে ছুঁয়েছে। তাতে একটুও খেয়াল নেই ওর।

'কী হচ্ছে কী, পাগলামো, থামো' মৃদু ধমক দিল বিজন। থমকে গেল মেয়েটা। 'এদিকে এসে চুপ করে বসো আমার কাছে। ঠিক করো শাড়িটা। দেখছি।' বলে নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে তালুতে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিজনের সামনে বসে রোজি ঘোরের মধ্যে রক্তে ভিজে ওঠা লাল বিছানাটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকল 'সব নষ্ট, ইস...এতটা...জাগটার এতটা ভর্তি...? ভর্তি! এক ইউনিট?...'

বিজন বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রোজির দিকে। তাকিয়ে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ডোন্ট বি টেনস। এই তো ব্লিডিং বন্ধ হয়ে এসেছে।' বলে একটু থেমে নিয়ে বলল, 'খুব খিদে পেয়ে গেছে, এখানে লাঞ্চটা সেরেই যদি বেরিয়ে পড়া যায় তাহলে সন্ধের মধ্যে পাইকপাড়া পৌঁছে যাবে। তোমার হাজব্যান্ড একবেলার জন্য মেয়েকে আই মিন শিবাঙ্গীকে সামলে নিতে পারবে তো, না কি?' বলতে বলতে বেখেয়ালেই হাতটা বাড়িয়ে দিল রোজির দিকে। আর কী আশ্চর্য, লাল হয়ে ভিজে ওঠা উষ্ণ হাতটা বড় সহজে শান্তভাবে ছুঁয়ে ফেলল রোজির কাঁধ। 'যাও যাও ফ্রেশ হয়ে নাও' বলতে বলতেই বিজন বুঝতে পারছিল ও একটু একটু করে শূন্য থেকে মেঝের দিকে নামছে। মাটি ছোঁওয়া পর্যন্ত।

উদিতা
অক্টোবর ২০০৮
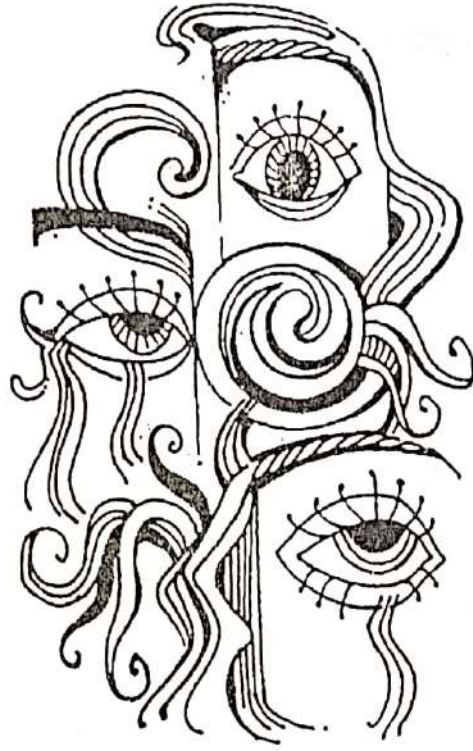
দৃষ্টিবদল

'পাঃ বঃ, স্বর্ণবণিক, 32/5'-4", বি এ, উত্তর কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি, পৈতৃক ব্যবসা, অনূর্ধ্ব সাতাশ-এর জন্য নূন্যতম উঃ মাঃ ফরসা সুন্দরী পাত্রী ব্যতীত পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। দাবি নাই। বক্স নং...।'

লাল কালি দিয়ে এই অংশটুকু গোল করা রবিবারের সেই কাগজটি এখনও হয়তো হিন্দমোটরের ৭নং দেবাই পুকুর রোডের বাড়িতে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মিতা আর সেই বাড়িতে নেই। সপ্তাহ দুয়েক হল ও এখন ৩৭/বি নিবেদিতা লেন, বাগবাজারের একটা দোতলা বাড়িতে। বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখলে মনে হবে কোনও আশি বছরের বুড়ো পান খেয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

মোটা কাঠের সদর দরজা ঠেলে ঢুকতেই বেমক্কা অন্ধকার। তারপর খাড়া সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে চোখ সইয়ে নিতে নিতে উঠে যেতে হবে দোতলার দিকে। সিঁড়ি শেষ হলে লম্বা বারান্দায় মোটামুটি

আলো। মেঝেতে মোজাইক টালিগুলোর অধিকাংশই ঢকঢক করে। বারান্দা লাগোয়া দুটো বিশাল ঘর। বারান্দার শেষ কোণে ম্যাসোনাইট দিয়ে ঘেরা রান্নাঘর, আর শুধু রাত্রে ব্যবহারের জন্য একটা বাথরুম। সারাদিনের বাথরুম-পায়খানা নীচে। সেটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের বেলাতেও একটা পঁচিশ ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলে, পায়খানার প্যানটা গোল, পাদানি দুটো বিশাল উঁচু, নড়বড়ে টিনের দরজার নীচের অংশের অনেকটা জং ধরে খেয়ে গেছে। বিশ্রী স্যাঁতসেতে কলতলা আর বাড়ির কার্নিশে বট-অশ্বত্থের চারায় ছড়াছড়ি। ছাদে ওঠার সিঁড়িটি কাঠের। ওঠানামা করতে গেলে অল্প দোলে, বড় রাস্তা দিয়ে ট্রাম গেলে দোতলার মেঝে থরথর করে কাঁপে।

ফুলশয্যার পরদিন সকালেই মিতা ওর বর শংকরকে জিগ্যেস করছিল, 'মেঝেটা এমন কাঁপে, ভিত নষ্ট হয়ে যাবে না?'

শংকর হ্যা হ্যা করে হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'ধ্যার মাইরি, অ্যাদ্দিনে এ-বাড়ির ভিত আর আছে নাকি?'

ভিত নেই! থমকে গিয়েছিল মিতা!

তারপর প্রায় দিন চোদ্দো পেরিয়ে যাওয়ার পরেও নতুন এই বাড়িটাকে কিছুতেই অভ্যেসে আনতে পারল না ও। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার যেন কেমন ধরনের। শ্বশুর গত হয়েছে মিতার বিয়ের বছর তিনেক আগে। বাড়িতে লোক বলতে শংকর, মিতা আর শাশুড়ি। নিয়তি কর্মকার, ভয়ংকর অ্যাপিয়ারেন্স মহিলার। সামনে এসে দাঁড়ালে হাওয়াও থমকে যায়। গাঁক গাঁক করে কথা বলে। আর কথায় কথায় বিচ্ছিরি সব ভাষা। শংকরও মায়ের মতো, মুখের কোনও আগল নেই। মিতার বাড়িতে জীবনে কেউ কখনও 'শালা' শব্দটা উচ্চারণ করেনি। তাই মাঝেমধ্যেই ও চমকে ওঠে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার শাশুড়ির হাবভাব ঠিক মা-মা নয়। ছেলের সামনে কেমন হিরোইন গোছের হয়ে থাকে। গা ঘিনঘিন করে মিতার। কিন্তু কিছু করার নেই। বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে শংকর যখন ওর ভারী চেহারা নিয়ে নিজের 'আভরণ' নামের সোনার দোকানে বসে টেবিল ফ্যানের সামনে সারাদিন বিনবিন করে ঘামে, তখন মিতাকে বাড়িতে এই মহিলার সঙ্গেই থাকতে হয়। মিতার বিয়ের আগে নীচের তলায় এক ঘর ভাড়াটে

ছিল। অনেক পুরোনো, ষাট টাকা ভাড়া। মায়ে-পোয়েতে না কি প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে ওদের তুলেছে। এখন ঘরটায় ভাঙাচোরা টেবিল-চেয়ার, তিন পায়া চৌকি, শংকরের ছোটবেলায় জংধরা লজঝড়ে সাইকেল থেকে শুরু করে ফুটো লোহার বালতি, টিভির বাক্স, দড়ি, ফাটা জলের পাইপ সব কিছু গুছিয়ে রাখা আছে। মিতা আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে, শাশুড়ি মাঝেমধ্যেই ওর দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে। গা শিরশির করে। দম বন্ধ হয়ে আসে মিতার। বাবা যে কেন বেছে বেছে এই বাড়িটাই জুটিয়েছিল! হয়তো আর উপায়ও ছিল না। অথেনটিক ফার্মাসিউটিকালের সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাবা। রিটায়ার করার পর থেকেই বড় অস্থির হয়ে পড়েছিল। ভাই বেকার, মায়ের বারো মাসের গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ, মিতার ছাব্বিশ প্লাস আর রিটায়ারমেন্টের এক বিঘত পুঁজি নিয়ে সব বাঙালি বাবার মতো মিতার বাবাও আগে কন্যাদায় মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণে ঝাঁপ দিয়েছিল 'পাত্রী চাই'-এর পাতায়। সেখানে '32/5'-8''', এবং 'দাবি নাই'-এর শংকর যে শাঁসালো পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। মিতাও মেনে নিয়েছিল।

সাতাশের জীবনে একটা প্রেমও করতে পারেনি মিতা। হয়তো প্রেম করা সবার দ্বারা হয় না বলে। ইচ্ছে থাকলেও নয়। ভালোবাসতে পারলেও নয়। কোথায় যেন একটা আটকে যায়। জট পাকিয়ে যায় সব।

আরও বছর দুয়েক

'আ-হ্ রাতদিন ট্যাঁ ট্যাঁ...পাগল করে দিল শালা।...জানলাটা বন্ধ করো তো।' বিছানায় শুয়ে থেকে বলল শংকর। মিতা জলের জগটা খাটের পাশে টেবিলের ওপর রেখে জানলাটা বন্ধ করে দিল। মিতা জানে শংকরের বিরক্তির আসল কারণ মিতার উপস্থিতি। পাশের বাড়ির বাচ্চাটার কান্না নয়। ইদানীং ওকে যেন সহ্যই করতে পারে না শংকর। সামনে এলেই অকারণ খিটমিট শুরু করে দেয়। মিতা উত্তর দেয় না। কী হবে ঝুটমুট

কথা বাড়িয়ে? পাশের বাড়ির দীপেনের গতবছর বিয়ে হয়ে এ বছরের মধ্যে একটা ছেলে হয়েছে। দেখতে যদিও খুব একটা সুবিধার হয়নি। দীপেনের মতোই ভ্যাপসা কালো। তবু তাকেই, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, এমন পাতলা একটা সোনার আংটি দিয়ে মুখ দেখে এসে শাশুড়ি মিতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাড়ির কাজের লোক হারুর মাকে বলেছিল, 'দেখতে যেমনি হোক, হয়েছে তো। বংশটা তো মিটে যাবে না আমাদের মতো।'

এই দু-বছরে চেষ্টা অবশ্য কিছু কম করা হয়নি। বহু গাইনির কাছে বহুবার পাক খাওয়া হয়েছে। অমুক ব্রত, তমুক পুজো, কোমরে লাল সুতোয় বাঁধা পাঁচ-ছ'টা শিকড় মিতাকে উঠতে-বসতে খোঁচা দেয়। তবু কলসি ভরেনি। বছর দেড়েক হল মিতারও ওর মায়ের মতো অম্বলের রোগ ধরেছে। গলা-বুকের মতো আগে গোটা শরীরটাও জ্বলত সারাদিন, সারারাত। এখন শরীর শুকিয়ে গিয়ে বাজপড়া সুপুরি গাছের মতো। চুল পাতলা, চোখের তলায় কালো ছোপ। বহুদিন হল শংকর ওকে আর ছুঁয়েও দেখে না। মিতাও অনাত্মীয় নিষ্প্রাণ দুটো মাংস চামড়ার ঘষাঘষি থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেছে। মিতা বোঝে ওর নিজের এমন ন্যাতানো চেহারা আর শংকরের সঙ্গে ওর দূরত্বটায় শাশুড়ি দারুণ আনন্দ পায় মনে মনে। এমনকী ওদের কোনও ইস্যু না হাওয়াটাও মহিলাটির কাছে ভীষণ আরাম।...ঠিক কী-ই যে চায় মানুষটা? কিন্তু আশ্চর্য মজা, স-অ-ব কিছু কেমন যেন সয়ে গেছে। ঘা-টা থাকলেও নুন ছিটোলে তেমন আর জ্বলে না। সেই ছোট্টবেলায় বড়কাকুর সঙ্গে রেল-ইঞ্জিন তৈরির কারখানা দেখতে গিয়েছিল যখন। কতকগুলো লোককে ভয়ংকর আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করতে দেখে প্রায় আঁতকে উঠে জিগ্যেস করেছিল 'কাকু, এত গরমে ওদের কষ্ট হয় না?'

কাকু হেসে উত্তর দিয়েছিল 'আগে হত নিশ্চয়ই, এমন অভ্যেস হয়ে গেছে।' ঠিক সেই রকম একটা অভ্যেস।

কড়িবরগার থেকে মান্ধাতার আমলের সিলিং ফ্যানটা ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঘুরছে। রেগুলেটর একেও যা পাঁচেও তাই। মিতা জিগ্যেস করল, 'খাবার বাড়ব?'

'নাহ্, খেয়ে এসেছি।' শংকর চোখ বুজেই উত্তর দিল।

কী খেয়ে এসেছে সেটা বোঝা খুব কষ্টের নয়। ঘর ভরতি তার গন্ধ, মাঝেমধ্যের ব্যাপার। ইদানীং একটু বেশি। মিতা আর কথা বাড়াল না। ঘরে টিউবলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে শুয়ে পড়ল। বেশ কিছু দিন হল শংকরের ফিরতে বেশ রাত হচ্ছে। গোড়ার দিকে দু-একদিন জিগ্যেস করেছিল মিতা। একই উত্তর পেয়েছে 'কাজের চাপ ছিল'। কী কাজের কেমন চাপ জানার আগ্রহ আসেনি।

শংকর ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখটা সামান্য হাঁ করে রয়েছে বলে ঘরের ভেতর গন্ধটা আরও তীব্রভাবে ছড়াচ্ছে। মিতা উলটো দিকে পাশ ফিরে সুইচবোর্ডের প্লাগে গোঁজা অল আউটের ছোট্ট লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকল। রোজ রাত্রে শোওয়ার পর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসা পর্যন্ত ও এমনিভাবে তাকিয়ে থাকে। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে আলোটা যেন চোখের সামনে থিরথির করে কাঁপতে শুরু করে। শুধু এক জোড়া চোখ আর বহু দূরে এক বিন্দু আলো। মাঝখানে নিকষ অন্ধকার।...কাঁপুনি বাড়তে থাকে। একসময় চূড়ান্তভাবে কাঁপতে কাঁপতে আলোটা আবছা হতে শুরু করে,...আরও আবছা...ঘুমিয়ে পড়ে মিতা।

আজকেও সবে আলোটা কাঁপতে শুরু করেছিল তখনই...'মমতা...আহ...আ-আ...মমতা, প্লিজ...আরেকটু...তোর মধ্যে শাহ্ জাদু...' শংকরের গোঙানোয় মিতার প্রত্যেকটা রোমকূপে যেন আগুন ছুঁয়ে গেল। মিতা উঠে যেতে গিয়েও উঠল না। শুধু ওর বাঁহাতের তর্জনীর নখটা তীব্রভাবে গেঁথে যেতে থাকল বালিশের মধ্যে। আর শংকর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মাঝে-মাঝেই গুঙিয়ে বলে চলল তার মমতার কথাই।

'না-নাহ্, পাগল না কি যে দুনিয়ার সব পাগল-ছাগল এনে বাড়িতে জমা করব? তারপর বাড়িভর্তি হেগেমুতে একশা করবে।' দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মিতার দিকে একঝলক তাকিয়ে চিৎকার করে বলল শংকরের মা।

'না-না, বউদি সেসব চিন্তা নেই। আমি ওকে সকালবেলায় ওসব করিয়েই বার হই। আর পেচ্ছাপ পেলে ও আগে আমাকে ডাকে। শুধু তো একটা বেলা। আমি যতক্ষণ বাইরে থাকি, এক কোণে চুপটি করে বসে থাকবে। এট্টুও জ্বালাবে না।'

মিতা বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে নীচে দেখল হারুর মা আর শাশুড়ির মাঝখানে একটা ছেলে কলতলার সামনে বসে আছে। এত কথায় কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। মাথা নীচু করে একমনে আঙুল দিয়ে জলের দাগ কাটছে। মিতা বুঝতে পারল ছেলেটা হারু। যার কথা এতদিন শুনে এসেছে। হারু মানসিক প্রতিবন্ধী। নিজে উঠে দাঁড়াতেও পারে না।

শংকর পায়খানা থেকে বেরিয়ে হাতের লোহার বালতিটা ঠং করে কলের সামনে রেখে জিগ্যেস করল, 'কী হল সাতসকালে?'

'এই দ্যাখ, হারুর মা বলছে এটাকে না কি সকালবেলায় এখানে রাখবে।'

শংকর বলল, 'কত দিন?'

হারুর মা তড়বড় করে উত্তর দিল 'শুধু দিন কয়ের জন্য গো। কিছু অসুবিধা করবে না হারু। আসলে ওর বাবার কয়দিন হল সকালে ডিউটি পড়েছে। বড্ড সমস্যায় পড়েছি ছেলেটাকে নিয়ে। একা যে বাড়িতে রেখে আসব তাও পারি না...'

শংকর একটু চুপ থাকল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠিক আছে থাকুক, তবে দেখো, বাড়িঘর যেন নোংরা না করে।' বলে ও হিরোর মতো গিয়ে পায়খানার বালতিটা কলের নলের সামনে টেনে এনে কল খুলে দিল। শাশুড়ি আর কথা না বাড়িয়ে ওপরে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। মিতা দেখল হারুর মা হারুর দুই বগলের তলায় হাত দিয়ে ওকে প্রায় টেনে দাঁড় করিয়ে খুব ধীরে ধীরে নিয়ে চলল সদরের দিকে। আর শংকর মুখের ভেতর পাঁচটা আঙুল ঢুকিয়ে অ্যা-অ্যা-হ্যাঁক...থু...থু শুরু করল। মিতা সরে এল। শংকরের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন কৃমির মতো মনে হচ্ছে লোকটাকে। রান্নাঘরে এল। শাশুড়ি চা বসিয়েছে। মিতা ঢুকতেই শাশুড়ি বলে উঠল, 'দেখলে তো হারুর মা-র কাণ্ডটা, নরম জায়গা পেয়ে দিব্যি কেমনে হারুকে গছিয়ে দিয়ে গেল। দাঁড়াও না, আমাকেও

চেনে না। একবার মুতলেই লাথি মেরে দূর করব ওটাকে।'

মিতা চুপ, মুখের ভেতরটা বিস্বাদ লাগছে। অ্যাসিড হয়েছে বোধহয়। শাশুড়ি গ্যাসের ওপর বসানো সসপ্যানে দু-চামড় চা ঢেলে বলল, 'শঙ্কু রাজি না হলে আমি দিতাম নাকি ওটাকে রাখতে? বুঝেছে ছেলেটার মন নরম, ব্যস দিব্যি রাজি করিয়ে নিল...মহা শয়তান এই ছোটলোকগুলো... কাপগুলো এদিকে একটু এগিয়ে দাও তো।'

মিতা কাপ এগিয়ে দিল।

'শঙ্কুটা তো চিরকালই নরমমনা।' শাশুড়ির গলায় সুযোগ্য পুত্রের জন্য গর্ব ঠেলা মেরে বেরিয়ে আসছে। 'একবার তো ছোটবেলায় জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে ওর বাপের একটা নতুন ধুতি ভিখিরিকে দান করে বসেছিল। যে ভাগ্যি আমি দেখতে পেয়ে আবার ফেরত নিয়ে আসি। এখনও একইরকম ছেলেমানুষ রয়ে গেল। তুমি আসার আগেও তো আমাকে প্রায়ই ভাত গ্রাস করে মুখে তুলে দিতে হত।' বলে চা ছেঁকে কাপে ঢালতে ঢালতে মিতার দিকে তাকিয়ে পান খাওয়া ছোঁপ দাঁত দেখিয়ে হ্যা হ্যা করে বিচ্ছিরি একগাল হাসল। মিতা চুপ।

'যাও, এটা দিয়ে এসো।'

মিতা না বলতে গিয়েও পারল না। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে চায়ের দিকে একবার দেখল মিতা। ঘন কালচে লাল রং। বিষের রং কি চায়ের সঙ্গে মিশে যায়?

ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে খালি গায়ে তোয়ালে পরে দাঁড়িয়ে শংকর গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বুকে পাউডার ঢালছে। তারপর বডি স্প্রেটা নিয়ে স্যাক স্যাক করে কানের নীচে, বগলে স্প্রে করল।

মিতা চায়ের কাপ টেবিলে রেখেই চলে যাচ্ছিল। শংকর বলল, 'আমার লাল পাঞ্জাবিটা একটু বার করে দাও তো।'

যন্ত্রের মতো গিয়ে আলমারি খুলে পাঞ্জাবি বার করে খাটের ওপর রাখল মিতা।

'বুঝলে রাজিই হয়ে গেলাম...থাক গে। গরিব মানুষ, একেবারে হেল্পলেস হয়ে পড়েছে।' শংকর তোয়ালের ওপর লুঙ্গি গলিয়ে লুঙ্গিটাকে কামড়ে

ধরে ভেতরের তোয়ালেটা ছাড়তে ছাড়তে গোঁ-গোঁ করে বলল। মিতা নিষ্ক্রিয় রোবট হয়ে দাঁড়িয়ে। শংকর চায়ের কাপে চুমুক দিল। মিতা একঝলক শংকরের মুখের দিকে তাকাল। চায়ে বিষ থাকলে শংকরের মুখটা এখন কেমন হত? সিনেমায় যেমন দেখায়, দু-হাতে নিজের গলা চেপে ঠিকরে পড়া চোখ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ত মিতার সামনে?

শংকর চায়ের কাপে নিশ্চিন্তে আরও দুটো চুমুক দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে টেবিলের ওপর রাখা খবরের কাগজটা বাঁহাত দিয়ে তুলে প্রথম পাতাটা দেখেই বলল, 'ধ্যাস শাহ্ খালি খুন আর রেপ,...এ ছাড়া কোনও খবরই থাকে না...না না না—হুঁ হুঁ...' মিতা বুঝল, সাতসকালে হঠাৎ একটা দয়াদাক্ষিণ্য করে এখন ফূর্তির তাল সামলাতে পারছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এল মিতা।

শংকর বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ দোকানে গেল। শাশুড়ি দুপুরে খেয়েদেয়ে পাশে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ার পর গোটা বাড়িটা চুপ। নীচে শুধু হারুর মা বাসন মাজার শব্দ করছে। তখন গতরাত থেকে শরীরের ভেতর ছোটাছুটি করতে থাকা জ্বালাটা নিস্তব্ধতায় আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠল মিতার। সব জ্বালাই তো সয়ে গিয়েছিল এতদিনে। কিন্তু কাল থেকে যেন...কেন যেন...তীব্র একটা অপমান..., মিতা বালিশ আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ,...অসহ্য! উঠে গিয়ে আলমারির মাথার ওপর তোলা বিয়েতে পাওয়া ভিআইপি বাক্সটা নামাল,...কিন্তু কোথায়? কোন চুলোয়? বাবা গত বছর ফার্স্ট স্ট্রোকেই আর ফিরতে পারেনি। মা আলসারে বিছানায়। ভাইটা বাড়ির এক পোরশন ভাড়া দিয়ে আর দিনরাত টিউশন করে সংসারে তাপ্পি মারছে। বাক্সটা আবার তুলে রাখল মিতা। গলার ভেতরে যেন একমুঠো বালি আটকে রয়েছে, জল খেল। তারপর অস্থিরভাবে নেমে এল নীচে। সদর দরজার সামনে হারু বসে আছে। তাকিয়ে ছেলেটাকে দেখল মিতা। রোগা ফর্সা চেহারা। বসে থাকলেও বোঝা যায় বেশ লম্বা। মাথা ভরতি তেল চুপচুপে ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল। মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফ। কিন্তু মুখটায় ভারি সারল্য মাখানো। চুপচাপ বসে থাকলে কে বলবে ছেলেটা প্রতিবন্ধী? হারু একমনে মেঝেতে আঙুল দিয়ে

কী সব লিখছে, আর বিড়বিড় করছে। ছেলেটা বেশ কিছুক্ষণ মিতাকে খেয়াল করল না। তারপর একবার চোখ তুলে মিতাকে দেখতেই যেন চমকে উঠল। দীর্ঘ চোখ দুটো দিয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল মিতার দিকে। কীরকম সেই তাকানো! ভিতরে শিরশির করে উঠল মিতার। পা দুটো যেন মাটিতে কামড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর প্রায় নিজেকে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল হারুর অমন ডুবিয়ে দেওয়া তাকানো থেকে।

সেই দিন

গতকাল বিকেল থেকে টাইমকালে জল আসছে না। বাথরুমে চৌবাচ্চায় জমানো যেটুকু জল ছিল আজ সকালে শংকর আর ওর মা স্নান করে শেষ করে দিয়েছে। শংকর দোকানে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর শাশুড়িও সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। শোভাবাজারে তার কোন পুরোনো বান্ধবী দিল্লি থেকে এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করে দুপুরে সেখানে খেয়েদেয়ে বিকেলে ফিরবে। অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকল মিতা। ক'দিন ধরে বুকের ভিতরে হঠাৎ করে ধড়ফড় করে উঠছে। শরীরটা ভীষণ দুর্বল। মাঝেমধ্যেই নিশ্বাস আটকে আসে যেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর উঠল মিতা। নড়তে-চড়তে ইচ্ছে করছে না। স্নানের কথা ভাবলেই মনে পড়ছে বাথরুমে এক ফোঁটা জল নেই। নীচে কলতলায় আরও একটা চৌবাচ্চা আছে। বাসন মাজার জন্য জল ভরা থাকে। আজকে বিকেলে হারুর মা এসে ওই জল দিয়েই বাসন মাজবে। তা হলে স্নান...নিমেষে বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দার তারে ঝোলানো নিজের গামছাটা ছোঁ মেরে নিল মিতা। সিঁড়ি বেয়ে এক ছুটে নেমে এল নীচে। চৌবাচ্চাটার সামনে এসে দাঁড়াল। শ্যাওলাপড়া চৌবাচ্চার ভেতর শিরশিরে কালচে পুরোনো জল। আঙুল ডোবাল মিতা। গোটা শরীর যেন ভিজে গেল সেই ছোঁয়াতে। এইটুকু জলেই আজ সারাদিন হয়তো বা আগামীকালও চালাতে হবে। কথাটা মনে হতেই কলকতলায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মিতা। মগে জল তুলে মাথায়

ঢেলে দিল। ঝিনঝিন করে উঠল গোটা শরীর। আর এক মগ ঢালতেই 'ওঁ-হ্' শব্দে সদর দরজার দিকে তাকাল মিতা। হারু বসে রয়েছে। গায়ে জামা নেই পাজামা হাঁটু পর্যন্ত ওঠানো। ভুরু কুঁচকে মিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছেলেটার কথা খেয়ালই ছিল না। মিতা গামছাটা টেনে বুকের ওপর চাপিয়ে নিল। তারপর আবার মগে করে জল তুলল। পুরো জলটা শেষ করতে হবে। একটুকু যেন পড়ে না থাকে। এক ফোঁটাও নয়। জল ঢালতে থাকে মিতা। একসময় আবার তাকাল হারুর দিকে। হারু অস্থিরভাবে মিতাকে দেখছে। মাছের গন্ধ পাওয়া বেড়ালের মতো দৃষ্টি। আচমকা বুকের ওপর থেকে গামছাটা ছুড়ে ফেলে দেয় মিতা। হারুর দিকে ঘুরে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে মগ উঁচু করে জল ঢালে মাথায়। গোটা শরীর বেয়ে জল নামে। ভিজে শাড়িটা মিতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। মিতা চোখ বুজে ফেলে। তবু যেন দেখতে পায় হারু কীভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে মগের পর মগ জল ঢালতে থাকে মাতালের মতো...

সব জলটুকু শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও চোখ বুজে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে মিতা। ধীরে ধীরে একসময় চোখ খোলে। ক্লান্ত নিশ্বাসে বুক ওঠা-নামা করছে। গোটা শরীরটা কেমন যেন চ্যাটচ্যাট করছে। হারুর ঠোঁটের কষ বেয়ে নামা গঁদের আঠার মতো লাল যেন লেগে রয়েছে তার গোটা গায়ে। মিতা প্রচণ্ড ঘেন্না নিয়ে আর একবারের জন্য হারুর দিকে তাকাতেই গোটা শরীরে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হারুর জায়গায় মিতা স্পষ্ট শংকরকে দেখছে। শংকরের চোখে দাউদাউ দৃষ্টি। কিন্তু নিষ্ফল, অসহায়, বেচারা!

সানন্দা

ডিসেম্বর ২০০৬

এক মানুষ, ছাই

ইলেকট্রিক চুল্লির ভেতর শুয়ে আছি আমি। কিছুক্ষণ আগে আমাকে এর ভেতর ঢোকানো হয়েছে। ট্রলিতে করে ডোম যখন আমাকে এই লাল টকটকে হাঁ মুখটার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছিল তখন ভীষণ ভয় করছিল আমার। ইচ্ছে করছিল উঠে দৌড়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার গোটা শরীর ব্যান্ডেজে বাঁধা। মর্গে পোস্ট-মর্টেমের পর আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বার করে দিয়ে সেলাই করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আমার কপালেও সেলাই।

ডোমটা আমার চোখদুটোও নিয়ে নিতে চেয়েছিল। পারেনি। কারা যেন বাধা দিয়েছিল। তাদের মুখগুলো অস্পষ্ট। চিনতে পারিনি। হয়তো বন্ধুরা হবে, কিংবা...অন্য কেউ। ঠিক জানি না। আমি যখন মর্গের বেডে শুয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম আমার পাশের বেডে শোয়ানো একটি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ের চোখ দুটো ডোমটা নিজের বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে কী অদ্ভুত কায়দায় বার করে নিয়েছিল।

তারপর সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এত চোখ নিয়ে সে কী করে? বিক্রি? দৃষ্টি বিক্রি করে। তার মুখে ঝাঁঝালো মদের গন্ধ। আমার ডান পায়ের থাইয়ের মাংস খুবলে খাচ্ছিল যে ধেড়ে ইঁদুরটা, সেটাকে অলসভাবে সরিয়ে দিয়ে আমার চোখের দিকে আঙুল বাড়িয়েছিল, নিতে পারেনি...ভাগ্যিস! কারা যে আটকেছিল একটুও মনে পড়ছে না। শুধু মনে আছে সন্ধেবেলা রেললাইন দিয়ে হাঁটা, অনেক দূরের আলো...আরও কাছে...আরও কাছে...তীক্ষ্ণ হুইসেল...ট্রেনের ধাতব চাকার শব্দ আমার শরীরের ওপর দিয়ে। এতটুকু রক্ত পড়েনি। ট্রেনে কাটা পড়লে রক্ত পড়ে না। অদ্ভুত! সারারাত লাইনের ওপর একা শুয়েছিলাম। পেটের ওপরের অংশ দুই লাইনের মাঝে আর বাকিটুকু লাইনের বাইরে। চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, চিৎ হয়ে। হিমে ভিজে যাচ্ছিল শরীর আমার। আকাশভরতি তারা। ঘন কালচে নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া শিফন মেঘ। ভালো লাগছিল আমার অমনি করে শুয়ে থাকতে। কতকাল শুইনি ওভাবে। ছোটবেলায় বাড়ির পাশের মাঠটায় রাত্তিরে মাঝেমধ্যে ওভাবে শুয়ে থাকতাম একা। আর আকাশ দেখতাম। তারাগুলো থেকে আলো বইত। হাওয়া বইত। মন হু-হু করে উঠত আমার। খুব ইচ্ছে করত ওখানে চলে যেতে। এই তারা থেকে এই তারায়। ওই গ্রহ থেকে সেই গ্রহে।...সারা রাত হিম মেখে নিবিড়ভাবে রাতের সঙ্গে থাকার সঙ্গে থাকার পর ভোরবেলা লোক এসে বস্তায় ভরে ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। মর্গে।

আমার গায়ে জড়ানো ব্যান্ডেজ কখন পুড়ে ছাই। মাংসপোড়া গন্ধে নিশ্চয়ই ভরে গেছে এই একমানুষ আগুন কুঠুরিটা। আগুন আমার সমস্ত জুড়ে। অথচ তাপের দহনের অনুভব নেই আমার। চিৎ হয়ে শুয়ে আছি গতকাল থেকে। পাশ ফিরতে ইচ্ছে হল আমার। ফিরতেই চমকে উঠলাম। আমার পাশের চুল্লির ভেতরটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওখানেও একইরকম আগুন জ্বলছে গনগন করে। একজন মানুষ শুয়ে। আমারই মতো। বড় তৃপ্তির সঙ্গে পুড়ছে। পুরুষের শরীর। চেনা চেনা মনে হল...সত্যি কি?

হয়তো মৃত্যুর পর কিংবা জ্বলতে থাকা সব মানুষকে একইরকম দেখতে লাগে। লোকটার বেরিয়ে আসা পাঁজরের হাড় আগুনের দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা। হাই তুলল একবার। তারপর মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। 'বাবা...তুমি!' প্রচণ্ড চমকে উঠলাম আমি। 'এখানে...কেন?' বাবা উত্তর দিল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। যেভাবে মানুষটা আজীবন সব কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকত। বোবা দৃষ্টি। কথাহীন তাকানো। প্রথম দিকে খুব রাগো হত আমার। পরে কষ্ট লাগত। জিগ্যেস করলাম, 'কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

আমার প্রশ্নে সামান্য হাসার চেষ্টা করল বাবা। দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে হাসি এল না। ঠোঁট অল্প ফাঁক হল শুধু। সামনে তিনটে ধবধবে সাদা দাঁত দেখতে পেলাম। ওই তিনটে দাঁত অনেকদিন আগে থেকেই ছিল না। ফাঁকা ছিল। বাঁধিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল লোকটার। করে উঠতে পারেনি। কবে বাঁধাল কে জানে? গোঁফদাড়িও নিপুণভাবে কামানো। দেখলেই মনে হয় সুন্দর আফটার শেভ লোশনের গন্ধ বের হচ্ছে। জিগ্যেস করলাম, 'দাঁত বাঁধিয়েছ?'

ঘাড় নাড়ল বাবা। তারপর হাড় বার করা সাদা হাতের মুঠোর তার জড়ানো ছোট্ট চৌকোমতো একটা জিনিস তুলে ধরে দেখাল। হিয়ারিং-এইড! আশ্চর্য এসব কখন কিনল? কাল বিকেল পর্যন্ত যতক্ষণ আমি বাড়ি ছিলাম এসব কিছুই দেখিনি তো। আমি যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি তখন বাবা বাটিতে জল-মুড়ি খাচ্ছিল বিছানায় বসে। দাঁতের জন্যে শুকনো মুড়ি চিবোতে অসুবিধা হত। জলে ভিজিয়ে চুষে খেত। বাবা আরও একটা কী যেন বাঁ-হাতে ধরে রয়েছে, চোখে পড়ল আমার। সোনালি ফ্রেমের চশমা। পালিশ ওঠা মোটা কালো ফ্রেমের ঘষা ঘষা লেন্সের চশমাটা আমি আজীবন বাবার চোখে দেখে এসেছি। কখন কিনল এত কিছু! আর আমাকে এভাবে এখন দেখাচ্ছে কেন? রাগ হয়ে গেল আমার। যা হোক কিছু একটা আমারও দেখাতে ইচ্ছে করল বাবাকে।

কী দেখাব ভাবতেই দেখি আমার পুড়ে ছাই হয়ে আসা পায়ের কাছে একটা লাল টুকটুকে প্লাস্টিকের বল, ব্যাট। খেলনা রেলগাড়ি। আমার বুকের ওপর জড়ো করে রাখা আছে অজস্র গল্পের বই, দামি ক্যাডবেরি। আমার হাতের মুঠোয় ধরা তুলি, প্যাস্টেল রং, ড্রয়িং খাতা। চমকে উঠলাম আমি। এগুলো কখন এল এখানে? কীভাবে এল? আমার আশৈশবের না পাওয়া সুখগুলো কীভাবে চলে এল এখন! এই সব জিনিসগুলো কেউ আমরা কখনও পাইনি। পরস্পরকে দিতেও পারিনি। বাবা কি একদৃষ্টে এগুলোই দেখছিল এতক্ষণ? একটা লোকাল সিনেমা হলের লাইটম্যান ছিল আমার বাবা। সেই হলে আমি দুবার সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। নেতাজি সুভাষচন্দ্র আর আফ্রিকান সাফারি। একবার মায়ের সঙ্গে আর একবার সাধনামাসির সঙ্গে। হলের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথাও এতটুকু হোঁচট না খেয়ে আমাদের বসার চেয়ারে কী নিপুণভাবে একবার টর্চের আলো ফেলেছিল বাবা। অহংকারে ফুলে উঠেছিল সে দুদিন আমার ছোট বুক। এত অন্ধকারেও বাবা সব দেখতে পায়। সব অন্ধকার বাবার চেনা। সমস্ত কোণ, সমস্ত দিক। পরে একটু বড় হওয়ার পর বুঝেছি বাবার আসলে ওইটুকু অন্ধকারই চেনা ছিল। বাকি সব অন্ধকারে আমার মতোই হাতড়াত, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ত। আমি যেমন প্ল্যানেটোরিয়ামের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও কৃষ্ণার ঠোঁটে একেবারে চুমু খেতে পারতাম, ব্লাউজে হাত ঢুকিয়ে ব্রায়ের হুক খুলে ফেলতে পারতাম। আলো কিংবা অন্ধকার আসলে কিছুই নয়। সবটাই অভ্যাস।

সিনেমা হলটা ধুঁকতে শুরু করেছিল। মফস্‌সল অঞ্চলে কেব্‌ল লাইন ঢোকার পর থেকে হলগুলোতে আগের মতো ভিড় হত না। মালিক নতুন সিনেমা আনা বন্ধ করে ব্লু ফিল্ম দেখাতে শুরু করল পয়সা তোলার জন্য। হলের বাইরে হিন্দি ছবির পোস্টার। ভেতরে মালয়ালম কিংবা ইংলিশ টু বা থ্রি। ইয়ং ছেলেরা ভিড় করত। আমার বন্ধুরাও যেত। বাবা মাথা নীচু করে অন্যদিকে তাকিয়ে তাদের সিট দেখাত।

ভেঙে যাচ্ছিল লোকটা। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারতাম। তবু শেষপর্যন্ত সিনেমাহলটা বন্ধ হয়ে গেল। অভ্যাস হয়ে গেল বাবার বাড়িতে বসে যাওয়া। মা-র সারাদিনের চিৎকার, অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া আর সাধনামাসির সঙ্গে বাবার অদ্ভুত সম্পর্ক। মায়ের দূর সম্পর্কের বোন ছিল সাধনামাসি। ছোটবেলায় দেখতাম মাঝেমধ্যেই আমাদের বাড়ি আসত। আমার জন্য লজেন্স, বিস্কুট কখনও চানাচুর নিয়ে আসত। বাবার সঙ্গে গল্প করত মায়ের থেকে বেশি। মা প্রথম দিকে কিছু না বললেও পরের দিকে মুখ গম্ভীর করে থাকত। আমি মা-র সঙ্গে তখন কোনও কথা বলতে গেলে আমাকেও অকারণ ঝাঁঝিয়ে উঠত। তখন খুব রাগ হত আমার মাসির ওপর। আমি বুঝতে পারতাম ও বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে কথা বলছে বলেই আমাকে বকা খেতে হচ্ছে।

মাসি একটা অদ্ভুত রকমের কাজ করত। কলকাতার অফিসে গিয়ে গিয়ে টেলিফোন মোছার কাজ। বেশ কয়েকটা অফিস ধরা ছিল মাসির। প্রত্যেক জায়গায় সপ্তাহে একদিন করে। মাসে কোথাও তিনশো। কোথাও দুশো। সব মিলিয়ে পনেরোশোর মতো হত। সারা বছর ভোর চোরটেয় উঠত মাসি। সাড়ে পাঁচটার ট্রেন ধরত। রাত্তিরে শুতে শুতে সাড়ে এগারোটা থেকে বারো। এক বার জিগ্যেস করেছিলাম, 'মাসি, তুমি বিয়ে করোনি কেন?'

শত কোঁচকানো চামড়ায় ঢাকা তোবড়ানো গালের ভেতর থেকে ভাঙাচোরা দাঁত বার করে হেসে মাসি বলেছিল, 'আমি বিয়ে করলে ও-দুটোকে কে দেখত?'

মাসির ভাই একটা চাউমিন ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। অ্যাজমার রোগ ছিল ছেলেটার। সে মারা যাওয়ার পর ভাইয়ের বউ আর ছেলেকে টানত মাসি। আজীবন। নিঃশব্দে। কথাগুলো বলার সময় মাসির চিবুক বেয়ে টুপটুপ আলো ঝরে পড়ছিল। এত আলো!

আমি বুঝতাম বাবার সঙ্গে সাধনামাসির কোনওদিনই কোনওরকম শারীরিক যোগাযোগ নেই। বুকের বদলে মাসির কণ্ঠার হাড় উঁচু হয়ে

থাকত। খনখনে মৃদু গলা। প্যাঁকাটি হাতে সেফটিপিন ঝোলানো দুটো চুড়ি আমার আজও মনে আছে। আর মাসির সেই ছেঁড়া ফাটা, জীর্ণ কালো ব্যাগটা, যার মধ্যে রাখত স্পিরিট, তুলো, ন্যাকড়া, কলিন—কাজের জিনিসপত্র। আমি বোতল খুলে স্পিরিটের গন্ধ শুঁকতাম। হাতে লাগাতাম। ঠান্ডা লাগত। বাবা দেখতে পেলে ধমক লাগাত—'অ্যাই, ছিপি বন্ধ কর।' মাসি বলত, 'আহা, বকছ কেন ওকে, থাক না।'

আমার মায়ের মৃগী ছিল। হঠাৎ হঠাৎ দেখতাম দাঁতে দাঁত লেগে শুয়ে পড়ে ঠকঠক করে কাঁপত। ভীষণ ভয় করত দেখে। বাবা তখন মায়ের মুখে চামচ ঢুকিয়ে, পায়ে চাবি ঘষে, কখনও জুতোর গন্ধ শুঁকিয়ে ঠিক করত। একদিন মা দুম করে মরে গেল, দুপুরে একা পুকুরে চান করতে গিয়ে। হঠাৎ করে রোগটা চেপে বসেছিল। মা তখন জলের মধ্যে। বাবা কখনও মাকে পুকুরে চান করতে দিত না। মা-ও যায়নি কোনওদিন। সেদিন হঠাৎ একা একা কেন গিয়েছিল কে জানে! জলের ওপর উপুড় হয়ে মায়ের ভেসে থাকা শরীর আমি কতদিন স্বপ্নে দেখে ভয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছি। আমার মা আজীবন কী চেয়েছিল বাবার কাছে? আমার কাছে? কে জানে। মা সেদিন হঠাৎ পুকুরে চান করতে গিয়েছিল কেন তাও জানি না। মা মারা যাওয়ার পর সাধনামাসি আর ঠিক একদিন এসেছিল আমাদের বাড়িতে। আমার তখন ধড়া নেওয়া, অশৌচ। আর কোনওদিন আসেনি। স্টেশন-বাজারে একদিন সন্ধেবেলা বাবা আর সাধনামাসিকে মাছ কিনতে দেখেছিলাম। কাটাপোনা, বাবা খেতে ভালোবাসত। কার জন্য কে কিনছিল দেখতে ইচ্ছে হওয়ার আগেই সরে গিয়েছিলাম ওখান থেকে। কে যে কাকে কীভাবে চায়? আমাদের পাশের পাড়ায় বাড়ি ছিল মাসির। আমি জানতাম বাবা মাঝেমধ্যে যেত ওদের বাড়িতে। আমার ভালো লাগত। দুটো একলা মানুষ এত তীব্র অথচ নিস্পৃহভাবে পরস্পরের কাছে থাকত দেখে ভীষণ ভালো লাগত আমার। অথচ আমি আর কৃষ্ণা কখনও এভাবে থাকতে পারিনি। কৃষ্ণার শরীর আমার কাছে মুক্তির মতো ছিল। জংলি গাছের মতো ওর গায়ের গন্ধে

আমি অবশ হয়ে পড়তাম। এত আদিমতা, এত অরণ্য ছিল ওর শরীর জুড়ে। সময়ের পর সময় পার করে আমি খুঁজে যেতাম ওর উৎসকে। আমার পাগলামো দেখে ও হাসত। বলত, 'এত কী খোঁজো বলো তো, সবই তো চেনা তোমার।'

'জানি না।'

'পাগল কোথাকার!'

সত্যিই...কী যে খুঁজতাম? স্তন, বাহুমূল, নাভি, ওর শরীরের প্রতিটি রোম আমার চেনা ছিল তবু কীই যে...কেন যে! শুধু কি আমিই? আমার শীর্ণ খোলা শরীরটায় কৃষ্ণা নরম আঙুলের ছোঁয়া রেখে বলত ফিসফিস করে, 'তোমার শরীর বুদ্ধের মতো। এত সুন্দর রেখা, যেন চুঁইয়ে পড়ে।' ওর কথায় আমি সত্যি সত্যি ঈশ্বর হয়ে উঠতাম তখন। কোনও নারী কোনও পুরুষকে বুদ্ধের শরীরের সঙ্গে...নিজেকে আকাশ মনে হত আমার। কৃষ্ণা ভালোবাসত আমাকে, আমার আঁকা ছবিগুলোকে। ছোটবেলা থেকে একটা ভালো পেনসিল, রং কিংবা কাগজ না পাওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনভাবে আমি ভালো ছবি আঁকতে পারতাম।

রাজনীতি করত কৃষ্ণা। বোমা-বন্দুকের রাজনীতি, যে আঙুল ছুঁয়ে আমাকে ও ঈশ্বর করে দিত সেই আঙুলেই পিস্তলের ট্রিগার ধরত। অবাক লাগত আমার। বলতাম, 'কী করে পারো তুমি?'

উত্তরে ও শুধু হাসত। আমি বলতাম, 'তোমার সত্যি কি মনে হয় এই ভাবে সমাজ বদলানো যাবে?'

'চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?'

'ক্ষতি চেষ্টার নয়, তোমার।'

'তুমি কাওয়ার্ড।' আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিল ও।

'শুধু আমি নয়। আমরা সবাই কাওয়ার্ড। সবাই ভয় পেয়ে বেঁচে আছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি ছবি আঁকছি, তুমি বন্দুক ধরছ। আমার বাবা সাধনামাসির কাছে যাচ্ছে। এই সব কিছু আসলে ভয়েতে। পালানোর জন্য।'

'এগুলোকে পালানো বলে না।'

'হ্যাঁ, বলে।'

'বেশ। তুমি যেভাবে ভাবতে চাও।'

'আমার সঙ্গে থাকবে কৃষ্ণা?'

'আমি কি তোমার সঙ্গে নেই।'

'আছো—ও, প্রতি মুহূর্তের জন্য চাই তোমাকে। বিয়ে করবে আমায়?'

'...না।'

'কেন নয়?'

'...ভয় করে আমার।'

'ভয়! কীসের?'

'জানি না...ঠিক জানি না...কিন্তু...'

'ব্যাগের ভেতর পিস্তল রাখতে ভয় করে না। পুলিশের তাড়া খেয়ে দৌড়োতে ভয় করে না?

'এগুলো আমাকে করতেই হবে। আমার যে আর কিছু জানা নেই। আর কিছু পারি না।' কৃষ্ণার অবস্থাও প্রায় আমার মতোই ছিল। বাবা নেই। ভাই জন্ম থেকে পঙ্গু, মা আলসারের রুগি, পার্টি থেকে হাজার দেড়েক টাকা পেত। ওতেই সংসার চালাত।

'পেটের দায়ে সমাজ সংস্কার করো তুমি! সোশ্যাল রিফর্মারের চাকরি। ছিঃ! লজ্জা করে না তোমার।'

'না করে না। বাঁচতে লজ্জা করে না আমার।'

এর পরেও আমাদের দেখা হত। আমরা কখনও গাদিয়াড়া গেছি। কখনও দিঘা। একবার রিস্বিক। মনে আছে, জঙ্গলের ভেতর বিশাল একটা গাছের গায়ে জমে থাকা শ্যাওলায় আলতোভাবে আঙুল রেখে চোখ বুজে ফেলেছিল কৃষ্ণা। আশ্লেষে। আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম গাছ নয়, বিরাট এক পুরুষের চওড়া বুকের রোমে আঙুল ছুঁয়ে রেখেছিল ওই মেয়ে। চোখ বুজে থিরথির করে কাঁপছিল তখনও। পরে আমি সেই ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিলাম বারবার। পারিনি। কেন পারিনি, জানি না। একটুও

পারিনি...। কী যেন নাম ছিল ছেলেটার—সৈকত। কৃষ্ণার সঙ্গে রাজনীতি করত। সুন্দর চেহারাটার মতো কথাও বলত সুন্দর। কৃষ্ণাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল একদিন আমার সঙ্গে। ডাক্তারি পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে জঙ্গি রাজনীতি করতে চলে এসেছিল বড়লোক বাবার একমাত্র ছেলে। সুখের জীবনযাপন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণার মতোই লুকোনো, পালানো জীবন বেছে নিয়েছিল। কার যে কোন জীবন ভালো লাগে? কে যে কেমনভাবে ঠিক বাঁচতে চায়?—এত কঠিন...পুরোনো সব কথাগুলোর মতো হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি। সম্বিৎ ফিরতে দেখি বাবা চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই পায়ের ওপর পা তুলে খবরের কাগজ পড়ছে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমাটা। পাশে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। মুখে দামি লম্বা সিগারেট। সুখী সুখী দেখতে লাগছে বাবাকে। এখন বাবার বুক জ্বলছে। পেটের পর থেকে নীচের বাকিটুকু নেই। সব পুড়ে খাক। নিজের দিকে তাকালাম আমি। আমারও তাই। বুকের কাছে আগুন। ডাকলাম 'বাবা।'

বাবা মুখ ফেরাল। সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়লাম, 'তুমি কি সাধনামাসিকে ভালোবাসতে?'

বাবা কি শুনতে পেল না? আমার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। আমি আরও জোরে বললাম কথাটা। আরও জোরে—দু-তিনবার। বাবা চুপ থাকল তবু। সারাজীবন চুপ থাকলে কেন?—একটা কথার উত্তর দিতেও ভয় করে? অ্যাঁ, ভয় করে? কাপুরুষ। বলতে পারো না, হ্যাঁ ভালোবাসতাম। মিথ্যেই না হয় বলতে। সেটুকু সাহসও নেই? আমি কিছু জানি না, কিছু দেখেনি ভেবেছ? একদিন বিকেলে, মা তখন ঘরে ছিল না, সাধনামাসি আমাদের ঘরে কাঁদতে কাঁদতে তোমাকে বলেছিল, 'আমি জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেলাম সুকুদা।' মাসিকে সেই প্রথম কাঁদতে দেখেছিলাম আমি। তুমি তখন ওর শিরা ওঠা হাতের ওপর হাত রাখোনি? আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম, খোঁচা খোঁচা শুকনো কাঁচা-পাকা দাড়ির ভেতর তোমার চিবুক কেঁপে উঠেছিল।...কথাগুলো বলতে পারলাম না।

এতটা তুচ্ছ সামান্য মানুষের পরম গোপনীয় মুহূর্তটুকু চিৎকার করে উলঙ্গ করে দিতে ইচ্ছে করল না। উলটে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি বললে না তো কেন এসেছ এখানে? কীভাবে?' বাবা আমার প্রশ্নে ঠোঁট নাড়াল। কথাগুলো কানে না পৌঁছোলেও বুঝতে পারলাম বাবাও আমাকে একই প্রশ্ন জিগ্যেস করছে।

'আমি ভেবেছিলাম না পাওয়াগুলো মানুষের বোধহয় একসময় অভ্যাস হয়ে যায়। যায় না। কিচ্ছু অভ্যাস হয় না আসলে। শুনতে পাচ্ছ? হয় না। কোনওদিন হয় না। আজীবন ধরে...' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাবা ওপাশ ফিরল। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'তুমি এখনও এভাবে পিছন ফিরতে পারো না। আমার কথাগুলো শুনতে তুমি বাধ্য। আমার এই অবস্থার জন্য তোমারও কিছু কৈফিয়ত দেওয়া উচিত।' কথাগুলো বলতে বলতেই আগুন আমার বাঁ-চোখ ছুঁল, ফটাস করে ফেটে গেল চোখটা। একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথাটা গরম হয়ে গেল আমার। জোর গলায় বললাম, 'আর্ট কলেজে পড়তে পারিনি তোমার কথা ভেবে। টিউশন করে যেটুকু রোজগার করতাম তার প্রায় সবটাই দিয়ে দিতে হত সংসারে। কোনওদিন এতটুকু খোঁজ নিয়েছিলে, আমার কী চাই? তুমি কি এটুকুও জানতে কাল আমার বত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। জন্মদিন ছিল আমার। কাল কতদিন পরে সারাদিন ধরে একটা ছবি এঁকেছিলাম আমি। কার ছবি জানো? সাধনামাসির। ওর মুখটা হঠাৎ কেন আঁকলাম জানি না। সাধনামাসি এখন কোথায় বলতে পারো? পেটে ক্যানসার ধরা পড়ার পর একদিন কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে চলে গেল মাসি, কেন পালিয়ে গিয়েছিল, বাবা? মাসি তো পালিয়ে যাওয়ার মানুষ ছিল না। জানো না তুমি? মাসির ভাইয়ের বউ এখন ক'বাড়ির রান্নার কাজ করে। ছেলেটা ক্লাস এইট। ও যখন খুব ছোট, মাসি আমাকে বলেছিল, 'জানিস, বাবুটার পড়াশুনোয় মাথা খুব ভালো। কী বলে শুনবি, বলে বড় হয়ে নাকি ইঞ্জিন হবে। মানে বুঝলি...ইঞ্জিনিয়র' বলে মাসির সেদিনের হি-হি করে হাসি আমার আজও মনে আছে।

কোথায় চলে গিয়েছিল বাবা, সত্যি কি জানতে না তুমি? কেন শেষপর্যন্ত পালিয়ে গিয়েছিল একটুও জানতে না? তাহলে মাসির চলে যাওয়ার পরেও, তোমাদের এতদিনের সম্পর্কের পরেও তোমার মনে এতটুকু দাগ কাটল না! তুমিও কি ভয় পেয়েছিলে? কীসের? একেকদিন ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করত মাসিকে। কোনওদিন বলিনি তোমাকে। কারণ জানতাম তোমাকে কিছু বলে কোনও কোনও লাভ নেই। তুমি কিচ্ছু পারো না। কিস্যু না। দিতেও না। নিতেও না। শুধু পালাতে আর না পারতে আর পেতে শিখেছিলাম তোমার কাছে। বাড়িতে যতটুকু সময় থাকতাম, দেখতাম কী একটা পরলোকতত্ত্বের বই খুলে তুমি বসে আছ। তখন ভীষণ ঘেন্না হত তোমার ওপর। একটা গুটিয়ে যাওয়া কেন্নোর মতো মনে হত তোমাকে। ইচ্ছে হত কৃষ্ণর কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে এসে তোমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলি কিছু একটা করো, যা হোক কিছু। কোথাও পালিয়ে যাওয়া যায় না বাবা। কোনও জায়গা নেই। আমি অন্তত এটুকু বুঝেছিলাম, তুমি বোঝোনি। শুধু দৌড়ে বেড়ালে। ঘরে চুরি করতে আসা বেড়ালটাকে জানালা-দরজা সব বন্ধ করে দিয়ে তাড়া করলে ওটা যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে এলোপাথাড়ি ছোটাছুটি করতে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে ছুটেছ তুমি। জীবনভর। এই উদাহরণটা অবশ্য আমার বানানো নয়। অংশু একদিন আমাকে মানুষ প্রসঙ্গে কথাটা বলেছিল। ও আপ্রাণ সরকারি চাকরির চেষ্টা করত। দিনরাত এক করে খাতা-বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকত। একটার পর একটা পরীক্ষা দিত। আমিও কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলাম ওর সঙ্গে। ও পেয়ে গেল। আমি পাইনি। রাইটার্সে চাকরি করে এখন। পরশু বিকেলেও দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। দোকানে নিয়ে গিয়ে এগরোল খাওয়াল জোর করে। তারপর চা খেয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে নিজে একটা ধরিয়ে আরেকটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বেশ লাজুক গলায় বলল সামনের মাসে বিয়ে করছে। বর্ধমানের মেয়ে। আমাকে নাকি দু-দিন আগে থাকতেই হবে।...আরও কত কিছু বলে যাচ্ছিল গলগল করে। বিশ্বাস করো বাবা ওর মুখ দেখে

আমি ভেবেছিলাম প্রচণ্ড হিংসা হবে আমার। জ্বলেপুড়ে যাব। স্যাঁতসেঁতে ড্যাম্প খাওয়া দেওয়ালের মতো। সেদিন সত্যি সত্যি আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছিল আমার। হিংসাটুকুও...। অনেকক্ষণ ওপাশ ফিরে রয়েছ তুমি। তুমি কি ঘুমোচ্ছ? আমি জানি, তুমি ঘুমোচ্ছ না। আমার প্রতিটা কথা প্রতিটা শব্দ শুনছ। আজীবন যেভাবে না শোনার ভান করে উদাসীন সেজে শুনে গেছ সবার কথা। রাগের, দুঃখের, ভালোবাসার, আনন্দের সব কথার একই অভিব্যক্তি ছিল তোমার মুখে। 'একবার আমার দিকে ফিরবে?—প্লিজ! কিছু বলবে আমাকে?—বাবা...' কথাটা শেষ করতেই আমার গলায় আগুন ধরল। পাশ ফিরল বাবা, ঠোঁটে আগুন জ্বলছে। বাবা কথা বলার জন্য সামান্য হাঁ করতেই ভলকে ভলকে মুখের ভেতর থেকে আগুন বেরোতে থাকল শুধু। কিছু শুনতে পেলাম না আমি।

'আর একটু জোরে বলবে তুমি? আর একটু...'

বাবা বলতে গেল প্রাণপণ। শুধু গলগল করে আগুন। বাবার দুটো চোখই ফট করে জ্বলে গেল একসঙ্গে।

'কী হল বলো? কেন বলতে পারো না তুমি? বলো'—চিৎকার করে উঠলাম। দুটো চোখের কোটর দিয়ে, গলা দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছে। দুহাতে আগুনটা চেপে ধরে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিল বাবা। তারপর হাতে তুলে ধরল একটা কাগজ। আমি কাগজটার দিকে তাকালাম। বিচ্ছিরিভাবে খাতা থেকে ছেঁড়া রুলটানা কাগজটায় আঁকাবাঁকা হাতে লেখা—'আমার আর কোনও উপায় ছিল না সুকুদা। বিশ্বাস করো। ওদের সামনে মরে যেতে আমার লজ্জা করত।'

সাধনামাসি, তুমিও। তুমিও ভয় পেতে?—এসব তুমি এতদিন পরে কেন দেখাচ্ছ আমাকে?...আচ্ছা বাবা, তুমি আমাকেও ভালোবাসতে, না? আমি জানি বাসতে। মা যখন রেগে গিয়ে আমার ছবি আঁকার কাগজ, রং, তুলি সব ছুড়ে বাইরে ফেলে দিত তখন পরে সবার আড়ালে তুমি ওগুলো যত্ন করে কুড়িয়ে আবার তুলে রাখতে। আমি দেখেছি। তুমি

মাকেও ভালোবাসতে, না? ভালোবাসতে এত ভয় করে কেন বলতে পারো?

জানো কৃষ্ণা কনসিভ করেছিল। একদিন দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। আমি জানতাম বাচ্চাটা নিশ্চয়ই সৈকতের। বিয়ে না করে মা হওয়ায় পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট হবে বলে ওকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। আমি জানতাম কৃষ্ণা কিছুতেই পার্টির কাছে সৈকতের নাম বলেনি। ওকে আমি চিনি। আমার কাছেও বলেনি নামটা। আমিও জিগ্যেস করিনি। ওর সুন্দর চোখদুটো আরও সুন্দর লাগছিল সেদিন। বাঘ-সিংহ খেলনা বানানোর একটা কারখানায় কাজ পেয়েছিল ও। কৃষ্ণা চলে যাওয়ার পরেও আমি ওখানটায় একা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। হাওয়া দিয়েছিল খুব। হাওয়াতে সত্যি সত্যি দুধের গন্ধ ছিল তখন।

...আমার এইটার ভেতরে কতক্ষণ হল আছি? এক ঘণ্টা? আরও বেশি? পুরোটা কেন ছাই হচ্ছি না বাবা? ওই তো তোমার হাত-পা-পেট-বুক সব পুড়ে খাক। আমারও। শুধু মাথাটা...ওহ্ মাথাটা যে কখন...শুধু তুমি আর আমি কেন? আর কেউ নেই? তুমি কীভাবে এলে বললে না তো। বলবে না। আচ্ছা থাক। লজ্জা পাচ্ছ বলতে। 'জানো বাবা, ট্রেনটা যখন আমার খুব কাছে চলে এসেছিল, যখন আমার আর সরে যাওয়ার উপায় নেই, তখন একমুহূর্তের জন্য ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করেছিল আমার। সত্যি সত্যি। শা...ল্ ল্া হ্! তোমারও তাই হয়েছিল কি? বলো না, হয়েছিল? নিশ্চয়ই হয়েছিল। অথচ জানো তার একটু আগে পর্যন্তও মরতে একটুও রাগ হয়নি আমার। তোমার?'—কথাগুলো বলতে বলতেই দেখলাম বাবার মাথাভর্তি আগুন ভরে গেছে। দাউদাউ করে জ্বলছে মাথা। আমারও জ্বলছে। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে আগুনের। অনেকটা ঝিঁঝির মতো। ঘিলু-শিরা-উপশিরা সব কিছু ধকধক করে জ্বলে উঠে আমার খুলিটা ফটাস করে ফেটে যাওয়ার শব্দে হতেই ধড়মড় করে আমি উঠে বসলাম বিছানায়। ঘেমে স্নান করে গেছি। চোখ খুলে দেখলাম আমাদের টিনের চালের ছোট্ট গুমটি ঘরটার মাঝখানে চৌকিতে বসে

আছি আমি। একটা স্বপ্নে রাত ভোর হয়ে এসেছে। ছোট জানলার পরদা সরিয়ে ভোরের প্রথম আলো আর মিহি ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে ঘরের ভেতর। আমি পাশে তাকালাম। বাবা শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে। বিছানা ছেড়ে সন্তর্পণে উঠতে যাচ্ছি শুনতে পেলাম পিছন থেকে বাবা ঘুমজড়ানো অলস গলায় বলে উঠল তোর পিঠে ছাইয়ের গুঁড়ো লেগে রয়েছে মুছে নিস।'

আমার সময়
জুলাই, ২০০৮

প্রতি রবিবার

উঃ, প্রথমটায় যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বাব্বাহ্! আহা, আমার কী দোষ? জীবনে প্রথমবার প্লেনে চাপলে সবারই কমবেশি ভয় লাগে। লাগে না? আচমকা মাটি ছেড়ে সাঁই করে যখন ওপরে উঠল আমি তো ভয়েতে সিঁটিয়ে শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরেছিলাম। আমি জানলার ধারে বসেছিলাম নীচে দেখব বলে। ও তখন আমার হাতের ওপর আলতোভাবে হাত রাখতেই ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। ও মানে?

আমার বর, আবার কে? ও অবশ্য আমার মতো এই প্রথম বার প্লেনে চাপেনি। প্রত্যেক মাসে দু-তিনবার করে ফ্লাইটে আজ দিল্লি কাল বম্বে করে বেড়াতে হয় অফিসের কাজে। দুবার আমেরিকাও গেছে। আমি তো শুনে ঠিক করেই রেখেছি এরপর যখন আবার যাবে আমাকেও নিয়ে যেতে বলব। যেতেই হবে নিয়ে। ওই দেশটাকে দেখার শখ সেই ছোট্ট থেকে। ও 'MNC'-তে উচ্চপদে কর্মরত 29/5'9" সুদর্শন ব্রাহ্মণ'। এত

ফর্সা ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। মাথা ভরতি ঘন কালো চুল। দাড়ি কামালে গালের রং হালকা সবুজ হয়ে যায়। এত সুন্দর লাগে তখন দেখতে। ওর গা থেকে সবসময় নরম সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়। একটু পাশে থাকলে আমার গায়েও লেগে যায় গন্ধটা। কীসের গন্ধ কে জানে? আমিও তো পারফিউম মাখি, কিন্তু এমন সুন্দরভাবে গন্ধ বের হয় না তো! এখন দুজন যাচ্ছি বম্বে। সেখানে দু-দিন থেকে তারপর গোয়া যাব হনিমুনে। হি-হি! এই তো ক'দিন আগেই বিয়ে হয়েছে আমাদের। পরশু অষ্টমঙ্গলা সেরে আজই বেরিয়ে পড়েছি দুজনে। এরপর নইলে ও আবার ছুটি পাবে না। এত দূরে কোথাও বেড়াতে জীবনে প্রথম যাচ্ছি। আনন্দে-ভয়ে কেমন যেন করছে শরীরে। অস্থির অস্থির। মুম্বই পৌঁছেই মাকে ফোন করার কথা মনে রাখতে হবে—হবে—হবে। খুব চিন্তায় আছে আমার জন্য। সারাজীবনই চিন্তা আমাকে নিয়ে ছিল। প্লেনের ভেতরটা এত সুন্দর! খুব সুন্দর দেখতে একটা এয়ার হোস্টেস একটু আমাকে কফি দিয়ে গেল। মুখে সবসময় হাসি। আমার বরের দিকে একটু যেন বেশি ঝুঁকেই দিল কফির কাপটা। যাহ্ আমার যত রাজ্যের উলটোপালটা ভাবনা। আমি জানলা দিয়ে নীচে তাকালাম। ই-শ! নীচে সব গুঁড়িগুঁড়ি এইটুকুন হয়ে গেছে। এত্ত উঁচুতে উঠে গেছি!

রাস্তা-ঘাট-জমি-মানুষ-নদী-পাহাড়-সমুদ্র সব ছোট্ট-ছোট্ট...আমি 'অনূর্ধ্বা তেইশ। পরমাসুন্দরী, কনভেন্ট এডুকেটেড'...ভাবতেই বুকের ভেতরটা থিরথির করে উঠল। আমি সঙ্গে সঙ্গে নীচে চোখ নামিয়ে ফেললাম।

আমার স্বামীর বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে বিশাল বড় গয়নার দোকান। দোকানের নাম বললেই সবাই চেনে। চারদিকে খুব অ্যাড দেন তো। সারাদিনে দোকানে সাদা হলুদ আলো কাচের দেওয়ালে ঝলমল করে। ও '43/5'1"', আমার থেকে একটু বেঁটে। সে হোক গে। গায়ের রংটাও...তা যাক গে। চেহারাটা বিশাল ইয়ে...মানে...ধুৎ, অত দেখলে চলে! গোটা দিন দোকানে টেবিলে ফ্যানের সামনে বসে (এখনও এসি

লাগায়নি, খুব হিসেবি)। বিনবিন করে ঘামে। পাঞ্জাবির পিঠ, বগলের চারপাশ, ঘাড়ের খাঁজ ঘামে জ্যাবজ্যাব করে। কার্তিক ঠাকুরের মতো চুল। জুলফির পাশে কিছু পাকা। গলায় সোনার চেন—নাভি পর্যন্ত ঝোলানো। ডান হাতের আঙুলে চারটে আর বাঁহাতে দুটো মোটা মোটা পাথর বসানো সোনার আংটি। আমার গায়েও গয়না ভরতি। 'উঃ কলিতে নিজস্ব বাড়ি' ওদের। যেমন বড় তেমনি পুরোনো। বাড়িটার ভেতরে পা রাখলেই কেমন একটু ঘুম ঘুম আলস্যমাখা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। দোতলায় যাওয়ার আবছা অন্ধকার সিঁড়ি। চৌখুপি উঠোনের এক পাশে কলতালায় ডাঁই করা থাকে এঁটো বাসন, অতবড় বাড়িটা গরমকালের দুপুরের মতো চুপচাপ সবসময়। শুধু কাজের মাসি এলে বাসনের শব্দে একটু জেগে ওঠে। এ-বাড়ির অনেক শরিক, অনেক ঘর কিন্তু এরা ছাড়া আর কেউই থাকে না এ বাড়িতে। দরজায় দরজায় তালা ঝোলে। এদের ফ্যামিলি খুব রক্ষণশীল। বাড়ির বউদের একা একা বাইরে বেরোনো নিষেধ। এখানে আমি টায় টায় তিরিশ। আমি 'পঃ বঃ স্বর্ণবণিক, প্রকৃত ফরসা সুন্দরী।' বিয়েতে এদের 'কোনও দাবি নেই' থাকলেও বাবাকে ঢের দিতে হয়েছিল। আমার এই স্বামী সারাদিন ধরে নিক্তির ওজন আর নোট গুনতে গুনতে কেমন যেন ল্যাদাঠে মেরে গেছে। রসকষ নেই। রাত্তিরবেলা...যাকগে। আমার 'ছবি সহ পত্রালাপ' হয়েছিল। সেই সবুজ রঙের শাড়ি পরা পোস্টকার্ড সাইজ ফটোটা, যেটা সব জায়গায় পাঠাই, ওটাই পাঠিয়েছিলাম। ওদের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তারপর কথাবার্তা, বিয়ে, সব ঝটপট। ওরা জানে না আমি ডিভোর্সি। বিয়ের আগে বলাই হয়নি। জানতেও পারবে না কোনওদিন। আমার বিয়ে তো হয়েছে উত্তরপাড়ায় মামাবাড়ির থেকে। আমার নিজের বাড়ি দিয়ারার পাড়াপ্রতিবেশীরা জানেই না আমার এই বিয়ের কথা। কাজেই এরা জানবে কী করে? ওরা জানে আমি ফার্স্ট হ্যান্ড। কিন্তু আমার না লুকোতে ভয় লাগে। তবু চেপে থাকি।...কিন্তু আমার মেয়েটা? আমার ছয় বছরের মেয়ে?...নাহ্, আমি আবার নীচে তাকাই।

আমার এই হাজব্যান্ডের 'বাৎসরিক আয় ছ-লাখ'। ওর 'পূর্বের স্ত্রী অ্যাকসিডেন্টে মৃত'। 'কলিতে দুটি দ্বিতল বাড়ি'। একটা বাড়ি অবশ্য ভাড়া দেওয়া, বহুদিনের। ও 'কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার 30/5'6", ওর প্রথম বিয়ের দু-বছরের মধ্যেই প্রথম বউটা মারা গিয়েছিল। কীভাবে মারা গিয়েছিল এখনও জানি না। ইচ্ছেও নেই জানার। কী দরকার ওসব ঘাঁটিয়ে। এই তো বেশ আছি। ওরা 'বিধবা নয় ডিভোর্সি কাম্য' বলেছিল। 'ঘরোয়া স্লিম ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট প্রকৃত সুন্দরী ফোনে যোগাযোগ সকাল 7-9।' সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম। আমার হাইট, ফিগার, গায়ের কালার, চুল, নখ, দাঁত, মাড়ি সবক'টা জিনিস ওদের পছন্দ হয়েছিল। এইবারে আমি কিন্তু গোপন করিনি যে আমি ডিভোর্সি। কেনই বা করব। ওরা তো চেয়েইছিল। আর আমার তো কোনও দোষ ছিল না। ভালোবেসে আজকাল কে না বিয়ে করে? আমাদের পাড়ারই ছিল ছেলেটা। বন্ধুরা আমায় খুব বোঝাত ছেলেটা খারাপ, অপদার্থ, ওর পাল্লায় পড়িস না। মরবি। ছেড়ে দে। আমি ছাড়তে পারিনি। লুকিয়ে বিয়ে করার বছর দেড়েকের মধ্যে মেয়েকে কোলে সমেত ও-ই আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করা 'প্রকৃত ঘরোয়া' মেয়ে লাথি খেয়ে বাপের বাড়িতে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন হলে যেভাবে থাকে সেভাবেই ছিলাম। তবু তো মেয়েটা স্কুলে যেত। দুটো ভালোমন্দ খেত-পরত। বাবা-মাকে একটুও দোষ দিই না। তারাও একসময় দুজনে অনেক বুঝিয়েছিল আমাকে। শুনিনি, কিচ্ছু শুনিনি। ভালোবাসা শুধু কানা নয়, কালাও। বাড়ির সামনে বাবার ব্যাকডেটেড স্টেশনারি দোকানটা টিবি রুগির মতো হাঁফাতে হাঁফাতে পা ঘষটাতে ঘষটাতে চলে। ভাইটা এবছর সেকেন্ড ইয়ারে। এতগুলো পেট। এই দোকানের আর পোস্টাপিসের সামান্য ইন্টারেস্টে এ-যুগে কাঁহাতক পারা যায়?

কিচ্ছু গোপন করিনি। সব বলেছি আমার এই কর্তাকে। বিয়েতে

এদেরও 'কোনও দাবি নাই' ছিল। সত্যি সত্যি কিচ্ছু নেয়ওনি। একদম শাঁখা-সিঁদুর আর একটা শাড়ি আর বাবার অনেক জোরাজুরিতে ও একটা আংটি নিতে রাজি হয়েছিল। বিয়ের ক'দিন আগেই একটা গাড়ি কিনেছে। স্যান্ট্রো। সিলভার কালার। দা-রু-ণ দেখতে। সিটের প্লাস্টিক কভারগুলো আমি খুলতে দিইনি। খুললেই তো ধুলো জমবে সিটে। যা ধুলো কলকাতায়, বাপরে! বউভাতের পরদিন রাত্রেই নতুন গাড়িটায় দুজনে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে রেড রোডে উঠে শাঁ শাঁ করে যখন যাচ্ছিল না গাড়িটা উফ! কেমন যেন লাগছিল কী বলব! ও-ই ড্রাইভ করছিল। কার স্টিরিয়োতে স্যাক্সোফোন (এই নামটা ওর থেকে জেনেছি) আর হু-হু করে ছুটে যাওয়া, শিরশির করছিল আমার শরীর। অবশ্য দু-দিন পরেই বুঝেছি ও আমার দিকে খুব একটা ঘেঁষে-টেঁষে না। কে জানে কেন! অন্য কোনও প্রেমিকা-টেমিকা আছে বোধহয়। হয়তো কোনও চাপে পড়ে তাকে বাদ দিয়ে আমার মতো একজনকে বিয়ে করতে হয়েছে। না কি অন্য কোনও কারণ! যার জন্য আগের বউটা মরেছে কি না কে জানে?—মরুক গে। আমি মাথা ঘামাই না বাবা। এত দিনের মধ্যে কোনওদিনও রাত্রে আমায় একবার ছুঁয়েও দেখেনি ও। আমিও হ্যাংলামো করিনি কখনও। ওসব ইচ্ছে-টিচ্ছে আর আমার নেই। কবে হাপিস হয়ে গেছে। বাবার ঘাড়ের ওপর মেয়েকে নিয়ে চেপে বসে নেই এই-ই যথেষ্ট। আমাকে পছন্দ না অপছন্দ তা নিয়ে ভাবি-টাবি না। এরা ডিভোর্সি চেয়েছিল কিন্তু 'নিঃসন্তান নির্দায়'। আমার মেয়ে আমার দায় নয়। তাই বাধ্য হয়ে একেও ছেড়ে দিই।

ভাবতেই পারিনি জীবনে কখনও এই ভ্যাজভেজে WB ছেড়ে USA যাব। আমেরিকার যেখানে আমরা থাকি সে জায়গাটার নামটা এখনও অবশ্য জানা হয়নি। সে আর জানতে কতক্ষণ। আমি 'সঃ/ অসঃ ডিভোর্সি সন্তানসহ', কোনও কিছুতেই এদের 'আপত্তি নাই'। আমি 'বিদেশে থাকতে ইচ্ছুক' 'স্মার্ট অনূর্ধ্বা পঁয়ত্রিশ' সুতরাং যোগাযোগের সঙ্গে সঙ্গে 'রেজিস্ট্রি বিবাহ'। তারপরেই প্লেনে করে সোজা এইখানে। আমার কর্তার বয়সটা

একটু যা বেশি। ছাপান্ন। খাঁটি আমেরিকান। ওর ঠাকুমা নাকি বাঙালি ছিল। এখন যদিও ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলি ওর সঙ্গে, তবে শিগগিরই বাংলাটা শিখিয়ে দেব। ইনি 'প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী'। এরও আগে বিয়ে হয়েছিল। এক বছর পরেই ক্যাচাং হয়ে গেছে। আগের পক্ষের ছেলেটার বয়স আঠাশ। সে অবশ্য বাপের সঙ্গে থাকে না। আমিও একবারও দেখিনি তাকে। আমি কিন্তু আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে বুড়ো, বউ নয় একজন কাজ করবার বিশ্বস্ত আয়া খুঁজছে। আমার কোনও ব্যাপার নেই। মেয়েটাকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। কত সুন্দর সুন্দর বই, স্কুলের ইউনিফর্মটা দারুণ দেখতে। স্কুলে এই বয়স থেকেই কম্পিউটার শেখায়। এ দেশের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। ওর মুখে তো সব সময় শুধু কম্পিউটারে নতুন কী শিখল তার গল্প। রোজ একটা ঝকঝকে বাসে চেপে স্কুলে যায়। স্কুলেরই বাস। টিফিনে রোজ কেক, বিস্কুট, ক্যাডবেরি...ও খু-উ-ব খুশি। বাড়িতে ওর আবার নিজের ঘর রয়েছে। এইটুকুন মেয়ে তার আবার ঘর হি-হি...। এখনও অবশ্য লোকটাকে বাবা বলে মেনে নিতে পারেনি। সে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এদেরকে ভালো করে চিনিই না। শুনেছি এদেশের সবাই না কি হাই তুলতে তুলতে বউ পালটায়। বুড়োর এ বয়সেও দারুণ রস। আমার বিচ্ছিরি লাগলেও উপায় নেই।...আচ্ছা, দু-দিন পর আমি পুরোনো হয়ে গেলে পর আমাকে মেয়ে সমেত খেদাবে না তো? হুট করে ছেড়ে দিলে মেয়েকে নিয়ে এই অচেনা বিদেশ বিভুঁইয়ে তখন যাব কোন চুলোয়?—দরকার নেই বাবা অত লোভ করে। তার থেকে নিজের দেশে থাকাই ভালো।

নাহ্, এই এবারে আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই খু-উ-ব সুখী। এমনিতে আমার বর বেশ সোজাসাপটা। কোনও সাতে-পাঁচে থাকে না। সারাদিন

বইপত্তর, ছাত্রছাত্রী নিয়ে থাকে। 'সঃ চাঃ' স্কুল টিচার। স্কুল থেকে হাজার তিরিশ পায়। কম কী! জীবনে বিয়ে না কি করবেই না ঠিক করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বন্ধুদের আপ্রাণ চেষ্টায় বেয়াল্লিশ বছর বয়সে বাবুর বিয়েতে মতি হয়। সাংঘাতিক 'ধার্মিক এবং আদর্শবান'। আমিও 'সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ভক্তিমতী নিরামিষাশী উদারমনস্কা অনূর্ধ্বা চৌত্রিশ, বিএ'। পাশটা অবশ্য করিনি, ব্যাক পেয়েছিলাম আর বসিনি তারপর। সে রেজাল্ট তো আর দেখতে চাইবে না। আমি 'অমুক ঠাকুরের আশ্রিতা (অগ্রগণ্যা ছিল) মোটামুটি সুশ্রী'। ও '5'7" সঃ চাঃ সন্তানসহ ডিভোর্সি চলিবে' বলে আমি ভীষণ সুখী হতে যাচ্ছিলাম কিন্তু...বক্স নং, আমি বক্স নম্বরে আর চিঠি পাঠাই না। এ পর্যন্ত অনেক টাকা স্ট্যাম্প আর 'অফেরৎ যোগ্য পোস্টকার্ড সাইজ রঙিন ছবির' জন্যে গেছে। একটারও উত্তর পাইনি কোনওদিন। এর থেকে 'টেলি নং' ভালো। চটপট 'না চলবে না' শোনা যায়। অপেক্ষায় শুকিয়ে বসে থাকতে হয় না। বাড়ির ঠিকানা দেওয়া থাকলে তবু মাঝেমধ্যে পাঠিয়ে ফেলি কখনও। তিনটে টিউশনি করি ছোট ক্লাসের। মাসে মোট সাড়ে পাঁচশোর মধ্যে মেয়ের স্কুলের মাইনে, ভ্যানভাড়া, খাতাপত্র, বই, পেনসিল, ওয়াটার বোতল, জুতো, আমার নিজের টুকটাক...এরপর কত আর ভগবানের উত্তর পাওয়ার আশায় স্বর্গে চিঠি পাঠাব। বাবার কাছে এসবের জন্য হাত পাততে লজ্জা লাগে।

রবিবারের গোটা দুপুরটা আমার এইভাবে কেটে যায় 'পাত্রী চাই'-এর মধ্যে। আমার চোখ চেটে বেড়ায় টিক দেওয়া, টিক না দেওয়া, শেড দেওয়া প্রত্যেকটা শব্দকে। মা শুকনো মুখে একটু পরপর জিগ্যেস করে, 'কি রে পেলি কিছু?' আমি যত সম্ভব হালকাভাবে উত্তর দিই, 'নাহ্।

এবারে দেয়নি তেমন কিছু।'

দুপুর গড়াতে থাকে। আমিও হাঁফিয়ে পড়তে থাকি। চোখ ব্যথা করে। মাদুরের ওপর আমার পাশে শুয়ে থাকা ডটপেন শুকনো মুখে পড়ে থাকে। কোনও লাইনের ওপর দাগ কাটতে পারে না। আমি সঃ/অসঃ,

প্রকৃত ঘরোয়া/ চাকুরিরতা, অনূর্ধ্ব তেইশ/ পঁয়ত্রিশ, অতীব ফর্সা/ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পরমাসুন্দরী/মোটামুটি সুশ্রী, পূঃ বঃ/পঃ বঃ, ব্রাহ্মণ/ মুসলিম সুন্নি, গন্ধবণিক/নমঃশূদ্র, যুক্তিবাদী/ভক্তিমতী, আমি কনভেন্ট এডুকেটেড/ন্যূনতম উঃ মাঃ, আমি ফার্স্ট হ্যান্ড কিংবা বিধবা/ডিভোর্সি, আমি সকাল 8-10 টা ফোনে যোগাযোগ' আমি 'ছবি ছাড়া পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন'—স-ও-ব, সব কিছু। শুধু নির্দায় নই। আমার ছয় বছরের মেয়েটা। সবাই বলে কী হয়েছে তাতে। বোর্ডিংয়ে রেখে দিবি। আজকাল এমন তো হামেশাই হচ্ছে। আমি পারব না। আমি পারব না। আমি ওর একমাত্র...। আমাকে একমুহূর্ত চোখের আড়াল হতে দেয় না। সরকারি স্কুল থেকে আকাশি রঙের মোটা টেরিকটের ইউনিফর্ম পরে ঘামে চ্যাটপ্যাচে হয়ে বাড়ি ফিরে আমাকে খোঁজে। না পেলে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। এত ভয় কেন কে জানে! যত বড় হচ্ছে তত যেন ভিতু হচ্ছে। আমি পারব না ওকে ছেড়ে...।

বিকেল হয়ে আসে। আমার মেয়ে ঘুম থেকে উঠেই বলে, 'মা খেলতে যাচ্ছি।' আমিও কাগজটাকে ভাঁজ করে রেখে উঠে পড়ি। আবার সামনের রবিবার।

সুখী গৃহকোণ
নভেম্বর ২০০৯

দুই-পুরুষ

ডেস্কের পাশে রাখা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে বেশ অনেকটা গুটখার পিক ফেলে বিশাল চেহারার লোকটা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি বিমলবাবুর লোক আছেন, তো সওয়াল-জবাবের কোনও বেপার নেই। লেকিন কামকাজ বুঝে নিন।'

'হ্যাঁ স্যার...' আর কিছু বলতে পারল না অতনু। বুকের ভেতরটায় আরও জোরে দপদপ করতে শুরু করেছে।

'আপনি নীচের গদিতে বসুন, আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে কাম বুঝিয়ে দিবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অতনু। একটা তীব্র আনন্দ, খানিকটা ভয় আর কী যেন একটু সঙ্গে নিয়ে চারতলার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু এটা কি সত্যিই অফিস? একটা পোড়ো চারতলা বাড়ি। তার মধ্যে অসংখ্য খুপরি ঘর। কোনওটার জানলায় গামছা, সায়া মেলা রয়েছে। কোনওটায় থেকে ক্যাঁও ক্যাঁও করে বাচ্চার কান্না আসছে। লম্বা

ঝুলবারান্দাটার মধ্যে ছড়ানো ছেটানো পেঁয়াজের খোসা, গুটখার প্যাকেট, ছেঁড়া প্লাস্টিক, ঠোঙা, কোনও ঘরে মেশিন চলার ঘড়ঘড় করে উৎকট শব্দ হচ্ছে।

অন্ধকার খাড়া সিঁড়ির পলেস্তারা খসা দেয়াল ধরে নামতে নামতে অতনু ভাবল যাক গে, কেউ তো আর দেখতে আসছে না ওর অফিস। অফিস—শব্দটা আবার ঢেউ তুলল অতনুর শরীরে। কাল থেকে সত্যি সত্যি বাড়ির লোককে, পাড়ার সবাইকে বলতে পারবে 'অফিস যাচ্ছি', কিংবা 'আজ বেরোতে খুব লেট হয়ে গেল।'—সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার চাতালটায় পা দিতেই আবার সেই নাকে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া গন্ধটা। সিঁড়ির পাশেই টয়লেট, ধ্যাৎ পেচ্ছাপখানা বললেই সবচেয়ে ঠিক হয়।

জায়গাটার দিকে উঁকি মারল অতনু। কোনও দরজার বালাই নেই তবু ভেতরটা অন্ধকার। ঢোকার মুখেই একটা চৌবাচ্চা আবর্জনায় ভরতি। ভেতরের দিকে দুটো বেশ উঁচু পাদানি আবছা দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যায় বহুদিন হল পাদানির ধারেকাছে কেউ ঘেঁষে না। একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই ঢেলে দিয়ে চলে যায়। ভয়ংকর গন্ধে পুরো জায়গাটা মাখামাখি। ওটার ঠিক উলটো দিকে ফুট চারেক দূরে দুজন মটিয়া একটা তক্তপোশের ওপর বাবু হয়ে বসে, এনামেলের থালায় পরম তৃপ্তিতে ভাত খাচ্ছে।

তলপেটটায় অনেকক্ষণ ধরে চাপ দিচ্ছিল। কী করবে ভাবতে ভাবতে একটু বেখেয়াল হয়ে পড়েছিল অতনু। তখনই—'আমার সঙ্গে আসুন' শব্দে ঘাড় ফেরাল।

শব্দটা তার শরীর নিয়ে ভুসো অন্ধকার থেকে আলোর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে একটু আগেই পিছন থেকে দেখেছ অতনু। ও যখন মালিকের সঙ্গে কথা বলছিল তখন লোকটা ঘরের এককোণে রাখা কম্পিউটারে কাজ করে যাচ্ছিল। আশ্চর্য, একবারের জন্যও কৌতূহলে মুখ ঘুরিয়ে অতনুর দিকে তাকায়নি।

ভদ্রলোক সামনে আসার পর কাছ থেকে বেশ ভালো করে দেখল অতনু। কাঠামো দেখে মনে হয় চল্লিশের আশেপাশে। কিন্তু চুল, মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ অধিকাংশই পাকা। চেহারার ছাপে একটা অকালবার্ধক্য। চোখ

দুটো মরা ভোলা মাছের মতো নিষ্প্রভ। পরনে একটা টেরিকটের হলুদ শার্ট আর পাজামা হয়ে আসা খয়েরি ফুলপ্যান্ট। পায়ে আবার কেডস। পুরো গেটআপটাই অদ্ভুত। এই-ই আজ থেকে অতনুর অফিস কলিগ। যেমন অফিস তার তেমন কলিগ...যা...ক গেহ্।

অতনু একগাল হাসি টেনে বলল, 'আপনি কম্পিউটারে কাজ করছিলেন না?'

'হুঁ।'

'অ্যাকাউন্টস?'

'হ্যাঁ।'

'কী প্যাকেজে কাজ হয় এখানে?'

'ট্যালি।'

যাহ্ শাল্লা, এ যে সবই এক নম্বরের উত্তর মারে!

'এদিকে আসুন।'

'হ্যাঁ চলুন' বলে অতনু লোকটার সঙ্গে গদিতে এল। গদি একতলায়, অফিস চারতলায়।

সাদা ধপধপে ফরাস পাতা। এক পাশে রাখা ফর্সা দুটো তাকিয়া। তাকিয়ার কোলে একটা টেলিফোন। একেবারে কোণে একটা সেল্ফে বেশ কিছু লাল রঙের খাতা, ব্যাঙ্কের স্লিপ। সেল্ফের পাশে রাশভারী রকমের লোহার লকার। লকারের মুখে কমলা রঙের সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক আঁকা। লকারের ঠিক ওপরেই দেয়ালের র‍্যাকে মাটির লক্ষ্মী-গণেশ।

'ওখান থেকে এক্সিস ব্যাঙ্কের ডিপোজিট স্লিপ বইটা বার করুন।' অতনু হাত বাড়িয়ে বইটা বার করতে করতে বলল, 'আমাকে আপনি বলতে হবে না।'

'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা এ-গলির সবক'টা দোকানেরই কি সুতোর ব্যবসা?'

'হুঁ।'

এ কী লোক রে ভাই! অতনু স্লিপ বইটা লোকটার হাতে দিল।

'চেক ভরতে পারেন?'

'পারি।' অতনুও শর্টকাট মারল।

'ভরুন এগুলো,' বলে একতোড়া চেক ধরিয়ে দিল অতনুর হাতে। প্রথম চেকটাই তিন লাখ সতেরো হাজার। হাত দুটো একবার যেন কেঁপে উঠল। একটা কাগজ, স্রেফ পাঁচ ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি একটা কাগজ, এত ভারী!

স্লিপ ভরতে শুরু করল অতনু। কোনও অ্যামাউন্টই দুইয়ের নীচে নয়। আটখানা চেক। মানে মোট মিলিয়ে প্রায় বিশের মতো।

আঙুলগুলো আবার শিরশির করে উঠল।

'হয়ে গেছে?'

'হুঁ।' অতনু ঠিক করে নিয়েছে লোকটার সঙ্গে ও-ও এইভাবে কথা বলবে।

'আপনাকে বিমলবাবু পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি চেনেন ওনাকে?'

'উনি তো প্রায়ই আসেন এখানে।' বলে লোকটা একটু থামল।

তারপর বেশ ইতস্ততভাবেই জিগ্যেস করল, 'আপনি কি এখানে অ্যাকাউন্টসের কাজে এসেছেন?'

এই তো দাওয়াই পড়ে সোনার চাঁদের এতক্ষণে বুলি ফুটছে। জিতে যাওয়ার একটা ছোট্ট আনন্দ ঝিলিক দিল অতনুর মনে। পরক্ষণেই লোকটাকে ক্ষমা করে দিয়ে ও আবার একগাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু এখানে তো দেখলাম একটা মাত্র কম্পিউটার। তাহলে দুজনে মিলে কাজ করব কীভাবে?'

এবারে লোকটার কীরকম অদ্ভুত হাসির মতো ঠোঁট বেরিয়ে বলল 'দুজনকে কি আর রাখবে! আপনি কাজ করলে আমাকে এখান থেকে সাইড করে দেবে।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল অতনু। লোকটার মৃত চোখ দুটোর দিকে আবার তাকাল। নেহাতই নির্বিকার দুটো চোখ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বুকটা কেমন ধক করে ওঠে।

অতনু প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বলল, 'দাদা, আপনার নামটাই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম সমীর ভট্টাচার্য।'

'আচ্ছা, আমি অতনু সান্যাল।'

'বাহ্ দুজনেই বামুন' বলে লোকটা খানিক দাঁত বার করল। কী বিচ্ছিরি মনমরা একটা হাসি।

'বাড়ি কোথায়?'

'হিন্দমোটর। আপনার?'

'আমি আন্দুলে।'

'ও বাবা সে তো বেশ দূর।'

'ওই আর কী।...তুমি একটু বসো, আমি ওপর থেকে আসছি।'

সমীরদা উঠে যাওয়ার পর অতনু স্লিপ বইটা সেল্‌ফে তুলে রেখে সামনের দিকে তাকাতেই পেটের সব ভাত যেন একসঙ্গে গলায় ঠেলা দিয়ে উঠল। গদির উলটোদিকে ফুট কয়েক দূরে দাঁত বার করা ঢ্যাঙা বাড়িটার একেবার নীচে একটা কুলুঙ্গি মতো। বোধহয় আগেকার দিনের ভ্যাট। সেটার গায়ে কয়েক লক্ষ আরশোলা চুপচাপ বসে রয়েছে। সামনে স্তূপ করা ছাই, তরকারির খোসা, এক কোণে খানিকটা পাতলা পায়খানা। দু-চারটে বেজি সাইজের ইঁদুর ইটের ফাঁকেফোকরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই ঘিঞ্জি দম বন্ধ করা নরকের মধ্যে বসে ওকে দিনের পর দিন কাজ করতে হবে! কান্না পেয়ে গেল অতনুর।

'চলো', সমীরদার গলা শুনতে পেল না অতনু।

'কী গো ওঠো।'

'অ্যাঁহ্।'

'কী ভাবছ?'

'এখানটা এত নোংরা সমীরদা! কী করে থাকে সবাই?'

'কেন ঘেন্না করছে? ও প্রথম প্রথম আমারও হত। দু-একটা দিন যাক, দেখবে তারপর সয়ে গেছে।'

খারাপ জিনিস সয়ে যাবে! চুপচাপ উঠে দাঁড়াল অতনু। জিগ্যেস করল 'কোথায় যাব?'

'ব্যাঙ্কে, বাবু তোমায় ব্যাঙ্কগুলো চিনিয়ে দিতে বললেন।'

'ব্যাঙ্কে! আমি গিয়ে কী করব? আমার তো অ্যাকাউন্টসের কাজ।'

সমীরদা একটু বাঁকা হেসে ঠেস মেরে বলল, 'বড়বাজারে কাজ করতে

এসেছ। এখানে সব করতে হয়। অ্যাকাউন্টসও রাখবে, পার্টির কাছে টাকা কালেকশনেও যাবে, ব্যাঙ্কেও যাবে, আবার প্রয়োজন হলে বাবুর...,' একটা চুটকি রহস্য রেখে থেমে গেল সমীরদা। বলল, 'চলো।'

এম জি রোড দিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ হাঁটার পর সমীরদা আচমকা জিগ্যেস করল, 'তুমি কি বিমলবাবুর রিলেটিভ?'

'না-না। আমি ওঁর ছেলে পড়াই।'

'অ'। আবার চুপচাপ।

সত্যিই একটা চাকরির বড় প্রয়োজন ছিল অতনুর। ওর ছাত্রর বাবা বিমল সেন নাম করা অ্যাডভোকেট। প্রচুর চ্যানেল। বলব না বলব না করে শেষপর্যন্ত একদিন মাথা নুইয়ে বলেই ফেলেছিল—

'কাকু একটা কথা ছিল।'

'হুঁ বলো। আবার ফাঁকি মারছে, না?'

'না-না, সে ব্যাপারে নয়, মানে...'

'কী?'

'আমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?'

'চাকরি?'

'হ্যাঁ, আসলে...।' তারপর পাঁচ দিন আগে থেকে টানা রিহার্সাল দেওয়া কথাগুলো গড়গড় করে মুখস্থের মতো বলে গেছিল অতনু। ডিভোর্সি দিদি, আলসারের মা, পুরোহিত বাবা আর ছ'টা টিউশনির অতনুর সংসার একেবারে হেঁপো রুগির মতো পাঁজর বার করে খাবি খাচ্ছে। নিপুণভাবে ছবিটাকে এঁকে দিয়েছিল কয়েক মিনিটে।

'কম্পিউটার জানো?'

'হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টসের কাজ জানি।'

'ঠিক আছে, ভালো, একটা বায়োডাটা দিয়ে যেও।'

তারপর প্রায় মাস দেড়েক, আবার একদিন, 'কাকু আমার কোনও খোঁজ পাননি না?'

'অ।...কম্পিউটার জানো?'

'হ্যাঁ জানি,' বেশ হতাশভাবে বলেছিল অতনু।

'বায়োডাটা আছে?'

'আছে।'

'ঠিক আছে, কাল সকালে সাতটা নাগাদ একবার এসো।'

সাড়ে ছ-টার মধ্যে পৌঁছে গেছিল অতনু।

একটা ছোট্ট কাগজে ঠিকানা লিখে দিয়ে বিমলবাবু বলেছিলেন, 'আজকে এগারোটা নাগাদ এর সঙ্গে দেখা করো। আমি কথা বলে রেখেছি। এ আমার ক্লায়েন্ট। সুতোর কারবার। খুব একটা যদিও দেবে না এখন। যাই হোক ঢুকে তো পড়ো আপাতত। পরে দেখা যাবে।'

'ঢুকে পড়ো'... তার মানে...পাকা! ওফ...শব্দ এত সুন্দর হয়!

রাস্তায় বেরিয়ে খানিকটা সাইকেল চালানোর পর মাঝপথে থেমে ঠিকানার চিরকুটটা বার করেছিল অতনু। বনোয়ারিলাল কেজিয়া। ১৮৪/এ, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট, সুতো পট্টি, বড়বাজার।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে উঠে সমীরদা বলল, 'চলো আজকে বাসে যাব।'

'কোথায় যাব এখন?'

'গণেশ চন্দ্র। স্টেট ব্যাঙ্কে।'

কিন্তু আজকে বাসে যাব মানে? চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলল অতনু, 'অন্যান্য দিন কীভাবে যান তাহলে?'

'হেঁটে। চিন্তা নেই, আজ তুমি প্রথম বলে বাসভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কাল থেকে তোমাকেও স্রেফ হেঁটে হেঁটে অর্ধেক কলকাতা চষতে হবে।' বুকের ভেতর চড়াং করে উঠল অতনুর। বলে কী!

'রাত্তিরে যখন বাড়ি ফিরি, পা দুটোয় আর কিছু থাকে না। রোজ নিজের মেয়েটাকে পায়ের ওপর দিয়ে হাঁটাই। তার মধ্যে শালা একটা কোমরের ব্যথা এসে জুটেছে। তুমি...'

সমীরদার কথাটাকে থামিয়ে দিয়ে একটা বাস এসে গেল। ভিড় বাসের

মধ্যে আর কোনও কথা হল না। শুধু অর্ধেক পরিচিত দুজন পুরুষের মধ্যে দু-একবার চোখাচোখি হল মাত্র।

দুই

একটু বেশি নোনা ধরা, এখানে ওখানে চুন খসা, ইঁট বার করা অতনুদের বাড়িটা দেখতে একইরকম আছে কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়ির পরিবেশটা যেন হুড়মুড় করে বদলে গেছে। বাবা, মা, দিদি সবাই যেন বুঝে গেছে অতনুর হাতে এখন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। সে প্রদীপ ঘষলেই মুদির দোকান, কেরোসিন, দুধ, ইলেকট্রিক বিল, সপ্তাহে দু-দিন মাছ, এমনকী কিছু শৌখিনতা করাও আর কঠোর নিষিদ্ধ নয়। বাবা পাড়ার হরিসভার নিত্য পুরোহিত। বরাদ্দ নৈবিদ্যের কুচো ফলগুলো এখন অতনুর টিফিন বাক্সে করে বড়বাজারে আসে। অফিস কালচার অতনুর বাড়িতে কোনওকালে ছিল না বলেই এখন সকাল হতে না হতেই বাড়িময় যেন হুলুস্থূল পড়ে যায়। ভাত-ডাল-তরকারি, টিফিন বাক্সে রুটি, আলুভাজা, কুচো ফল, দানাদার...অতনু লজ্জায় গুটিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে খুব ইচ্ছে করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে গিয়ে একবার অফিসটাকে দেখায়। এই দেখো, এই আঁস্তাকুড়কে তোমার অফিস বলবে? কেন ফালতু এত হইচই করছ সকলে। কথাটা গলা পর্যন্ত এসে আটকে যায়। কে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কী হয়েছে, তবু তো অফিস, কেউ তো আর আসছে না কেমন দেখতে।

বড় অদ্ভুত জায়গা এই বড়বাজার। বড় অচেনা এখানকার মানুষজন, বেলা এগারোটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ এক অন্য পৃথিবীতে থাকে অতনু। কাজের ফাঁকেফোকরে অবাক হয়ে দেখে সারাদিন কত বিচিত্র মানুষের আসাযাওয়া, হাসি, রাগ, চিৎকার, আরশোলা, ইঁদুর আবর্জনা...আর সমীরদা। মানুষটা যে ঠিক কীরকম কিছুতেই বুঝতে পারে না অতনু। একদিন সন্ধেবেলা

মুক্তারামবাবু স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুম করে অতনুকে বলল—'তুমি বাঙালি বলেই বলছি, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো পালাও। খুব বাজে জায়গা।'

'বাজে জায়গা মানে?' প্রশ্নটা নিঃশব্দে করে ভুরু কুঁচকে তাকাল অতনু।

'এদের ব্যবহারের জন্য দু-দিনের বেশি লোক টেকে না। পুরো কুত্তার মতো ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে।' বলেই তারপর আবার বলল, 'অবশ্য প্রথম প্রথম তোমায় কিছু বলবে না। দিন কয় যাক তখন নিজেই বুঝবে আমি ঠিক বলছি কি না।'

অতনু চুপ থাকল, লোকটা কী বলতে চাইছে আসলে?

'তুমি অবশ্য ভাবছ আমি তোমাকে ভাগাতে চাইছি। ভাবাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে তা নয়। তুমি ছেলেটা ভালো, তার ওপর অল্প বয়স—আমার লাইফটা তো ভোগে গেছে, তোমার এখনও সময় আছে। অন্য কোথাও চেষ্টা করো। নইলে...'

'চেষ্টা'— শব্দটা শুনে হেসে ফেলেছিল অতনু। চাকরির চেষ্টা শব্দটা যেন কী অদ্ভুত! প্রসঙ্গটাকে পালটাবার জন্য অতনু বলল, 'আচ্ছা সমীরদা আপনি কত দিন হল এখানে ঢুকেছেন?' সমীরদা একটু চুপ থাকল। তারপর মুখে আঙুল ঢুকিয়ে ঠোঁটের ভেতর গোঁজা খৈনির দলাটাকে বার করে ফেলে দিয়ে বলল, 'তাও প্রায় ন'বছর, আসলে আমার তখন আর উপায় ছিল না, এই অভাব শালা এমন খতরনাক চিজ না!'

'অন্য কোনও জায়গায় চেষ্টা করেননি কেন?'

'আর হল কই? এখানে উদয়াস্ত খাটতে খাটতে আর নতুন কোনও চেষ্টার এনার্জিই আসে না। সেজন্য তো তোমায় বারবার বলছি।...কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার করছ না কি?'

হঠাৎ করে এমন একটা প্রশ্নে চমকে উঠল অতনু। কিছু ভাবার আগেই বলে ফেলল 'হ্যাঁ।' কেন যে বলল ঠিক নিজেও জানে না।

'ব্যস, তাহলে তো আরও গেরো। এখন বয়স কত তোমার?'

'আঠাশ চলছে।'

'ওর?'

'এম এ করছে হিস্ট্রিতে। ফাইনাল ইয়ার,' মিথ্যেগুলো নির্বিকারভাবে বেরিয়ে এল।

'ও বাব্বা, এর পরেই তাহলে ওদিক থেকে চাপ আসবে।' কথাটা বলেই সমীরদা আবার জিগ্যেস করল, 'বাপের এক মেয়ে?'

'না, ভাই আছে।'

'তার মানে আমার মতোই কেস, ওদিকে থেকে পাওয়ার কিছু নেই। ভালো কথা বলছি, আমার মতো কুত্তার হাল হওয়ার আগে লাইন দেখো।'

লোকটা কেন বার বার এমন বলছে? ভয়ে? অতনু এসে ওর নিরাপত্তার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে?

চুপ থাকল অতনু। কেন বলল ওর একজন আছে? কোন প্রেম? কলেজে সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে সেই মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে শুধু একটি-দুটি বার তাকানো...সেই প্রেম? কবেকার পুরোনো, তবু সেই দৃষ্টি মনে পড়লে এখনও পাঁজরে নরম বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তবে সে কি আজও আছে?

'আমি তো বুঝলে তোমার মতো বয়সে, শাললাহ্, এবেলা একটাকে ওবেলা একটাকে নিয়ে ঘুরতাম, পাড়ায় আমাকে সেজন্য সবাই কেষ্টঠাকুর বলত, দেখতেও ছিলাম লালটুস। একদিন তো হয়েছে একটার সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে আরেকটার মুখোমুখি পড়ে গেছি। ওহ্ সে কী ক্যাচাল।...হ্যাহ্...হ্যাহ্...' হাতাতলি দিয়ে হেসে উঠল সমীরদা।

অতনু হাঁ করে তাকিয়েছিল সমীরদার দিকে। ন্যাতানো লোকটা হঠাৎ করে এমন যে বদলে উঠতে পারে ভাবতেও পারেনি। কাঁচাপাকা চুল, কপালে কেঁচোর মতো বলিরেখা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাটির দুটো দাঁত নেই, চোখের কোণে এক আঙুল গর্ত, এ লোকটা নাকি একসময় দারুণ দেখতে ছিল! এবেলা-ওবেলা মেয়ে নিয়ে ঘুরত! সব মিথ্যেই কি এমন অক্ষমতা, অসহায়তা থেকে জন্ম নেয়?

'চলো এখানে ঢুকতে হবে' বলে সমীরদা অতনুকে নিয়ে একটা বাড়ির ভেতর ঢুকল। বাড়িটার মাঝখানে সিমেন্টের চাতাল, চার ধারে গুমটি ঘরগুলো এক এক রকমের দোকান। চাতালের এক কোণ দিয়ে লোহার রেলিং দেওয়া সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সমীরদা বলল,

'যদি থাকবে ঠিক করে থাকো তাহলে জায়গাগুলো ভালো করে চিনে রাখো। এরপরে একা একা আসতে হবে।'

দোতলার লম্বা বারান্দা দিয়ে খানিকটা হেঁটে একটা বড় ঘরে ভেতর ঢুকল দুজনে। অতনুদের গদির মতোই ঘরটায় সাদা ফরাস পাতা। ফরসা ঝকঝকে তাকিয়া। বেশ কিছু লোক বসে জটিল হিন্দিতে কথা বলছে। লোকগুলো ওদেরকে পাত্তাও দিল না। সমীরদাও বেশ গম্ভীরভাবে ওই ঘরটা পেরিয়ে পাশের আর একটা ঘরে গেল। এই ঘরটা আকারে একটু ছোট। একটা ঢাউস চেহারার ছেলে, হয়তো অতনুর বয়েসি কি একটু বেশি হবে, ফরাসে বসে টেলিফোনে কথা বলছে। কপালে কমলা রঙের সিঁদুরের টিপ। দু-হাতের শুধু বুড়ো আঙুল দুটোয় আংটি নেই। সমীরদা আর অতনু চটি খুলে ফরাসে বাবু হয়ে বসল।

মিনিট পাঁচেক পর ফোন রেখে ছেলেটা সমীরদার দিকে তাকিয়ে ছোপ ধরা দাঁত দেখিয়ে তাচ্ছিল্যভরা হেসে বলল, 'আ গ্যায়া বনওয়ারি কা চেলা।'

সমীরদাও বিনয়ী হাসি দিয়ে বলল, 'আর কী।'

ছেলেটা পকেট থেকে একটা গুটখার প্যাকেট বার করে ছিঁড়ে হাঁ করে সবটা ঢেলে নিল। তারপর অতনুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে বলল, 'নয়া লেড়কা?'

সমীরদা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'কিতনে দিনকে লিয়ে...হ্যা-হ্যা-হ্যা...'

পিত্তি জ্বলে গেল অতনুর।

সমীরদাও ছেলেটার হাসিতে যোগ দিয়ে অতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলেছিলাম না, সবাই জানে এদের বেশিদিন লোক টেকে না। যা ব্যবহার...'

ছেলেটা গদির ওপর চাপানো কাঠের ডেস্কটা খুলে ভেতর থেকে একটা চেক বই বার করে খসখস করে লিখল। তারপর চেক ছিঁড়ে খামে ভরে সমীরদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ষাট হাজারকে লিয়ে বনওয়ারি কা নিদ হারাম হো গ্যায়ে হে ক্যায়া। সোচতা ক্যায়া হ্যায় উনকে রূপ্যায়ে হম মার দেঙ্গে।'

সমীরদা আবার ক্যাবলার মতো হে হে করে খামটা নিয়ে ওর ছোট্ট

হাতব্যাগটায় ভরল।

'আচ্ছা বাবু আব চলতে হ্যায়।'

'হাঁ-হাঁ, আও।'

অতনুও উঠে দাঁড়াল।

রাস্তায় বেরিয়ে সমীরদা বলল, 'জীবনের থেকে সব আনন্দ শালা মুছে গেছে। একটা সময় কাউকে পরোয়া করতাম না। কেউ একটু বেচাল করলেই...এই বনওয়ারিজি এখনও আমাকে উলটোসিধা কিছু বলতে সাহস পায় না। একদিন একটু মুখখারাপ করেছিল তাতেই মুখের ওপর এমনি করে আঙুল তুলে অ্যাইসা কড়কে দিয়েছি যে আর কক্ষনো এই শর্মাকে কিছু বলার সাহস পায় না। একবার তো আমাদের পাড়ায়...'

ভিড় রাস্তায় অসংখ্য মানুষের ধাক্কা খেতে খেতে সমীর ভট্টাচার্য নামের একটা মানুষ, যে মালিকের সামনে অষ্টপ্রহর কেন্নোর মতো গুটিয়ে থাকে, তার যৌবনের সত্যি-মিথ্যে গল্প বলে যেতে থাকল আর অতনু ভাবছিল সেই মেয়েটা, তার সঙ্গে যদি আচমকা এই পথে দেখা হয়ে যায়। চিনতে পারবে? চিনতে পারলে কথা বলবে? কী কথা?

গোলকধাঁধার মতো এগলি-ওগলিতে হারিয়ে যেতে যেতে অতনু হঠাৎ খেয়াল করল সমীরদা ওর হাত ধরে টানছে। 'আরে ওদিকে যাচ্ছ? এদিকে। অত ভুললে চলবে?'

তিন

ভোররাতের দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসল অতনু। এতদিন পর এসব আবার কী! ভুলেই তা গেছিল কবে। সমীরদাকে বলা মিথ্যেটা স্বপ্নের মধ্যে এসে গেল কী করে? মশারি তুলে নেমে এসে টেবিলে রাখা বোতলটা থেকে কয়েক ঢোক জল খেল। মেয়েটার নামটাও ঠিক মনে নেই। কলেজে সবাই হেমা বলে ডাকত। কিন্তু হেমা মালিনীর সঙ্গে মুখের মিল কোনওদিনই খুঁজতে চায়নি অতনু। এমনই ভিজে গেছিল।...কিন্তু...এতদিন

পর...কী এসব? আবার হাস্যকরভাবে ফিরে এল কেন? বড়বাজারের ভিড় ঠেলাঠেলি গলির মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে পার্টির কালেকশনের একগাদা টাকা ভর্তি একটা হাতব্যাগ নিয়ে দুরু দুরু বুকে হাঁটছিল অতনু। কখন যে মেয়েটা এসে ওর হাত ধরে ভিড় কাটিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। আশ্চর্য, শয়ে শয়ে মানুষের মধ্যে দিয়ে সোঁ সোঁ করে হাঁটছিল দুজনে। হাঁটা নয়, অনেকটা হাওয়া যেভাবে যায় ঠিক সেইভাবে। অথচ অতনু একটুও অবাক হয়নি। যেন এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। স্বপ্ন অত আজগুবি হয়! হাসতে গেল অতনু। হাসিটা এল না। শুধু একটা শব্দ হল। অকারণ একটা মোচড় দিল বুকে...ধু-স্ শাল্লাহ্! জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। পাল্লা দুটো খুলতেই ফেব্রুয়ারির শিরশিরে হাওয়া, অস্পষ্ট বাইরেটা। এখনও কাক ডাকা শুরু হয়নি। হাওয়াটা আরও মনখারাপ করে দিচ্ছে। জানলা বন্ধ করে দিল অতনু। বিছানায় বসে জ্বালা ধরা চোখ দুটোর পাতায় হাত রেখে ক্লান্তভাবে বলে উঠল, 'কী কী...কী এসব!'

'তারপর, কী ঠিক করলে?' গদিতে বসে চালান গুছোতে গুছোতে ভুরু নাচিয়ে জিগ্যেস করল সমীরদা।

'ধুর, ভাল্লাগছে না। ছেড়ে দেব,' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল অতনু।

সমীরদা হেসে বলল, 'এর মধ্যেই হাঁফিয়ে গেলে। এখনও তো কিছুই দেখনি।'

'আর দরকার নেই দেখে। কোনও মানুষ এখানে থাকতে পারবে না।'

সমীরদার মিয়োনো চোখ দুটোয় আবার একটু ঝিলিক দিয়ে উঠল। এই প্রশ্নোত্তরের খেলাটা রোজই প্রায় চলে। অথচ দুজনের কেউ যেন ক্লান্ত হয় না।

'কাল বোধহয় একটা ঝাড় খেয়েছ না?'

'হুঁ।'

'কী করেছিলে?'

'আরে তেমন কিছুই না। ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা দেখে রিকনসাইল করতে বলেছিল, এখন অনেকদিন মেশিন চালানোর অভ্যেস নেই তো সেজন্য কম্যান্ডটা একটু ভুলে গেছিলাম, তাতেই...'

'তুমি কম্পিউটারে বসেছিলে!' সমীরদা যেন চমকে উঠল।

'হ্যাঁ, কেন?'

'কখন?'

'ওই আপনি যখন সিটি ব্যাঙ্কে গেছিলেন।'

'আরে একা একা মেশিন চালাতে যেও না। ভুলভাল কম্যান্ড দিলে সব ডেটা উড়ে যাবে। বারোটা বেজে যাবে তখন।'

অতনু জানে সমীরদার আসল দুশ্চিন্তাটা ডেটা উড়ে যাওয়ার নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতার, আতঙ্কের। এই ক'দিনে একবারও কম্পিউটারের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি সমীরদা, অতনু যতবারই বলেছে ততবারই নানা জুতো দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে।

'আমি না থাকলে একদম মেশিন ধরবে না বুঝেছ।'

'আমি তো ধরতে যায়নি। বনোয়ারিজি বললেন বলে...'

'বললেও ধরবে না। স্ট্রেট বলে দেবে সমীরদা বারণ করেছে। তারপর আমি বুঝে নেব।'

'ঠিক আছে।' অপছন্দের ভাবটা ইচ্ছে করেই একটু বেশ প্রকাশ করে উত্তর দিল অতনু।

'হ্যাঁ, কী বলল তারপরে শুনি?'

'দু-চারটে ভুলভাল কথা শুনিয়ে দিল।'

সমীরদা একটা তৃপ্তি মেশানো হাসি দিয়ে বলল, 'এ তো শুরু হল। এরপর আরও কত শুনবে, আমার যদি তোমার মতো বয়েস আর আর্থিক জোর থাকত না তালে কবে এদের মুখে লাথি মেরে চলে যেতাম।'

সমীরদার ধারণা অতনুদের অবস্থা মোটামুটি ভালো। কেন যে মানুষ ধরে নেয় অন্যরা তার চেয়ে ভালো আছে! সমীরদা মাঝেমধ্যেই অতনুকে এই কথাটা বলে। অতনু বাধা দেয় না। বরং শব্দগুলো কেমন যেন একটা অদ্ভুত আরাম দেয় ওকে।

'তারপর, তোমার তার খবর কী?'

'আছে।'

'এখানে কাজ করছ বলেছ?'

'হুঁ।'

'কিছু বলেনি?'

'ছেড়ে দিতে বলেছে।'

'বলবেই তো। এটা একটা লাইফ হল? আমি তো শালা স্রেফ নিয়োটা করে ফেঁসে গেছি। তাড়াহুড়ো করে একটা ইস্যুও করে ফেললাম।'

'সমীরদা আপনার মেয়ের বয়স কত?'

'এই তো এবার পাঁচে পড়বে। আমার তো আবার একটা হাবা ভাই আছে জানো তো?'

'নাহ্?'

'বলিনি? ওটাকেও তো আমায় পুষতে হয়। পুরো জাঁতাকলে পড়ে আছি।'

'অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।'

'দু-র! কখন করব বলো তো? সেই সকালে বের হয়ে রাত্তিরে গিয়ে বিছানায় আছাড় খাই, চেষ্টা করার সময়টা কোথায়? তারপর...।'

কথায় বাধা দিয়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'হ্যালো, হ্যাঁ বাবু...না এখনও আসেনি...হ্যাঁ ঠিক আছে...হ্যাঁ বলে দেব।' ফোনটা নামিয়ে রাখল সমীরদা।

অতনু বুঝল ওপর থেকে মালিক ফোন করেছিল।

'কী আসেনি সমীরদা?'

'ওই পুরি...ওহ্ তো তুমি জানোই না। এখানে প্রত্যেক শনিবার একটা মজা হয়।'

'মজা, এখানে। কীসের?' অবাক হয়ে গেল অতনু।

'আরেকটু পরে নিজেই দেখবে।...ওই দেখো বলতে বলতে এসে গেছে।'

দুটো অল্পবয়েসি বিহারি ছেলে শালপাতা চাপা দেওয়া ঝুড়ি আর মাঝারি সাইজের এনামেলের গামলা নিয়ে গদির সামনে এনে রাখল।

'ইতনা দের কিঁউ কিয়া?'

'ও আজ আদমি কম হ্যায় বাবু।'

'অ্যায়সা বাহানা রোজ নেহি চলেগা বোল দেনা আপনে মালিক কো।

আগ্‌লে দিন অগর ইগারা বাজে কে বাদ আওগে তো সামান লওটা দুঙ্গা।'

ছেলে দুটো চুপচাপ সমীরদার কথা শুনে মাথা নেড়ে চলে গেল।

'ব্যাপার কী সমীরদা?'

'কী আন্দাজ করো তো।'

'গন্ধটা তো পেটে মোচড় দিচ্ছে।'

'ঢাকা তুলে দেখো।'

সত্যিই তাই। ঝুড়ি ভর্তি লুচি আর গামলাটায় তরকারি।

'এসব কার জন্য?'

'দেখো না, কার জন্য।'

বেলা বারোটা বাজাতে না বাজতেই অতনু দেখল পিলপিল করে ভিখিরি আসতে শুরু করেছে। বেশিরভাগই মহিলা। গলিটা ভরে গেছে ভিখিরিতে। দলে দলে এসে দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে আর সমীরদা শালপাতা ছিঁড়ে তার মধ্যে চারটে লুচি আর একটু তরকারি ঢেলে প্রত্যেকের হাতে ধরাচ্ছে। দিয়েই চেল্লাচ্ছে 'যার হয়ে গেছে এখানে দাঁড়াবে না। আগে যাও, আগে যাও।'

'অ বাবু, আমাকে তরকারি দিওনি।'

'আমায় এখেনে তরকারি দাও।...আরেকটু দাও না গো।'

'পুরো গালমাটা ঢেলে দেব না কি!'

'ও দাদা, আর কতক্ষণ দাঁড়াব?'

'তাহলে ভাগ।'

'আর দুটো বেশি লুচি দাও না।'

'কেন, তুই কে?'

'ওই দেখো, ও দুবার নিচ্ছে।'

'কে, কে দু-বার নিচ্ছে? আমি দেখতে পেলে কিন্তু কাউকে আর দেব না।'

'কোথায় দুবার নিলাম, এটা তো পাশের বাবু দিল।'

'দুবারই তো নিলি।'

'কোথায় নিলাম? এই তো এসে দাঁড়িয়েছি।'

'আ-আ-হ্ ভাগ্ ভাগ, এখান থেকে।'

'দাদা, আমার দুজন আছি।'

'কোথায় দুজন?'

'এই তো', বলে বছর কুড়ির মেয়েটা কোলের দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দিল।

'ও লুচি খায়?'

'খাবে না কেন, সব খায়!'

'শালা রাক্ষস সব।' বলে সমীরদা ছ'টা শালপাতায় মুড়ে দিল।

অতনু হাঁ করে দেখছিল, কলকাতায় এত ভিখিরি আছে! কোথায় থাকে এরা? কোত্থেকে এল? আজ কী?

'হাঁ করে দেখছ কী! একটু হাত লাগাও।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, করছি' বলে অতনুও শালপাতায় লুচি মুড়তে গেল।

'চারটের বেশি কাউকে দেবে না।'

'ঠিক আছে।'

'অ নতুনবাবু আমরা তিনজন আছি। হিসেব করে দেবে।'

'উরে শাল্লা? আবার নতুনবাবু' সমীরদা টোন কাটল।

খাবার দিতে দিতে অতনু একফাঁকে তাকাল সমীরদার দিকে। লোকটা হঠাৎ যেন রাজার মতো হয়ে গেছে। ভীষণ ব্যস্ত এক রাজা দু-হাতে দরিদ্রকে বিলোচ্ছে। একে ধমকাচ্ছে, তাকে দয়া করছে, ইচ্ছেমতো। নির্জীব মানুষটাকে এইরকম হয়ে উঠতে দেখে ভালো লাগল অতনুর।

'আর নেই, শেষ, ভাগ সব' সমীরদা হাত তুলে ঘোষণা করল।

'পয়সা দাও।'

'একটু ঘুরে এসো।'

'কতক্ষণ?'

'শালা কথা দেখো! আমি কি ঠিকে নিয়ে বসে আছি না কি?' বলে সমীরদা অতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো তো ওই সেল্‌ফটার পিছনে একটা পুঁটলি আছে, ওটাকে বার করো।'

অতনু হাত বাড়িয়ে টেনে আনল ওটাকে। বেশ ভারী।

কয়েকটা ভিখিরি ঠায় সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সমীরদা তেড়ে ধমক লাগল, 'কী হল, বলছি না ঘুরে এসো। এখানে দাঁড়ালে একটাকেও দেব না।'

মুহূর্তে সব ফাঁকা।

'খোলো ওটাকে।'

অতনু পুঁটলিটাকে খুলল। খুচরো পয়সায় ভর্তি।

'এবারে এখান থেকে কিছু বার করে এখানে একটা একটা করে সাজাও।'

অতনু সিকি, আধুলি আর সিকির মতো দেখতে গোল দশ পয়সাগুলো ফরাসের ওপর সাজাতে সাজাতে বলল, 'সমীরদা, দশ পয়সা নেয়?'

'না নিলে না নেবে, তুমি সাজাও তো।'

সমীরদার মুড আজ একেবারে অন্যরকম, কোনও এককালে লোকটা সত্যিই কি এইরকম ছিল?

সাজানো হয়ে যাওয়ার পর সমীরদা বলল, 'বলো কী বুঝলে?'

অতনু ঠোঁট উলটো বলল, 'দেখলাম, বুঝলাম না।'

'আরে বাবা প্রত্যেক শনিবার এখানকার নিয়ম ভিখিরিদের দান করা। বেশির ভাগই দু-নম্বর ইনকাম তো। খানিকটা দান করে পাপ হালকা করে।'

'সবাই এরকম দেয়?'

'না, সবাই অবশ্য লুচি খাওয়ায় না। শুধু পয়সা দেয়। এরা আবার দুটোই করে।'

'এই এত ভিখিরি সব কোথায় থাকে সমীরদা?'

'কিছু কলকাতার, আর সব এদিক-ওদিক থেকে আসে।'

'তা বলে এত!'

'আরে, পুরো দেশটাই তো শালা ভিখারির, হ্যাহ্...হ্যাহ্।'

অতনু অবাক হয়ে দেখছিল কীভাবে একটার পর একটা ভিখিরি আসছে আর সাজানো পয়সাগুলো থেকে ঠিক একটা করে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। চোট্টামো করে কেউ একটার বেশি দুটো তুলছে না। নিলে আবার বলে যাচ্ছে, 'দুজনে আছি, দুটো নিলাম।'

অতনুকে দেখে সমীরদা তাড়া লাগাল, 'হাঁ করে দেখছ কী! হাত চালাও, ওদিকে তাকিয়ে থাকালে দিন পেরিয়ে যাবে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সিকি-আধুলিগুলো সব শেষ। শুধু গোটা পাঁচেক দশ পয়সা, যেগুলো চোলাই করে মেশানো হয়েছিল সেগুলো পড়ে রয়েছে দেখে অতনু বলল, 'সমীরদা, ওই দেখো, দশ পয়সাগুলো পড়ে আছে।'

'থাকুক, মন দিয়ে কাজ করো এখন, ভুল হলে কেলেঙ্কারি হবে।'

অতনু আবার সেল্স রেজিস্টার লেখায় মন দিল।

মিনিট দুয়েক যেতে যেতেই 'কাকু দুটো নিচ্ছি' চিৎকারে চমকে উঠে তাকাল অতনু। খালি গা, রংচটা ঢলঢলে হাফপ্যান্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা, ছ-সাত বছরের একটা বাচ্চা দুটো দশ পয়সা তুলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বুড়িকে দিল।

অসম্ভব নোংরা থান পরা ঝুলকালি মাথা বুড়িটা পয়সা দুটো নিয়ে চোখের সামনে ভালো করে মেলে ধরল, তারপর বলল, 'আ মোলো এগুলো নিয়েছিস কেন, এ তো কচি পয়সা। রেখে দে, রেখে দে।'

বাচ্চাটার পয়সা দুটো ফেরত দেওয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না।

বুড়ি আবার ধামকাল, 'আ দুর! ও কচি পয়সা কেউ নেবে নে। রেখে দে...উহ্ একদিন ভিক্কে দেবে তাতেও ইয়ে' বলে বেশ রাগের সঙ্গে পয়সা দুটো প্রায় ছুঁড়ে গদির ওপর ফেলে দিয়ে চলে গেল। অতনুর কানে ভনভন করছিল 'কচি পয়সা' শব্দটা। দশ পয়সার এমন আজব নাম জন্মেও শোনেনি! ফিক করে হেসে ফেলে সমীরদার দিকে তাকালও, সমীরদা গম্ভীর।

চার

এত ছোট অথচ প্রকাণ্ড একটা জীবন সকলে বয়ে বেড়াচ্ছে। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে একাকার করে দিয়ে মানুষ চলেছে প্রতিদিন।—এখানটায় এসে থেমে পড়ল অতনু। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার লিখল—আসলে যে যার মিথ্যেকে নিয়ে বাঁচে। এত অসহায়, এত অসহায়...। ডায়েরি বন্ধ করে দিল। কতদিন পর আবার ডায়েরিটায় দু-কলম আঁচড় পড়ল! সকাল থেকে রাত্তির শুধু নিজেকে বেচার বাজারে বসাতে বসাতে সবুজ রঙের প্রিয় ডায়েরিটার কথা

ভুলেই গেছিল। আজ রাত্তিরে হঠাৎ মনে পড়ে গেছিল ওটার কথা। অতনু ঘরে একা শোয়। পাশের ঘরে বাবা-মা আর দিদি। মাঝে দরজাটার এখানে ওখানে ফাঁকফোঁকর। এঘরে আলো জ্বলছে ওঘর থেকে বোঝা যায়। মা একটু আগেই পাশের ঘর থেকে বলেছে আর দেরি না করে শুয়ে পড়তে। ঘুম আসছে না। আজকাল এত পরিশ্রম সত্ত্বেও কেন যে ঘুম আসতে চায় না। শুলেই দুনিয়ার ভাবনা মাথায় এরোপ্লেনের মতো উৎকট শব্দে পাক খেতে থাকে। অফিসের পরিবেশটা যেন রোজ গলা টিপে ধরে অতনুর। দম আটকে আসে। প্রতিদিন রাতে ভেঙেচুরে শেষ হয়ে বাড়ি ফিরে ঠিক করে, কাল থেকে আর যাব না। কিছুতেই না। যা হয় হোক, তখন মনে পড়ে বাড়ির অন্য তিনটে প্রাণী জিরাফের মতো গলা উঁচিয়ে আশার আকাশে মুখ ডুবিয়ে রয়েছে। অতনু শিগগিরই এখান থেকে এক্সপেরিয়ান্স জোগাড় করে বড় কোম্পানিতে চান্স পেয়ে যাবে।...কোথায় যাবে? কে দেবে? কেউ জানে না। সেই মেয়েটাও না।...আচ্ছা সে এখন কোথায়?...ধু-স, আবার ভুলভাল ভাবনা আসছে। এইসব উদ্ভট চিন্তাগুলো ভীষণ এলোমেলো করে দেয় ওকে। ভয় পেয়ে গেল অতনু। তাড়াতাড়ি লাইট নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকল।

'আমি আর থাকছি না জানো তো।'

'মানে!' চমকে উঠে সমীরদার দিকে তাকাল অতনু।

'কালকেই বানোয়ারিজি একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনতে পেয়ে গেছি। আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই ভাগাবে।'

'দুর, তাই আবার হয়!'

'হবে না কেন, আমাকে যেখানে সাতাশশো দেয় তোমাকে সে জায়গায় আঠারোশোয় পেয়ে গেছে। আমায় তালে আর রাখবে কেন।...কী-ই যে হবে ভেবে পাচ্ছি না! এতগুলো পেট নিয়ে দাঁড়াব কোথায়?'

'আরে ধুৎ, এতদিন এখানে রয়েছেন হুট করে অমন কেউ ভাগিয়ে দেয়!'

'দেয় দেয়, এদের প্রাণে মায়াদয়া বলে কিছু নেই।'

'কিন্তু আপনি চলে গেলে এত কাজ দেখবে কে?'

'আর দেখার লোকের অভাব না কি? পৃথিবীতে কারও জন্য কিছু আটকায় না।...মাথায় আসছে না কী করব!'

সমীরদার দিকে তাকাল অতনু। গতকালের হঠাৎ রাজা হয়ে ওঠা মানুষটা আজকে কেমন যেন কেঁচোর মতো হয়ে উঠেছে। বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। কী বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা নীচু করে চালানগুলো লিখতে থাকল অতনু।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ সমীরদা বলে উঠল। 'তুমি কোথাও পেলে না, না?'

অতনু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'খোঁজ লাগিয়েছিলে?'

মিথ্যে কথাটা গলার সামনে এসে দলা পাকিয়ে আটকে গেছিল। অতনু ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'হ্যাঁ। পাইনি।'

আবার চুপ।

মিনিট দুয়েক বাদে টেলিফোনটা বেজে উঠল। সমীরদা তুলল, 'হ্যালো...হ্যাঁ বাবু...হুঁ...পাঠাচ্ছি।' রিসিভার রেখে দিয়ে সমীরদা অতনুকে বলল, 'ওপরে যাও। বনোয়ারিজি ডাকছেন।' সমীরদার মুখ-চোখ মুহূর্তে কেমন যেন অন্যরকম। চোখের ভুল?

'আমাকে? কেন?'

'কী করে জানব? কিছু গড়বড় করেছ হয়তো। তাড়াতাড়ি যাও।'

মালিক এমনিতে অতনুর সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলে না। যা কথা সব সমীরদার সঙ্গে। আজকে হঠাৎ...!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বুকের ভেতর দ্রুত কয়েক বার ঢিপ-ঢিপ-ঢিপ করে উঠল।

'আসব স্যার?'

'হু।'

'আমায় ডেকেছেন?'

'হাঁ, কী বেপার অতনু, তুমি বোলে কাম ঠিক ঢংসে করতে পারছ না।'

'আমি স্যার...'

'দেখো ভাই, তুমি বিমলবাবুর লোক আছ, সে কারণ তোমায় রাখা। লেকিন কাম না পারলে তো মুশকিল হয়ে যাবে।'

'কিন্তু স্যার আমি তো...'

'শুনলাম তুমি ডিউটি নেগলেক্ট করছ।'

আর কোনও কথা বলতে পারল না অতনু। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আচমকা বিশাল চেহারাটা সামান্য দুলিয়ে হেসে উঠল বনোয়ারিজি। 'আরে ভাই ছোড়ো উসব ফালতু বাত। তোমার কাম হামার খুব পসন্দ লাগছে। খুব মন দিয়ে কাজ করো। কুছুদিন পর তোমাকেই একা সব সামলাতে হবে। সমীর তো শালা এরমধ্যেই বুডঢ়া হয়ে গেল। ওর থেকে জলদি সব বুঝে নাও, ঠিক আছে।'

'...আচ্ছা স্যার।'

'ঠিক হ্যায়।'

অতনু ঘুরতে যাচ্ছিল।

'অওর শুনো, সমীরকে ইসব কুছু বোলতে হোবে না।'

অতনু ঘাড় নাড়ল।

'যাও দিল লগাকে কাম করো।'

সমীরদা...সমীরদা এইরকম করল! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লোকটার ওপর প্রচণ্ড ক্রোধ হল অতনুর। শালা এইভাবে পিছন থেকে ছুরি মারা! হনহন করে নেমে এল।

সমীরদা যেন ওর অপেক্ষাতেই হাঁ করে বসে ছিল। অতনু সরাসরি তাকাল লোকটার দিকে। একটা তীব্র কৌতূহল মেশানো অপরাধবোধ নিয়ে লোকটার চোখ দুটো অতনুর দিকে চেয়ে আছে। দলমোচড়া পাকানো ভিতু কেন্নোর মতো হয়ে রয়েছে লোকটা। মুহূর্তে সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। বিষণ্ণ, তিক্ত একটা কটু স্বাদ নিয়ে শুধু চুপ করে তাকিয়ে থাকল অতনু।

'কী হল, কী ব্যাপার?'

'উঁ?'

'ডেকেছিল কেন?'

'এমনিই।'

'এমনিই মানে!'

'এমনিই মানে কাজকর্ম্ম কেমন চলছে জিগ্যেস করলেন।'

'ধুৎ, বলো না কী জন্য ডাকল?'

'বললাম তো।'

'শুধু এইজন্য?'

'হ্যাঁ, এই-ই।'

সমীরদা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল অতনুর দিকে। তারপর আর কোনও কথা না বলে মাথা নীচু করে কাজ করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর আবার মুখ তুলে বেশ অনুনয়ের সুরে বলল,—'বলো না বাবা, আর কী বলল।'

'সিরিয়াসলি বলছি, আর কিছু বলেনি, কেন, কী হয়েছে বলুন তো?' অতনু সহজ হেসে জিগ্যেস করল।

'নাহ্, কিছু হয়নি। এমনিই...'

আর কোনও কথা হল না।

সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ এম জি রোড ধরে হাঁটছিল দুজনে। রোজ হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটুকু দুজনে একসঙ্গে হেঁটেই ফেরে। কারও মুখে কথা নেই। বিকেলের ঘটনার পর সমীরদা কেমন যেন একটা গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। অতনুর দিকে তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। ক্রোধ নয়, মানুষটার ওপর কী যেন একটা খুব অস্বস্তি হচ্ছিল অতনুর। হাঁটতে হাঁটতে একসময় জিগ্যেস করে ফেলল, 'ব্যাপার কী সমীরদা, এত চুপ কেন?'

'চুপ? নাহ্ চুপ নয় তো।'

'আজকেই লাস্ট কথা বলে নিন আমার সঙ্গে।'

সমীরদা তাকাল।

অতনু আলতো হেসে বসল, 'কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি। কাল থেকে আর আসব না।'

'সে কী, কেন?' রাস্তায় থেমে পড়ল সমীরদা, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

অতনু যতটা সম্ভব গম্ভীর গলা করে বলল, 'তখন আপনাকে বলিনি, জানেন বনোয়ারিজি ওই সময় ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী যাচ্ছেতাই অপমান করেছে আমায়।'

'কী বলেছে?' সমীরদার চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'বলে আমি না কি অ্যাকাউন্টসের কিচ্ছু জানি না, ডিউটি নেগলেক্ট করি। আমাকে বেকার টাকা দিয়ে পোষা হচ্ছে।'

'সত্যিই কাল থেকে আসবে না?'

'এরপর! শালা কুকুর না কি? এরকম চাকরি হাজারটা রয়েছে বাজারে... কী হল, থেমে পড়লেন কেন, চলুন।'

'অ্যাঁহ...হ্যাঁ-হ্যাঁ,' উৎসাহের একটা পুকুরে বাচ্চা ছেলের মতো ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমীরদা। 'আমি বলেছিলাম না, আমি বলেছিলাম না এ শালা মহা হারামি, এখানে থেকে লাইফ শেষ হয়ে যাবে। আরে আমার তো যা হওয়ার...' পুরোনো কথাগুলো নতুন উত্তেজনায় বলতে গিয়ে বারবার কথা আটকে যাচ্ছিল সমীরদার। থুতু ছিটকাচ্ছিল। অতনু শুধু একদৃষ্টে চুপ করে তাকিয়ে ছিল। এত আরাম...এত আরাম লাগছে শরীরে!

এতবড় করে একমনে কথাগুলো বলে যেতে যেতে সমীরদা একবার তাকাল অতনুর দিকে। তারপর আচমকা চুপ করে গেল।

হাওড়া ব্রিজে উঠল দুজনে, হাজার হাজার মানুষ অন্ধের মতো ধাক্কাধাক্কি করতে করতে প্রাণপণ ছুটছে ট্রেন ধরার জন্য। তিরতির করে গঙ্গার হাওয়া বইছে। নদীর ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পর অতনু আড়চোড়ে একবার তাকাল সমীরদার দিকে। মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছে লোকটা। অতনু আবার নতুন করে কী যেন বলতে যাবে তখনই, 'এমনিতে তোকে খুব ভালোবাসি রে,' কথাটা হঠাৎ করে বলে ফেলে অতনুর হাত ধরল সমীরদা। খসখসে হাতটা ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে।

শারদীয় দেশ
২০০৪

ডানা

'গত জানুয়ারিতে এবারের থেকে আরও বেশি ঠান্ডা ছিল, না?' জিগ্যেস করল অনুষ্কা। নিজের হাতের তালুদুটো খুব করে ঘষে নিয়ে কৃষ্ণেন্দু সিগারেট বার করে ঠোঁটে নিল। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে দু-তিনবার ফসকাল। ঠান্ডায় ওর আঙুলগুলো কাঁপছে তিরতির করে। চোয়ালের অবস্থাও তাই। সিগারেটে আগুন দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কী বলছ গো! আমার তো আগের বারের চেয়ে এবার আরও বেশি ঠান্ডা মনে হচ্ছে। হ্যান্ড গ্লাভস দুটো কেন যে আনলাম না।'

'ধুস্! গতবার মনে আছে প্রায় হাঁটু অব্দি বরফ হয়ে গিয়েছিল হোটেলের সামনে। সারারাত স্নো ফল হল মনে নেই? এবার তো বরফই নেই।'

'আরে ম্যাডাম বরফ পড়লে ঠান্ডা একটু কম হয় জানো না? বরং এই হাড়ে খটখটি লাগিয়ে দেওয়া হাওয়াটাই অবস্থা টাইট করে দেয়।' গায়ে চাপানো দুটো সোয়েটারের ওপর লেদার জ্যাকেট, কানঢাকা ক্যাপ,

গলায় প্যাঁচানো মাফলার—এসব কিছুর পরেও ঠকঠক করে কাঁপছে কৃষ্ণেন্দু।

'তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ।' বলে হি হি করে হাসল অনুষ্কা! মুখ থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভোর হচ্ছে সান্দাকফুতে। ওরা দুজন সূর্যোদয়ের জন্য দাঁড়িয়ে। ওদের মতো আরও বেশি কিছু উৎসাহী চোখ পুবের আকাশে মেলে রাখা। প্রথমে পাহাড়ের কোলে জমে থাকা সারারাত ধরে ঘুমোনো মেঘ জেগে উঠে ওপরে আসতে থাকল একটু একটু করে। উঁকি দেওয়া মাত্র সূর্যের আলোর ঝলমল করে উঠল সেই মেঘ। রামধনুর রং খেলতে শুরু করল চোখের সামনে। তারপর যত একটু একটু করে সূর্য জাগল, আলোর পাগলামো চলল বেড়ে। এত রূপ! এত রং! মুগ্ধ হয়ে গেল দুজন। অনুষ্কার গলায় ঝোলানো ক্যামেরা গলাতেই ঝুলে থাকল। কৃষ্ণেন্দু ফিসফিস করে বলে উঠল 'স্রেফ এই মুহূর্তটুকুর পর আমি মরে যেতেও রাজি।' সামনে আকাশজোড়া কাঞ্চনজঙঘা। তারপর কুম্ভকর্ণ, থ্রি সিস্টার থেকে খুব ছোট এভারেস্ট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'উহ্, কী কপাল আজকে!'

'নিজেকে দেবতা মনে হয় এখন। না?' কৃষ্ণেন্দু জিগ্যেস করল।

অনুষ্কা অস্ফুটে বলল, 'হুঁ।' ঝকঝকে রোদ্দুরের সকাল হওয়া অব্দি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। তারপর কৃষ্ণেন্দু বলল, 'চলো ফিরি।'

'তোমার যে কোনটা প্রিয় আজও কিন্তু বললে না অনুষ্কা।' সি বিচে বালিতে পা ছড়িয়ে বসে সন্ধেবেলা জিগ্যেস করল কৃষ্ণেন্দু।

'কোনটা মানে?'

'মানে সমুদ্র না পাহাড়?'

'তোমার?'

'উঁ...উঁ পরে বলছি, আগে তুমি বলো।'

'পারব না বলতে।'

'কেন?'

'সমুদ্র আমার হৃদয়।'

'আর পাহাড় তোমার হৃদয়ের ওপরে অবস্থিত।'

'এই, অসভ্যতা হচ্ছে।' কপট রাগ দেখাল অনুষ্কা। তারপর সমুদ্রে চোখ ভাসিয়ে দিয়ে বলল, 'হয়তো কথাটা ঠিকই বলেছ। পাহাড় আমার বুক...আর তোমার কে বেশি প্রিয় বলো?'

'আমার তো সমুদ্র হল মন আর পাহাড় প্রাণ।'

আলতো হাসল দুজনে। নোনা জলে ভেজা বালিতে রাখা হাতে হাত ছুঁল।

'শূন্যতা তোমার খুব ভালো লাগে কৃষ্ণেন্দু?'

'কোন শূন্যতার কথা বলছ?'

'মানে, শূন্যতা আবার ক'রকমের হয়?'

'শূন্যই তো পূর্ণ।'

'বাব্বাহ, তুমি আবার এত ভারী ভারী কথা শিখলে কবে?'

'আমার কথা নয়, উপনিষদের।'

'আজকাল ওসব চর্চাও চলছে না কি?'

'না-নাহ্।'

'এর আগের বার যখন মরুভূমিতে এসেছিলাম কীরকম ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছিল মনে পড়ে?'

'পড়ে না আবার! বাপরে! এমন শান্ত হঠাৎ যে ওইরকম ভয়ংকর হয়ে উঠবে ভাবাই যায় না।' বলতে বলতে অনুষ্কা তাকাল কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের আলো কৃষ্ণেন্দুর গোটা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে। কী সুন্দর দেখতে লাগছে ওকে। সোনার জলে স্নান করছে গোটা পৃথিবী। কৃষ্ণেন্দু বলল, 'প্রকৃতির প্রত্যেকটা রূপের একেকরকম সুর আছে, না? এই ধরো যখন পাহাড়ে যাই কিংবা কোনও ঝরনার পাশে, স্পষ্ট সন্তুর শুনতে পাই আমি, জঙ্গলে অদ্ভুত এক দ্রিমদ্রিম মাদল।'

'এখন কী শুনতে পাচ্ছ?'

'সারেঙ্গি। সুলতান খান বাজাচ্ছেন। চোখ বুজে শোনো একবার।'

চোখ বুজে থাকল দুজনেই। আদিগন্ত বিস্তৃত আঁচড়কাটা বালির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে সত্যি সত্যি যেন সারেঙ্গির ছড় টানার শব্দ। বুকে আঁচড়কাটা সুর ভেসে আসছে। দুজনে অনেকক্ষণ চোখ বুজে শোনার পর অনুষ্কা বলল 'আজ পূর্ণিমা।'

'মরুভূমিতে পূর্ণিমা আজ প্রথম দেখব। আবার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সহ্য করতে পারব তো কৃষ্ণেন্দু?' কথা বলতে বলতে সূর্য ঢলছিল। অন্ধকার চুঁইয়ে নামছিল। একটু একটু করে। '...পারব তো কৃষ্ণেন্দু; এত সুন্দরকে সহ্য করতে?...পারব তো?' কৃষ্ণেন্দুর হাত শক্ত করে চেপে ধরল অনুষ্কা।

আচমকা ঘন অন্ধকার গোটা অফিস ফ্লোরে। লোডশেডিং। সামনে কম্পিউটারে স্ক্রিন সেভারের স্লাইড শোয়ে একটার পর একটা ভেসে ওঠা অ্যামেজিং নেচারস্-এর সিনগুলো ডুবে গেল অন্ধকারে। সেই সঙ্গে রোজ সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত সল্টলেকে একটা নামকরা এমএনসির ব্রাঞ্চ অফিসে খুব ভালো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মুখ থুবড়ে কাজ করা ছেলেমেয়ে দুটো রোজ আধ ঘণ্টার লাঞ্চ আওয়ারে একসঙ্গে স্বপ্ন-ঘোরাটুকুও তলিয়ে গেল এক অদ্ভুত শূন্য অন্ধকারের ভেতর।

'বাহ্, গেল!' কৃষ্ণেন্দু বলল, অনুষ্কা তখনও চুপ। ঘোরের মধ্যে।

'তোমাকে এখনও নতুন ইউপিএস দিয়ে যায়নি?' অনুষ্কা উত্তর দিল না। গোটা ফ্লোর জুড়ে পিঁক পিঁক শব্দ।

ওদের দুজনের এই খেলাটা প্রায় রোজই হয় লাঞ্চের সময়। কৃষ্ণেন্দুই শিখিয়েছিল একদিন। শিখিয়ে দিয়ে বলেছিল 'দেখবে ক'দিন পর নেশা লেগে যাবে।' প্রথম দিকে ভালো লাগত না অনুষ্কার। এ আবার কেমন ছেলেমানুষি অসম্ভবের খেলা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা কাজ। তারপর অফিসের গাড়িতে গা এলিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে যাহোক কিছু একটা মুখে গুঁজে ঘুম। শনি-রবি দু-দিন ছুটি। এই ছিল সপ্তাহের রুটিন। কৃষ্ণেন্দু বলত 'চলো না কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যায় দু-দিনে। বকখালি কিংবা গাদিয়াড়া।' ইচ্ছে করত না অনুষ্কার। পাঁচ দিনের

অক্লান্ত কাজের ক্লান্তি কাটানো আর আগামী সপ্তাহের পাঁচ দিনের কাজের এনার্জি সঞ্চয়ের জন্য এই দুটো দিন ধরে স্রেফ শুয়ে ঘুমিয়ে, টিভি দেখে, ম্যাগাজিনের পাতা উলটে কাটিয়ে দিত। কখনও বা শুধুই এলোমেলো ভাবনায়। কনভেন্ট স্কুলে এইচ এস। তারপর শ্রীরামপুর থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে প্রেসিডেন্সিতে বি এস সিতে অনার্স। পার্ট টু-র রেজাল্ট বেরোবার আগের দিন বাবা মারা গেল। স্ট্রোক। পেনশন হাফ। দাদা সদ্য বিয়ে করেছে। কিছুদিন পরেই বউদির প্লাক করা সুন্দর দুই ভুরুর মাঝখানে সামান্য ভাঁজ। চুপচাপ চাকরির চেষ্টায়। সেই সময়টা ভীষণ টাফ গেছে। ইন্টারভিউ 'এক্সপিরিয়েন্স নেই?' 'কোনও কোর্স করেননি?'—'না-না-না'—ভেঙে যাচ্ছিল অনুষ্কা। তখন এক বন্ধু জানাল এই এমএনসিতে ফ্রেশার নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্লাই। স্মার্টনেস, ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ, লেগে গেল চাকরিটা। প্রথম মাস কয়েক অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই লাস্ট ট্রেন। স্টেশনে নেমে বাড়ি ফেরার রিকশা পাওয়া যেত না। যাও বা কোনওদিন জুটত, রিকশাওয়ালা মদে চুর। খুব রিস্ক। ভয় করত ভীষণ। অফিসে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয়ের মতোই আলাপ হয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে। প্রায় ছ'ফিটের মতো লম্বা। রোগাটে গড়ন। শ্যামলা রং। টিকালো নাক, ঘন চুল ব্যাক ব্র্যাশ করা। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে কথা বলা যেত না। গা ঝিমঝিম করত কেমন যেন! হাতের আঙুলগুলো খুব লম্বা। পরিচয়ের ক'দিন পরেই মনে হয়েছিল বড় অদ্ভুত ছেলেটা! মুখে সবসময় ছেলেমানুষের হাসি জড়িয়ে। কথাও বলে খুব মজার মজার। ইংলিশ অ্যাকসেন্ট পিওর অক্সফোর্ড। কিন্তু শুধু প্রয়োজন ছাড়া স্রেফ বাংলা। অনুষ্কার জয়েনিংয়ের দ্বিতীয় দিনে নিজেই এসে পরিচয় করেছিল কৃষ্ণেন্দু। অনুষ্কা বারবারই ইনট্রোভার্ট। যত কথা শুধু ওর নিজের সঙ্গে। ছেলেটা কখন যে অনুষ্কার অলক্ষ্যেই ওর জড়তার জালগুলো একে একে ছিঁড়ে ফেলছিল টেরই পাইনি ও। কৃষ্ণেন্দু কাছে এলেই বুকের ভেতর গুমগুম শব্দে কান বন্ধ হয়ে যেত। কোনও কথাই শুনতে পেত না তখন। ছেলেটার প্রাণখোলা হাসিটাই তখন ঝুড়মুড় করে বৃষ্টি ঝরিয়ে ভিজিয়ে

দিত বুক। যত ইচ্ছে করত কথা বলতে ততই মুখ আটকে যেত। খুব কঠিন বিষয়ে নিয়েও কৃষ্ণেন্দু মাঝেমধ্যে এমন সহজভাবে গল্পচ্ছলে আলোচনা করত যে মুগ্ধ হয়ে শুনত অনুষ্কা। আর শুনত ওর বেড়ানোর গল্প। স্রেফ একা একা এই বয়সেই প্রায় গোটা ভারত চষে ফেলেছে ছেলেটা। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা এক এক জায়গায়। একদিন তো অনুষ্কা জিগ্যেসই করে ফেলল, 'এভাবে একা একা অচেনা জায়গায় চলে যান, ভয় করে না?'

'ভয়? হ্যাঁ, করে তো। আবার এই যানজট, ভিড়ে, দশ-বারো ঘণ্টা ননস্টপ ডিউটিতে ফিরে আসতে ভয় করে।'

'ফেরেন কেন তা হলে?' বোকার মতো প্রশ্নটা করে ফেলেই ওর মনে পড়ে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দুর রিটায়ার্ড বাবা, আলসারের মা আর অবিবাহিতা বোনের কথা।

'সময় আসুক, একদিন আর ফিরব না, ঠিক ফিরব না,' বলে অদ্ভুত হেসেছিল কৃষ্ণেন্দু।

সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হাসি আর একটা লাইন 'জানি বন্ধু জানি তোমার আছে গো হাতখানি।' তীব্র মনস্তাপেও হঠাৎ চমকে উঠেছিল অনুষ্কা। এক অচেনা অনুভূতিতে। হাত! আমার হাত! চুপ করে গিয়েছিল। আর পারেনি সেদিন কথা বলতে। কৃষ্ণেন্দু কিন্তু সেকথা বলার পরেও একইরকম স্বচ্ছন্দ। ওই একদিন বলল, 'অনুষ্কা এভাবে রিস্ক নিয়ে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি পারবে না। এদিকেই কোনও লেডিস হোস্টেল বা বাড়ি ভাড়া-টাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা দেখো।' হোস্টেলে সবার সঙ্গে অসম্ভব। কোম্পানির স্কেল বেশ ভালোই হওয়ায় উলটোডাঙায় একটা সিঙ্গল বেডরুমের ফ্ল্যাট কৃষ্ণেন্দুর চেষ্টায়। ধন্যবাদ দেওয়ার আর দরকার ছিল না। কেননা দুজনের সম্পর্কটা আর ততদিনে সহকর্মীর প্রতি সৌজন্যমূলক নেই। তবু মাঝেমধ্যে আচমকা বড্ড একা মনে হয় অনুষ্কার। মা কখনও-সখনও এসে থেকে যায় কয়েকদিন। অনুষ্কার ইচ্ছে ছিল মাকে ওর নিজের কাছেই নিয়ে এসে রাখবে। মা-ও মোটামুটি রাজি ছিল। কিন্তু দাদার অনিচ্ছায় হয়ে ওঠেনি। একা একা মাঝেমধ্যে বড় ভয় লাগে। শরীর জুড়ে অস্বস্তি। কৃষ্ণেন্দু ওকে

বোঝে। বলে, 'ক'দিন বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও।'

'না, না!'

'তাহলে এমনিই ছুটি নিয়ে থাকো ক'দিন। ইদানীং প্রচুর লোড নিয়ে ফেলছ।'

ভালো পারফরম্যান্সের জন্য অফিসে অনুষ্কার এরমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম।

'ওই দুটো ঘরের মধ্যে সারাদিন একা একা—অসম্ভব!' প্রায় আঁতকে উঠেছিল অনুষ্কা।

'তাহলে আমি গিয়ে থাকব তোমার সঙ্গে?'

'যাবে?'

'আপত্তি নেই।' স্মার্ট উত্তর কৃষ্ণেন্দুর।

একাকীত্ব কি এতটাই ভয়ের যে বাকি সমস্ত ভয় ভুলিয়ে দিতে পারে?'

'শুধু অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস কী করে পারো বলো তো?'

'উপায় নেই!'

'উপায় নেই, না কি ইচ্ছে নেই?'

'অনেক সময় উপায়ই তো ইচ্ছে তৈরি করে।' কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর শেখানো এই খেলাটা...এই অদ্ভুত খেলাটা খেলতে খেলতে ইদানীং কী যে হয়েছে! সবুজ জঙ্গল, পাহাড়, আকাশ সব যেন গুলিয়ে দেয়। তালগোল পাকিয়ে যায় কাজে। অনুষ্কা রোজ ভাবে আজ কৃষ্ণেন্দুকে কঠোরভাবে বলবে এ খেলা আজ থেকে বন্ধ। কিন্তু পারে না শেষ পর্যন্ত। কাজের প্রেশার বাড়তে থাকে দিনে দিনে। খেলার ইচ্ছেটাও।

'একবার এদিকে এসো, এই যে ম্যাডাম, হ্যালো, আপনাকে বলছি।' অনুষ্কা খেয়াল করেনি কৃষ্ণেন্দু ডাকছে। অনুষ্কা এখন প্রমোশন পেয়ে টিম লিডার। কয়েকজন ছেলেমেয়ে ওর আন্ডারে কাজ করে। নিজের

কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ রেখে কয়েকটা ডেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় ডাকে শুনতে পেল। 'উঁ—ডাকছ?'

'বহুযুগ ধরে। একবার চট করে শুনে যাও। তাড়াতাড়ি।'

'এখুনি আসতে হবে?'

'আসলে ভালো হয়।'

অনুষ্কা উঠে এল। কৃষ্ণেন্দুর স্ক্রিন সেভারে একটা পাখি। সাদা রং, সরু লম্বা ঠোঁট। নীল রঙের জলের ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে ভাসবে বলে। ছড়ানো বিশাল ডানা দুটো ভাঁজ করেনি। এখনও।

'কী বলছ?'

'এটা দেখাতে ডাকলাম।'

'ভালো।'

'কী নাম বলো তো এর?'

'জানি না।'

'এর নাম আর্কটিক টার্ন। পরিযায়ী পাখি। এরা গোটা পৃথিবী উড়ে বেড়ায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ। ভাবতে পারো শুধু এই ডানা দুটো দিয়ে। একবার তাকাও ভালো করে। দেখে মনে হয় না বরফ-বালি-ধুলো-জঙ্গল-সমুদ্র সব কিছুর গুঁড়ো-গন্ধ লেগে রয়েছে?...ইচ্ছে করে আমিও এরকম হয়ে যাই।'

অনুষ্কা ভালো করে দেখল, তারপর হেসে ফেলে বলল 'তোমার কবি হলে ভালো হত।'

'কেন হঠাৎ কবি কেন?'

'না, কবিরা শুনেছি সব কিছুই মানে ওই মনে মনে পাখি-টাখি হয়ে যেতে পারে।'

'ভুল-ভুল। শুধু কবি নয়। ডানা আমাদের সবার আছে। শুধু মেলতে শিখতে হয়। শিখবে?'

'আবার শুরু হল!' বলে হেসে নিজের চেয়ারে চলে এল অনুষ্কা। একেবারে পাগল ছেলে! ভালো লাগে খ্যাপামোগুলো। এমনভাবে বলে

কথাগুলো!...ই-ই-স্ অনেক কাজ রয়েছে, মাথা থেকে এখন বাদ—বাদ—বাদ।

লাঞ্চ আওয়ারে কৃষ্ণেন্দু নিজের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে অনুষ্কার ডেস্কে চলে আসে রোজ। আজকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্কা বলল, 'আজ কিন্তু কোনও খেলা হবে না।'

'বেশ।' কারণ জানতে চেয়েই আগে নিজের স্বভাবমতো রাজি হয়ে গেল কৃষ্ণেন্দু। তারপর একটু চুপ করে বেশ অনুরোধের সুরে বলল, 'ঠিক একটা কারণের জন্য মাত্র দশ মিনিটের জন্যও খেলা যায় না আজ?'

'কারণটা আগে শুনি।' হাসি চেপে চোখ-মুখ স্বাভাবিক রেখে জানতে চাইল অনুষ্কা।

'কারণ আজ শুক্রবার। কাল-পরশু ছুটি এবং সোমবার থেকে আগামী দশ-বারো দিনের জন্য আমি রোজ এ সময়ে তোমাকে বিরক্ত করতে পারব না।'

'কেন?'

'ডানা মেলব।'

'কোথায়?'

'খুব বেশি দূর নয়। লাভা। বছর কয়েক আগে একবার গিয়েছিলাম। তখন ওয়েদার খুব খারাপ ছিল। এবার আশাকরি...'

'একাই?'

'কেন তুমি যাবে সঙ্গে?'

'আমি চাইলেই কি তুমি নেবে তোমার ডানায়?'

'আমার ডানা অনেক বড় আর খুব শক্তি আছে। শক্ত করে যদি ধরে থাকতে পারো পুরো দুনিয়া ঘুরিয়ে আনব।'

'দরকার নেই উড়ে। আমার বাসাই ভালো।'

'তাহলে খেলা কি বন্ধ আজকে?'

'আচ্ছা হোক। কিন্তু ঠিক দশ মিনিট।'

মাউসে হাত দিয়ে গিয়েও থেমে গেল কৃষ্ণেন্দু। 'আচ্ছা অনুষ্কা, সত্যিই কি অফিস আর বাড়ি এই-ই তোমার ভালো লাগে?'

'দেখো কৃষ্ণেন্দু। আমি অনেক কষ্টে আজকে এটুকু জায়গায় পৌঁছেছি, একটা সময় গেছে যখন আমার পাশে, পায়ের নীচে মাটি কিচ্ছু ছিল না। ওই বিপদের সময়েই চিনে নিয়েছি সবাইকে, কেউ এতটুকু হেল্প করেনি আমাকে। আজ যেটুকু প্ল্যাটফর্ম বাঁচবার জন্য পেয়েছি সেটুকু কোনওমতেই হারাতে চাই না।'

কৃষ্ণেন্দু খুব মন দিয়ে শুনল কথাগুলো। তারপর বলল, 'তোমার কথার সবটায় সম্মত হতে পারলাম না।'

ভুরুতে প্রশ্ন রেখে তাকাল অনুষ্কা।

'ওই যে বললে না বিপদের দিনের সবাইকে চিনতে পেরেছ। আসলে কী জানো, বিপদের সময় অন্য কাউকে নয়, নিজেকে চেনা যায়। তোমার কি মনে হয় তুমি নিজেকে পুরোটা চিনেছ?'

'বোধহয়...হয়তো ঠিক জানি না। বাদ দাও এসব কঠিন কথা।'

'বেশ বাদ দিলাম।...আচ্ছা গতবার যখন লাভা গিয়েছিলাম তখনকার ছবিগুলো তোমাকে দেখিয়েছি?'

'উ...উ...মনে পড়ছে না।'

'দাঁড়াও' বলে দৌড়ে নিজের ডেস্কে গিয়ে একটা ফোল্ডার শেয়ার করে ফিরে এল কৃষ্ণেন্দু। অনুষ্কার পাশের চেয়ারে বসে ফোল্ডারটা খুলল। একটার পর একটা ছবি। বেশিরভাগই ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট ঘন জঙ্গল। দু-ধারে লম্বা গাছে ঢাকা বৃষ্টিভেজা বেঁকে যাওয়া রাস্তা, মনাস্ট্রি। একটা ছোট্ট মিউজিয়াম। আবার একটা জঙ্গল। কুয়াশায় ঝাপসা। কৃষ্ণেন্দু পাশে বসে ফিসফিস করে বলে যাচ্ছিল—এটা লোলেগাঁওয়ের জঙ্গল। বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে। প্রচণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু গাছের পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। চারদিক কুয়াশায় অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার রহস্যের যে কী সৌন্দর্য সেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম। দূর থেকে বরফে ঢাকা পাহাড় কিংবা ঝকমকে সবুজ আর ওপরে নীল

অনেক দেখেছি। মুগ্ধ হয়েছি বার বার। কিন্তু একটু দূরের কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, তারপরে কী আছে জানা নেই, এর যে একটা শিরশিরে অনুভূতি...আগে কখনও পাইনি। পাহাড়ের কিনারে খাদের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আকাশে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে-নীচে ওপরে শুধু মেঘ আর মেঘ...'

পরপর ছবি আর কথায় আবার ঘোর লেগে যাচ্ছিল অনুষ্কার। চুপ করে শুনছিল। ছবি-কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কথা বলছিল না ও।

'কেমন ঘুরলেন আজকে? দশ মিনিটে লাভা-লোলেগাঁওয়ের ট্যুর। ফুডিং ফ্রি।' বলে সহজে হেসে নিজের ক্যারিয়ার খুলে একটা পরোটা আর খানিকটা আলুর দম তুলে প্লেটে রেখে অনুষ্কার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এ যে...এবার ফিরুন।'

'তুমি তাহলে যাচ্ছ?' খুব আস্তে আস্তে প্রশ্নটা করল অনুষ্কা।

'সেরকমই তো কথা।'

'তুমি খুব বাজে। আমার মাথাটা খাচ্ছ দিনে দিনে।'

'কোথায় আর খেতে পারলাম। এতদিনে ডানাই মেলাতে পারলাম না তোমার। ছবিগুলোর ফোল্ডারটা সেভ করে নাও। আমি যে ক'দিন না থাকি সেই ক'দিন একটু কষ্ট করে একা একাই দেখো।'

'মোটেও না। একটুও দেখব না। কিছুতেই না। আমার মাথা খারাপ না কি তোমার মতো।' বলে প্রবলভাবে মাথা নাড়তে থাকল অনুষ্কা।

'সে কী! নয়, আমার মতো?...আমি তো জানতাম...'

'মার লাগাব কিন্তু এবার!'

ছ'দিন-সাতদিন-আটদিন, সত্যিই আর ভালো লাগছে না অনুষ্কার। কৃষ্ণেন্দু নেই। ওখানে পৌঁছে একবার মাত্র ফোন করেছিল, ব্যস, তারপর আর কোনও যোগাযোগ করেনি। এমন ছেলে! কজের ফাঁকে, লাঞ্চের

সময়, একা বাড়িতে মনে পড়ে ওর কথা। সঙ্গে একজন থাকা আর তার না থাকার পার্থক্যটা এত ভীষণ রকম! আচ্ছা, সত্যিই কি ডানা থাকে মানুষের? কেমন করে মেলতে হয়?...ধুৎ, যত পাগলের কথা! কিন্তু পাগলটা যে ওর মাথাটাকেও খেয়ে বসেছে। ক'দিন ধরে কাজেও মন দিতে পারছে না। কৃষ্ণেন্দু বোধহয় ঠিকই বলে, সারাদিনের মধ্যে খানিকটা অকাজ না করতে পারলে কাজটাও ঠিকঠাক হয় না। এবার ফিরুক, খুব করে ঝগড়া করতে হবে। এমনি এমনিই।

আঠাশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্কার জন্মদিন। কৃষ্ণেন্দুর কি মনে আছে সেকথা? আর দু-দিন বাকি। হয়তো ভুলেই গেছে। আজ কম্পিউটারে কাজ করতে করতে কেমন বেখেয়ালেই কৃষ্ণেন্দুর দেওয়া একটা ছবির ফোল্ডার খুলে ফেলল অনুষ্কা। একটার পর একটা ছবি। কৃষ্ণেন্দু যেমনভাবে ছবি দেখতে দেখতে বলে যায় ঘোর লাগানো ফিসফিস করে, ছবিগুলো নিজেই যেন সেভাবে বলে যাচ্ছিল নিজেদের...এই দেখো আমি সবুজ, লুকোবে? আমার নাম আকাশ, ভাসবে আমার মধ্যে দিয়ে? আমি জল, ডুববে আমার ভেতর?...নাহ্? মাথাটা সত্যি সত্যি এবার পুরোটা যাবে! ফোল্ডার বন্ধ করে দিল ও। পাগলটাকে ছাড়া আরও একটুও থাকা যাচ্ছে না, যাচ্ছে না...উহ্!

তারপর আরও অসহ্য কয়েকটা দিন পার করে সাতাশ তারিখে অফিসে এল কৃষ্ণেন্দু। ওকে দেখেই কাজে খুব মন দিল অনুষ্কা। কৃষ্ণেন্দু কাছে এসে বলল, 'এসে গেছি।'

যতটা পারা যায় উদাসীনভাবে উত্তর দিল অনুষ্কা। 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'এক দিন আগেই চলে এসেছি কিন্তু।'

'কীসের এক দিন?'

'বা রে! কাল আমার নেমন্তন্ন আছে না তোমার জন্মদিনে।'

'মনে আছে?'

'সে কী, থাকবে না!'

'কিন্তু আমি তো নেমন্তন্ন করিনি তোমায়।'

'তো কী আছে! বরং ঘটা করে বললে যেতাম কিনা সন্দেহ।'

আর অভিমান ধরে রাখতে পারল না অনুষ্কা, খিলখিল করে হেসে ফেলে বলল, 'আচ্ছা, সত্যি সত্যি আসবে না কি?'

'কেন, আপত্তি আছে?'

'বেশ দেখা যাক কেমন আস।'

'প্রচুর ছবি তুলছি। কাল দেখাব। এবারেরগুলো একেবারে অন্যরকম।'

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই অনুষ্কা বুঝতে পারল মনভর্তি আনন্দ টলটল করছে। সারারাত ধরে খেজুরের রসের মতো ফোঁটায় ফোঁটায় ভরে উঠেছে কলস। আজ ওর জন্মদিন। কৃষ্ণেন্দু আসবে বলেছে। কিন্তু সত্যি কি আসবে? এই ফ্ল্যাটটা ঠিক করে দেওয়ার পর থেকে কোনওদিনও আসেনি। অনুষ্কা দু-একদিন গোড়ার দিকে ওকে বলেওছিল আসার জন্য। উত্তর পেয়েছিল, 'যাব, যাব। ঠিক দিনে ঠিক সময়ে যাব।' আজ কি সেই দিন, সেই সময়? হয়তো এমনিই বলেছে যাব, আসলে আসবে না। তবু...। বিছানা ছেড়ে উঠে মোবাইল অন করল। তিনটে মিস্‌ড কলের মেসেজ। দাদা ফোন করেছিল। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর সৌজন্য। ভাবল একবার রিং ব্যাক করবে। তারপর মনে হল যেচে উইশ নেওয়াটা কেমন বোকাবোকা। ওর ছোটবেলায় মা পায়েস বানাত আজকে। একঝলক মনে পড়ল কথাটা। আজ অফিস অফ করবে ঠিকই করে রাখা ছিল। রান্নার মাসি আসবে একটু দেরি করে। কী কী রান্না করতে বলবে? কৃষ্ণেন্দু কী খেতে ভালোবাসে? মনে পড়ল না। আসলে খাওয়াদাওয়ার দিকে তেমন নজরই নেই ছেলেটার। খালি টো টো করতেই ভালোবাসে। ফ্রাইড রাইস আর চিকেনই যথেষ্ট। সারাদিন ধরে এঘর-ওঘর টুকটাক কাজ, রান্নার খবর নেওয়া, ঘড়ি দেখার ফাঁকে প্রতীক্ষার বুক ঢিবঢিব।...অস্থিরতা। আসবে?...সত্যি! বিকেল-সন্ধে সাতটা-

আটটা-ন'টা। নিজের ওপর রাগ হতে শুরু করল অনুষ্কার। ফালতু অফিস কামাই করে সারাটা দিন নষ্ট হল। কত কাজ পেন্ডিং রয়েছে। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ আচমকা কলিংবেল। এখন আবার কে? দরজা খুলতেই সেই হাসিমুখ।

'এখন!'

'বা রে! জন্মক্ষণ তো শুনেছিলাম রাত্রি এগারোটা পনেরো। বরং অনেক আগে এসে গেছি বলে একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য আমার।'

'অত রাত্তির অব্দি থাকবে বুঝি?'

'যদি রাখতে চাও।'

বুকের ভেতর একদম অচেনা, অন্যরকম শিরশির করে উঠল অনুষ্কার। কৃষ্ণেন্দু ঘরে ঢুকতেই বলল, 'বাহ্, সুন্দর সাজিয়েছ ঘরটা।'

'কী খাবে বলো এখন?'

'স্রেফ চা।'

'দু-মিনিট।' ডাইনিং টেবিলে ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রাখাই ছিল। কাপে ঢেলে ট্রে-তে করে নিয়ে এল। চা খেতে খেতে কৃষ্ণেন্দু কবজিতে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'আর ঘণ্টাখানেক পরেই তুমি জন্ম নেবে।'

অনুষ্কা হুঁ বলেই বলল, 'বেশ অনেকটা রোগা হয়ে গেছ। খুব অনিয়ম করে গেছ না একদিন?'

'না-নাহ্-ধুস...বাদ দাও ওসব, এবার বলো আমাকে ছাড়া কেমন কাটালে?'

'দারুণ!' ঠোঁট উলটে বলল অনুষ্কা।

'সত্যি!'

'তো মিথ্যে না কি? কেউ ডিসটার্ব করার ছিল না। স্রেফ কাজ করে গেছি।'

'আর ছবিগুলো... দেখনি?'

'ছবি...কীসের ছবি?' নিপুণ অভিনয়ের চেষ্টা করল অনুষ্কা। কিন্তু মুখের অভিব্যক্তিতে সেই অভিনয় ছিল না। ধরা পড়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু

হেসে ফেলে বলল, 'ভূতের।'

কথায় কথায় রাত, অনুষ্কা মনে মনে অবাক হচ্ছিল কৃষ্ণেন্দু সত্যি সত্যিই বাড়ি ফেরার নাম করছে না। নিশ্চয়ই সারারাত থাকবে না।...তাহলে কত রাতে ফিরবে? ফিরবে কীভাবে? সুখ মেশানো এক অচেনা ভয় ভয় অনুভূতি।

'এই, এগারোটা পাঁচ বেজে গেছে। চলো কেক রেডি করো।'

'কেক...সে কোথায় পাব!' অনুষ্কা অবাক।

'ওহ্ হো, বার করতে ভুলেই গেছি।' বলে সোফায় রাখা নিজের লেদার ব্যাগটা খুলে সুন্দর দেখতে একটা ক্যাথলিনের বাক্স অনুষ্কার হাতে দিয়ে বলল, 'ক্যান্ডেল ক'টা কিনব...মানে তোমার বয়সটা বেয়াল্লিশ বা পঁযতাল্লিশ ঠিক খেয়াল পড়ছিল না, সেজন্য একটাই কিনেছি।' বলে একটা নীল রঙের মোম বাড়িয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে জিনিস দুটো নিতে গিয়ে অনুষ্কা ঠোঁট টিপে বলল, 'সে কী, আমার এবার ঊনসত্তরে পা পড়বে ভুলে গেছ?'

দুজনেই হেসে ওঠার পর কৃষ্ণেন্দু তাড়া লাগাল 'কুইক, একটা প্লেট আর ছুরি নিয়ে এসো।' অনুষ্কা প্রায় দৌড়ে কিচেনে গিয়ে ছুরি, প্লেট নিয়ে এসে টেবিলে রেখে প্লেটের ওপর কেকটা বসাল, আনন্দে বুকের ভেতরটায় ঠিক কেমন যে করছে! কৃষ্ণেন্দু মোমবাতি জ্বালিয়ে কেকের সামনে রেখে বলল, 'এবার হাতে ছুরিটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি যখন বলত তখনই খুলবে।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই কৃষ্ণেন্দু, 'নাও এবার আঁখিপল্লব মেলে কেক কাটো।'

'তুমি এসো আমার সঙ্গে, দুজনে মিলে...'

'কিন্তু আমার যে জন্মক্ষণ নয় এখন।'

'হ্যাঁ তোমারও। আমাদের জন্ম একসঙ্গে' তীব্র আনন্দে হাতের আঙুল কাঁপছিল অনুষ্কার।

'বেশ।' দুজনে একসঙ্গে আঙুল ছুঁয়ে কেক কাটল। হাততালি দেওয়া, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ বলার কেউ ছিল না ঘরে, তবু যেন অনুষ্কা

শুনতে পেল হাজার হাজার মানুষ উল্লাসে হাততালি দিচ্ছে, খুশিতে গান গাইছে, উইশ করছে...।

কেক খেয়ে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'দাঁড়াও এবার তোমার গিফ্‌টটা দিই।'

'আরও উপহার বাকি?'

'হ্যাঁ, ব্যাগ থেকে সেলোফেন পেপারে মোড়া ছোট্ট একটা প্যাকেট অনুষ্কার হাতে দিয়ে বলল, 'দেখো।'

প্যাকেট খুলতে ছোট্ট একটা কাগজে লেখা 'ডানা মেলার অপেক্ষার দিনে তোমায়।' নাম নেই, তারিখ নেই, আর সঙ্গে একটা ব্ল্যাঙ্ক সিডি। এমন উপহার আশাই করেনি অনুষ্কা। 'এটা কী? ব্ল্যাঙ্ক সিডি?'

'দেখা যাক, তোমার কম্পিউটারটা কই?'

'আগে ডিনার করে নাও।'

'পরে হবে। আগে বলো কোথায় রয়েছে?'

বেডরুমের এক কোণে অনুষ্কার পি সি রাখা। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে ওই ঘরে ঢুকতে গিয়ে একবার গা ছমছম করে উঠল অনুষ্কার। পি সি অন করে সিডিটা ঢোকাল। কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তুমি চেয়ারে বসো আমি পাশে দাঁড়াচ্ছি।' ফোল্ডারটা খুলতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল ঘন সবুজ পাহাড়, টুকরো টুকরো ভেসে যাওয়া মেঘ, তিস্তার উচ্ছলতা, গভীর জঙ্গল, সূর্যাস্ত, পাহাড়ি মেয়ের সহজ মুখ...কাঞ্চনজঙ্ঘা...পরপর দেখে যাচ্ছিল অনুষ্কা।

'আমার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো তোমাকে দিলাম,' বলতে বলতে মাউসে রাখা অনুষ্কার হাতের ওপর আলতো করে হাত রাখল কৃষ্ণেন্দু। তিরতির করে কেঁপে উঠল অনুষ্কা। কিন্তু স্ক্রিন থেকে চোখ সরাল না। 'এই ছবিগুলো সব কালিম্পঙের। এটা ডিলো পার্ক, এটা সুইসাইড পয়েন্ট।' অনুষ্কা তাকিয়ে থাকল ছবিটার দিকে। খাদের একেবারে কিনার থেকে ওপাশের ছবি। মাঝে গভীর অতল। অসাধারণ ছবিটা। এত সুন্দর জায়গাটার এমন খারাপ নাম কেন?

'এখান থেকে এই অঞ্চলের দুটি ছেলেমেয়ে সুইসাইড করেছিল। বিয়ে করবে ঠিক করেছিল ওরা। কিন্তু জাতের ভিন্নতা ছিল বলে বিয়েতে মত ছিল না দুই বাড়িরই। পালানোর উপায়ও ছিল না। সুতরাং...'

'ইশস।' হাতের আঙুলগুলো আবার কেঁপে উঠল অনুষ্কার।

'ভাবো তো একবার সেই মুহূর্তটা, দুজনে পরস্পরের হাত চেপে ধরে যখন হু-হু করে শয়ে শয়ে ফুট নীচে নেমে যাচ্ছে।'

'তখনও কি ওরা ভাবছিল পরস্পরের কথা? ওইটুকু সময়েও?' অবশভাবে জিগ্যেস করল অনুষ্কা।

'হয়তো...জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি আমরা যখন শূন্যে ঝাঁপাব তখন নীচে নামব না। দুজনে ডানা মেলে উড়ে বেড়াব আকাশে।'

'আমার ভয় করে কৃষ্ণেন্দু,' এই প্রথম কথাটা বলল অনুষ্কা। 'যদি সব হারিয়ে ফেলি উড়তে গিয়ে...'

'কী আছে তোমার যে হারাবে? আর সত্যিই যদি মানুষ কিছু পায় তাকে হারাতে পারে না। হারাতে চাইলেও নয়। সত্যি বলো তো এই যে তোমার...'

'চু-উ-প!' কৃষ্ণেন্দুর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিল অনুষ্কা। আঙুলগুলোয় মনে হল...ঠিক কী যে মনে হল...তার আগেই নিজের দু-হাত দিয়ে পিছন থেকে অনুষ্কার দু-হাত আলতোভাবে জড়িয়ে ধরেছে কৃষ্ণেন্দু। তারপর...তারপর...

এ মাসে ডেট মিস হওয়াতে শরীরে অস্বস্তি হচ্ছিল অনুষ্কার। অনেকদিন পর এরকমটা হল। তলপেটে চাপ ব্যথা। কাজে মন বসতে চায় না। হঠাৎ কেন হল এরকম? সেই রাতের পর থেকে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে কথা বলতে জড়তা লাগে। ও কিন্তু একইরকম রয়েছে। লাঞ্চ আওয়ারে ইচ্ছে করে আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ে অনুষ্কা যাতে একসঙ্গে বসতে না হয়। কেমন একটা ঘোর সব সময় মাথার মধ্যে। মাঝেমধ্যে হঠাৎ নিজেকে অচেনা মনে হয়। ভালো লাগে না, কিচ্ছু ভাল্লাগে না, কাল এইচ ও ডি ডেকেছিলেন ওকে। সংক্ষেপে ভদ্রভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ইদানীং অনুষ্কার পারফরম্যান্স ভীষণভাবে ফল করছে। এটা তার কেরিয়ার এবং প্রমোশনের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক। মোদ্দা কথায় হয় ঠিক করে

কাজ করো নয়তো...। ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠেছিল অনুষ্কা। ও নিজেও ভালো করে জানে এইসব জায়গায় কাজটাই প্রথম এবং শেষ কথা। করো অথবা ছাড়ো। 'সরি স্যার' বলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে চোয়াল শক্ত করে নিয়েছিল ও। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বার বার নিজেকে বুঝিয়েছিল—কাজ কাজ, বাকি সব কিছু চুলোয় যাক। তার আর কোনও ইচ্ছে নেই, কোনও বন্ধু নেই, কেউ নেই, কিছু নেই, নেই-নেই নেই।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো অনুষ্কা?'

'কিছু না তো।'

'তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন ভালো করে?'

'কাজের প্রেশার।'

'শুধু কি সেজন্যই?'

'হ্যাঁ', বলে আচমকা কৃষ্ণেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল 'চাকরিটা চলে গেলে আমাকে কেউ দেখার নেই কৃষ্ণেন্দু, কেউ নেই।' কথাগুলোর ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল, মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিল কৃষ্ণেন্দু। তারপর থেকে আর ধারেকাছে আসে না। কথাগুলো বলে খুব খারাপ লেগেছিল অনুষ্কার। কিন্তু ওই পাগলকে এভাবে ছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ে বোঝানোর উপায় ছিল না। ক'দিন ধরেই পেটের ভেতর একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে সারাদিন ধরে। সকালে অফিস এসে সারাক্ষণ কাজে প্রাণপণ ডুবে যাওয়ার মাঝেমধ্যেও অস্বস্তিটা টের পায়। ভাবে খাওয়াদাওয়ার অনিয়ম। অতিরিক্ত কাজের চাপ। মানসিক অস্থিরতা...কিন্তু নিজের সাজানো যুক্তিগুলো নিজের অজান্তেই ছিঁড়ে ফেলে। রাত্রের বিছানায় শোওয়ার পর অস্বস্তিটা আরও বেড়ে যায়। ঘুম আসতে চায় না। একদিন রাত্রে কী খেয়াল হতে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দাঁড়াল অনুষ্কা। এপাশ-অপাশ ফিরে ভালো করে আয়নায় নিজের পেটটা দেখল। ঈষৎ উঁচু! চোখের ভুল? একটু উঁচু! সত্যিই! কেঁপে উঠল থরথর করে। তবে কী! কিন্তু সে রাত্রে কী ঘটেছিল কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে? তেমন কিছু কি...? চোখ বুজে মনে করবার চেষ্টা করতে থাকে আপ্রাণ। পড়ছে না...কিছুতেই

মনে পড়ছে না। কেমন যে পড়ছে না? এত অবশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সেদিন যে কিছু মনে নেই, শুধু এক সংজ্ঞাহীন অনুভূতি ছাড়া। কৃষ্ণেন্দুকে জিগ্যেস করার প্রশ্নই আসে না। ওযুধের দোকান থেকে প্রেগটেস্ট কিনে নিয়ে এসে দেখে নেগেটিভ। তাহলে? তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এর রেজাল্টও তো সবসময় সত্যি হয় না শুনেছে। আর পেটটাও যে দিনে দিনে ফুলে উঠছে। স্পষ্ট বুঝতে পারে ও। কিন্তু সত্যি যদি কিছু হয়েও থাকে তাহলেও এত দ্রুত কী করে হচ্ছে মাথায় আসে না! গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যায় সব। ডাক্তারের কাছে যেতেও লজ্জা লাগে। সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর সামনে দাঁড়াতে হবে ভাবলে লজ্জায় সিঁটিয়ে যায়। কুর্তা আর জিনসের প্যান্ট পরা ছেড়ে দিয়ে ঢিলেঢালা সালোয়ার পড়তে শুরু করে ও। অফিসে, পরিচিতরা সবাই অবাক। চোখের নীচে কালো ছোপ বাড়তে দেখে কলিগরা ওকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে রেস্ট নিতে বলে। শুধু কৃষ্ণেন্দু চুপ। কিচ্ছু বলে না, শুধু দূর থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। অনুষ্কাও চুপ। সালোয়ারের ওড়না দিয়ে দিয়ে বার বার পেটের কাছটা ঢাকা দেওয়াটা মুদ্রাদোষের মতো হয়ে ওঠে। সবসময় মনে হয় রাস্তাঘাটে, অফিসে-দোকানে সব মানুষ ওর পেটের দিকে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে। কেউ যদি একদিন সত্যিই কিছু জিগ্যেস করে বসে...কী করবে তখন? বুঝতে পারে না। অ্যাবরশন?—অস্থির হয়ে ওঠে ও। প্রচণ্ড অস্থির। সবসময় শরীর ভারী লাগে। নড়তে-চড়তে কষ্ট, মাঝেমধ্যে গা গুলোয়, বমি পায়, পেটের খাবার হড়হড় করে বাইরে বেরিয়ে আসে। স্পষ্ট বুঝতে পারে পেটের ভেতর কিছু একটা নড়াচড়া করছে। দিনে দিনে ফুলে উঠছে পেটটা। অবিশ্বাস্য দ্রুতভাবে। এরকম হয়! বিশ্বাস করতে না চাইলেও, এখন জোব্বার মতো ঢিলে সালোয়ার পড়লেও ওপর দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায় স্ফীত পেট।—না। আর নয়। বাড়ি থেকে সিক লিভের অ্যাপ্লিকেশন বসকে মেল করে দেয় ও। কৃষ্ণেন্দুকে কিছুই জানাবে না। সব পুরুষরাই কি তাহলে একইরকম? সব অনুভূতিই শেষে শুধু মাংসের খিদে? আগামী কালকেই যেতে হবে। লোকাল নয়, ইচ্ছে করে একটু দূরে নার্সিংহোম বুক করে নেয় ফোনে।

আজ সারাদিন ধরে পেটের মধ্যে অস্বস্তিটা যেন বড় বেশি। অল্প অল্প ব্যথাও হচ্ছে। সকালে রান্নার মাসি কাজ করে চলে যাওয়ার পর সারাদিন ধরে একা। ইদানীং দিনের মধ্যে দশ-বারো বার কিংবা তারও বেশি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পেটের স্ফীতির হার খেয়াল করাটা প্র্যাকটিসের মতো হয়ে গেছে। আজ আর দাঁড়াল না। কালকের মধ্যেই তো সব ধুয়েমুছে সাফ। কথাটা মনে আসতেই পরম নিশ্চিন্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও কী একটা খোঁচা দিয়ে ওঠে। কাজটা হয়ে যাওয়ার পর আর এই অফিস নয়। অন্য কোথাও ট্রাই করতে হবে। ওই ছেলেটার সামনে যেন আর না দাঁড়াতে হয় কোনওদিন। এতটুকু খিদে নেই আজ। খেলও না। ঘুমও আসছে না। চাপা ব্যথাটা বিকেলের পর থেকে একটু একটু করে বাড়ছে যেন। সন্ধের পর সামান্য কিছু খেতেই সব বমি হয়ে গেল। ব্যথাটা বাড়ছে ক্রমাগত। ঘরের সব জানলা বন্ধ করে টিউব নিভিয়ে শুধু নাইট ল্যাম্প জ্বেলে বিছানায় বালিশ আঁকড়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল। পেটের ভেতর থেকে কী যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে আজকেই। তাকে বার করে দেওয়ার আগে নিজেই কি বেরিয়ে আসতে চাইছে সে? এত দ্রুত? সর্বনাশ! তাহলে কী হবে? কিন্তু কী করে সম্ভব এত কম দিনে...? যুক্তি আর ভয় একসঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়। আবার একবার মনে করতে চেষ্টা করে, সত্যিই কি এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল সেদিন?...ওহ্...কেন যে মনে পড়ে না। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগে গুঙিয়ে ওঠে অনুষ্কা।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে যন্ত্রণা। ব্যথার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে চিৎ হয়ে শুয়ে অনুষ্কা নিজের দু-পা ভাঁজ করে ফেলে। ড্রয়িংরুমে দেয়াল ঘড়িটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে টুংটুং শব্দে কত রাত্রের জানান দিল খেয়াল নেই। 'আঁ-আঁ-আঁ' ব্যথায় প্রাণপণে বিছানা খামচে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। অসম্ভব এক অচেনা যন্ত্রণায় শরীর বেঁকিয়ে গোঙাতে থাকে ও। মুখ থেকে ফেনা বেরিয়ে আসে। 'আঁ-আঁ-

মাহ্' বুঝতে পারছিল জল ভেঙে গেছে, ভেসে যাচ্ছে বিছানা। একটু একটু করে অন্য এক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে একটা কিছু। আসছে এই পৃথিবীতে। অনুষ্কার একান্ত শরীর থেকে।...এল সে। অনাস্বাদিত অসামান্য এক ক্লান্ত আরামে দু-চোখ বুজে অনেকক্ষণ একভাবে শুয়ে রইল। তারপর একটু একটু করে দু-হাতের কনুইতে ভর দিয়ে সামান্য মাথা উঁচু করে নিজের দু-পায়ের মাঝে তাকাল...এ কী! এ কী অদ্ভুত প্রাণ জন্ম নিয়েছে? শরীরটা পাখির মতো...কী যেন সেই পাখিটা? জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বিশাল দুই ডানা মেলে। পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে উড়ে বেড়ায়। কী যেন নামটা! কিন্তু চোখদুটো মানুষের মতো অবিকল! চেনা, বড় চেনা চোখ দুটো! সদ্য জন্মানো প্রাণটা এরমধ্যেই বেশ কয়েকবার অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ডানাদুটো ঝাপটাচ্ছে ওড়ার চেষ্টায়। অল্প অল্প সাদা পালক গোটা শরীরে। সে একবার নিজের চেষ্টা থামিয়ে স্থিরভাবে অনুষ্কার দিকে তাকাল। চেনা তাকানো...হ্যাঁ চেনা, মনে পড়ল অনুষ্কার। ভয় নয়, ঠিক কীরকম একটা অনুভূতি হচ্ছিল যেন। দমকে দমকে কাঁপুনি আসছিল। বার বার নিজের ডানাদুটো মেলে উড়ে যাওয়ার নিরলস চেষ্টা করছিল সে। আর পড়ে পড়ে যাচ্ছিল। সুতোর মতো নাড়ি দাঁত দিয়ে কেটে দিল অনুষ্কা। তার পর পরম সাবধানে আলতো করে দু-হাতের মুঠোয় তুলে ধরল নিজের আত্মজকে। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে বলল। 'আমি চিনি তোকে।' তারপর আরও কথা, আরও অনেক কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল কখন...।

সকালে ঘুম ভাঙল কলিংবেলের শব্দে। ঘরের ভেতর তখনও আবছা অন্ধকার। ঘুম ভেঙেই বুঝল কলিংবেলটা অধৈর্যভাবে অনেকক্ষণ থেকে বাজছে, শরীর জোড়া ক্লান্তি। কিন্তু কী অদ্ভুত এক আনন্দ কিংবা একটা কিছু। মনে হচ্ছে মাথার ভেতর থেকে সব কিছু ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। কোনও ভার নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই তার। বেলটা বাজছে।

অনুষ্কা তাকাল তার জন্ম দেওয়া প্রাণের দিকে। সে এখন বন্ধ জানলার ধারে বসে। এক রাতেই বেশ খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে। সারা গায়ে সাদা পালক। ডানা দুটোও এখন তার বেশ বড়, ঝাপটিয়ে জানলা দিল সে। ওড়ার জন্য সে অধৈর্য। অনুস্কাকে জাগতে দেখে ঘরের এদিক থেকে ওদিক এক পাক উঠল। তারপর এসে বসল অনুষ্কার হাতের ওপর। ঠোঁট ছোঁয়াল আঙুলে। তারপর আবার উড়ে গিয়ে বসল বন্ধ জানলার শার্সির পাশে। যেন শুধু পাল্লা দুটো খুলে দেওয়ার অপেক্ষায় সে। অফুরন্ত উড়ানের আশা শরীর জুড়ে। অনুষ্কা হেসে বলল, 'দেব, একটু দাঁড়া। আমি জানি কে এসেছে আজ। তাকে একটি বার দেখিয়ে নিই তোকে।' উঠে গিয়ে দরজা খুলল, বাইরে কৃষ্ণেন্দু, অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে।

'ভেতরে এসো।'

'আমি শুধু একটা কথা বলার জন্যই এসেছি, তোমাকে বিরক্ত....'

'তুমি ভেতরে এসো।' ক্লান্ত গলায় বলল অনুষ্কা।

'কেমন আছ তুমি?' থিরথিরে গলায় জিগ্যেস করল কৃষ্ণেন্দু।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ করতে ইশারা করল অনুষ্কা। তারপর বলল, 'আমার সঙ্গে এসো এদিকে। শুধু তোমাকে একবার দেখাব বলেই এতক্ষণ তাকে আটকে রেখেছি।'

'কাকে?'

'এসো দেখবে।' বলে কৃষ্ণেন্দুর হাত ধরে নিজের বেডরুমের দিকে নিয়ে গেল ও। বন্ধ দরজা খুলে অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকল দুজনে। আঙুল তুলে জানলার দিকে দেখিয়ে বলল...'ওই দেখো...তোমার...কাল জন্ম নিয়েছে সে।'

দুজনেই চুপ। অনেকক্ষণ...শুধু অন্ধকার, নৈঃশব্দ্য। কৃষ্ণেন্দু আবছা অন্ধকারে কী দেখল জানা নেই, শুধু সেই আগের মতো ফিসফিস করে বলে উঠল—'এবার জানলাটা খুলে দাও।'

আমার সময়
মে ২০০৯
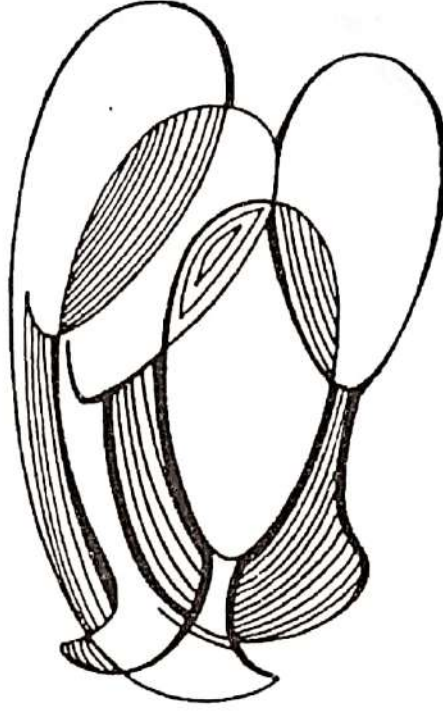
একটি দ্বীপে দু-চারজন

একটা বেডে, অন্তত আজ রাত্তিরটা আমাদের চারজনকে কাটাতেই হবে। কোনও উপায় নেই। আমরা মানে আমি, আমার বউ শিউলি, আমার ছোটবেলার বন্ধু জয়ন্ত আর ওর বউ কাজরী। আমরা যে একটামাত্র ঘর পেয়েছি তাতে একটাই খাট। যদিও যথেষ্ট বড় খাট, ছ-সাতজন লোক পাশাপাশি আরামে শুয়ে পরবে। সেখানে আমরা মাত্র চারজন। কিন্তু তবু মাত্র একটা। অস্বস্তি একটু লাগে। আমি, সঙ্গে বন্ধুর বউ, আবার বন্ধু এবং আমার বউ...। ঘরের মেঝেতে হাফ ইঞ্চি ধুলো। একটা টিনের জংধরা ছোট্ট বেডসাইড টেবিল আছে। সেও ধুলো মেখে ভূত। টেবিলে একটা উপুড় করা স্টিলের গ্লাসের ওপর গলে এই এক কর সাইজ হয়ে আসা একটা মোমবাতি বসানো। অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমটায় ঢুকতেই গা ঘুলিয়ে উঠেছিল আমার। কারণ আমিই একমাত্র দেখতে ঢুকেছিলাম এবং তারপর ওদের সবাইকে ওটা পরিষ্কার না করানো পর্যন্ত ঢুকতে বারণ করেছি। নাকের ডগা পর্যন্ত ঝুল, অসংখ্য ছোট-বড়

মাকড়সা, আরশোলা, পায়খানার প্যানে অন্য কারও রেখে যাওয়া কবেকার বস্তু ভাসছে। তাকে জল ঢেলে ডোবানোর সাহস আমাদের কারও নেই। অফিসরুমে অনেকক্ষণ আগে খবর দিয়েছি ক্লিনারকে ফিনাইল সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে সে আসেনি। তবে অফিস থেকে আমাদের চারটে কাচা বালিশের ওয়াড়, একটা মশারি এবং সাদা বিছানার চাদর দিয়েছে। চাদরটা বিছানায় পেতে আমরা এখন চারজনেই খাটের মাঝখানে বাবু হয়ে গুম খেয়ে বসে আছি। কারও মুখে কথা নেই বেশ কিছুক্ষণ হল। আমরা প্রত্যেকেই অতিরিক্ত ক্লান্ত এবং অল্প বেশি বিরক্ত। গুমোট গরমে ঘর ভর্তি। তার মধ্যে শালা কারেন্ট নেই, ধুলো-ঝুলে বিধ্বস্ত ফ্যানটা গলায় দড়ি দিয়ে সিলিং থেকে ঝুলছে। আমাদের চারজনের মধ্যে শিউলির মুখটাই সবচেয়ে বেশি থমথমে। গরমে, ক্লান্তিতে এবং সম্ভবত অপ্রস্তুত বিব্রত হওয়ার জন্য ওর ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

জয়ন্তই গলা খাঁকরে শুরু করল, 'থাকগে যা হওয়ার হয়ে গেছে। এমন তো হতেই পারে। ভেবে লাভ নেই। আমাদের কারও দোষ তো নেই এর জন্য।' শিউলি মুখ তুলল। সত্যিই হয়তো দোষ নেই কারও। কিন্তু হিসেবমতো কিংবা বেহিসাবে যেটুকু দোষ তো শিউলির ঘাড়েই চাপে।

ব্যাপারটা হল পনেরোই আগস্ট এবছর শুক্রবার পড়েছিল। সুতরাং শুক্র-শনি-রবি তিনদিন কাছাকাছি কোথাও খুচরো ঘুরে আসার কথা ভাবছিলাম। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে গত পরশু জয়ন্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় এই ছুটির তিনদিন কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবছি জানাতে ও বলল কাছাকাছি যাওয়ার প্ল্যান করছে। ভিড়ভাট্টা আমাদের কারও পছন্দ নয়। ও বলল একটা জায়গায় যাওয়া যেতে পারে, সারাবছর ভিড় প্রায় থাকেই না।

'কোথায়?'

'সাগরদ্বীপ।'

'মানে গঙ্গাসাগর?'

'হ্যাঁ, শুনেছি সি বিচটা না কি দারুণ আর ফাঁকা।'

'ভালো আইডিয়া।'

'একসঙ্গে যাবি তালে?'

'চল, আমার অসুবিধা নেই।'

'কিন্তু থাকার ব্যবস্থা?'

'তুই খোঁজ নে আজ। আমিও দেখছি।'

'ওকে।'

খুঁজতে হয়নি। অফিসে এসে শিউলিকে ফোনে ব্যাপারটা জানাতেই ও বেশ খুশি। সঙ্গে এও জানাল ঘর খোঁজার দরকার নেই। ওর কাকিমা তো জনসেবা সংঘের মেম্বার। গঙ্গাসাগরে সেবা সংঘের বিশাল মন্দির আছে। মেম্বার কারও চিঠি নিয়ে গেলে ভালো ঘর পাওয়া যায় ফ্রি-তে। খুব ভালো কথা। শিউলি সেদিনই তার কাকিমার কাছ থেকে চিঠি করিয়ে নিয়েছিল। কাকিমা সংঘে ফোন করেও জানিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের যাওয়ার কথা। চিঠিতে পরিষ্কার লেখা ছিল 'ভালো দেখে দুটো ঘর দেবেন।' আজ কোন ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেড থেকে নামখানার বাসে উঠে হারউড পয়েন্ট। সেখান থেকে বিশাল লঞ্চে করে সীমাহীন গঙ্গা পার করে সাগরদ্বীপ। তারপর ট্রেকারে আবার তিরিশ কিলোমিটার উজিয়ে বিকেল তিনটে নাগাদ যখন আশ্রমের সামনে পৌঁছোলাম, দেখি আশ্রমের অফিস ঘরের সামনে শয়ে শয়ে লোকের ভিড়! এ আবার কী! একমাত্র সাগরমেলার টাইম ছাড়া এমন ভিড় তো এখানে এসময় হওয়ার কথা নয়! তাহলে? কারণটা জানা গেল। কাল রাখিপূর্ণিমা। এই দিনটাতেও পূণ্যস্নানের জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসে প্রতি বছর। অধিকাংশই অবাঙালি। তার মধ্যে রাজস্থানিদের সংখ্যা দেখলাম বেশি। বিশাল চেহারার মহারাজজি চিঠি পড়ে নির্বিকার গলায় বললেন, 'একটার বেশি ঘর দেওয়া যাবে না।'

'সে কী! আমরা চারজন যে!'

আমাদের সবার দিকে একঝলক দেখে নিয়ে বললেন, 'একদিন কষ্ট করুন। বড় দেখে ঘর দিয়ে দিচ্ছি, সবাইকে তো দেখতে হবে। শুধু আপনাদেরই দেখব বাকিরা রাস্তায় পড়ে থাকবে তা তো হতে পারে না, কী-ই?'

এরপর আর কী-ই বা বলা যায়! নাম সই করে ঘরের চাবি-জিনিসপত্র নেওয়ার সময় জয়ন্ত বলল, 'এই বেলা এখন আর উপায় নেই, চল ঢুকে তো পড়ি আপাতত। বিকেলে না হয় অন্য কোথাও খোঁজা যাবে।'

আশ্রম চত্বরটা বিশাল বড়। লন ধরে ঘরের দিকে হাঁটছিলাম। আমি আর জয়ন্ত এগিয়ে, ওরা দুজন একটু পিছনে, এর মধ্যেই কাজরী আর শিউলির মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দেখি। শিউলি মেশার ব্যাপারে ভীষণ চুজি। আমি ভাবিনি কাজরীর সঙ্গে এত দ্রুত মিশ খেয়ে যাবে। আমি পিছিয়ে এসে আলতো কামড় লাগালাম শিউলিকে, 'তোমার কাকিমার চিঠির তেমন জোর নেই।' শিউলি কিছু বলার আগেই কাজরীর উত্তর। 'ওকে ওরকম বোলো না শৈবালদা। শিউলির কাকিমারই বা কী দোষ? এখন এরকম হবে কে জানত বলো?' আমি আর কী বলব ভেবে না পেয়ে একটু ক্যাবলার মতো হেসে আবার এগিয়ে গেলাম। বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে তো আর তর্ক করা যায় না।

ক্লিনার এসে জলে ঢেলে দিয়ে গেছে শুধু প্যানে, আর কিছু করেনি। নোংরা বাথরুমটায় কোনওমতে সিঁটিয়ে চান করে সংঘের উলটোদিকের ছিটেবেড়ার হোটেলটায় দুটো ভাত মুখে দিয়ে আবার এসে ঘরটায় বসলাম চারজনে। প্রচণ্ড গরম লাগছে, ঘরে ফ্যান আছে, কিন্তু গোটা সাগরদ্বীপে কোনও ইলেকট্রিসিটি নেই। শুধু সন্ধে ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জেনারেটারের আলো জ্বলে। টিমটিমে বাল্ব এ খবরটাই জেনেছি এখানে আসার পর। একতলার একদম কোণের একটা ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছে। ঘরের মুখোমুখি সংঘের গোয়াল। গোবরের গন্ধ আর অস্ট্রেলিয়ান গোরুর বিটকেল ডাকে পিলে চমকে উঠছে। শালা, এমন একটা ঘর দিল যে ভালোমতো হাওয়া পর্যন্ত ঢোকে না।

শিউলি বলল, 'এখানে বসে থাকার থেকে বরং চলো সমুদ্রের ধারে যাই।' কাজরী বলল, 'দাঁড়া না একটু পরে যাব, কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে নিই।' বাবাহ্ ওদের মধ্যে এই ফাঁকে তুই-তোকারি সম্পর্ক হয়ে গেছে কখন! অবাক লাগল আমার।

জয়ন্ত শান্ত হেসে বলল, 'ঘরটায় যা গরম, মনে হয় সারারাত্তির সমুদ্রের ধারেই কাটাতে হবে।'

'তাহলে তুই বরং গানই গা কাজরী।' শিউলি হাসল।

'গান! এই গরমে!'

'কেন রবিঠাকুর গরমের গান লেখেননি?' আমি হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ লিখেছেন, তবে সে গান গোয়ালের সামনে বসে গাইতে বারণ করে গেছেন।' কাজরীর চটপট উত্তর। হেসে উঠলাম সবাই। কথা বলতে বলতে আমি বেখেয়ালেই তাকিয়েছিলাম কাজরীর শীর্ণ দুই রঙা হাতদুটোর দিকে। আসলে ওর শুধু মুখটুকু বাদ দিয়ে গোটা শরীরে ছোপ ছোপ শ্বেতি। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ ওর এই রোগটা ধরা পড়ে। প্রচুর ট্রিটমেন্ট করিয়েছিল ওর বাবা, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। যার জন্য ও সবসময় ফুলস্লিভ সালোয়ার পরে। এখন হাফ হাতা নাইটি পরে রয়েছে বলে ওর সাদা-কালো হাতদুটো কটকট করে চোখে লাগল আমার। শিরশির করে উঠল গা। হঠাৎ খেয়াল হতে চোখ তুলতে দেখি জয়ন্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি হল, তড়তড় করে বলে ফেললাম, 'কখন বেরোবি রে? আর টিকতে পারছি না।'

কাজরী বলল, 'আমি একটু শুই, পিঠে ব্যথা করছে।'

'হ্যাঁ শোও না', বলে একটা বালিশ টেনে খাটের ওই কোণে রেখে বলল জয়ন্ত। কাজরী খাটের এই প্রান্ত থেকে হামা টানতে টানতে ওপ্রান্তে গিয়ে ঝপ করে শুয়ে পড়ল। আমিও বারমুডা পরা অবস্থায় পায়ে পা তুলে শুয়ে পড়লাম। অন্য মেয়ের সামনে আমার রোমশ ঠ্যাং দুটো উদোম রাখতে একটুও লজ্জা করছে না। সেটা অবশ্য আমার নির্লজ্জতা নয়

কাজরীর অক্ষমতা। ওই শুকনো মড়াকাঠ ফিগার আর স্কিন ডিজিজ— সত্যি কথা বলতে একটু গা শিরশিরানি আর মার্সি ছাড়া অন্য কোনও ফিলিংসই কাজ করছিল না আমার। শিউলির রি-অ্যাকশনটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ও নিজে এত ফিগার কনসাস। পেডি থেকে ম্যানি টোটাল কিওর করা বডি, সপ্তাহে সাত দিনই কিছু না কিছু গায়ে মাথায় ঘষে চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। ও কী করে কাজরীর সঙ্গে এত সহজে মিশছে শালা কিছুতেই ঘটে ঢুকছে না আমার। মহিলা ভাগ্য চিরকালই আমার খুব খারাপ। এতদিন ধরে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছি আজ পর্যন্ত কোনওদিন মিনিবাসে আমার পাশে কোনও সুন্দরী মহিলা বসেনি। আমি দেখতে খারাপ নয়, বেঁটে না, দাঁত উঁচু না, নাকের লোম বেরিয়ে থাকে না, চাকরিটাও সরকারি। তবে কেউ কোনওদিন প্রেমে পড়েনি। শিউলির সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল মোটামুটি সম্বন্ধ করেই। শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়ি আমার। ওর বড়মামা আর আমার বাবা অফিস কলিগ ছিল। জয়ন্ত, কাজরী আর আমি অবশ্য একই এলাকার।

বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াতে না গড়াতেই বিকেলে নেমে গেল। কাজরী বলল, 'দেখেছ তোমরা, এই বিল্ডিংটার পিছনে সুন্দর একটা শানবাঁধানো পুকুর আছে।'

'তাই নাকি! বাহ্ দেখব তো'! জয়ন্ত বলল।

'তো চলো না, এখনি যাই, আর কতক্ষণ ঘরে বসে থাকব।' শিউলি বলল।

'বেশ ওঠ তালে', আমি উঠে পড়লাম।

'তোমরা দুজন বাইরে যাও, আমরা একটু চেঞ্জ করব।' শিউলি বলল আমাকে। আমি সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে জয়ন্তর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল কাজরী।

'চল পুকুরটা দেখে আসি।'

জয়ন্ত বলল, 'চল।'

বিল্ডিংটার ঠিক পিছনেই। বেশ সুন্দর। টলটলে পরিষ্কার জল, ঘাটের

দু-পাশে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো উঁচু বসার জায়গা দু-দিকে।

'চল বসি।'

বসলাম আমরা। আমি বসেই সারাদিন ধরে জিভের ডগায় কুটকুট করতে থাকা কথাটা এবার করে ফেললাম। যতটা সম্ভব ক্যাজুয়ালি জিগ্যেস করলাম জয়ন্তকে, 'হ্যাঁ রে, কাজরী হঠাৎ এতটা রোগা হয়ে গেল কী করে?'

জয়ন্ত ওর স্বভাবমতোই শান্তভাবে উত্তর দিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি জানিস, সব ডাক্তারই বলে সব ঠিক আছে। দুজনে আনন্দে থাকুন। কিন্তু তবু এত ওয়েট লস করছে কেন, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। অথচ দেখ, বাকি সবকিছুই তো নর্মাল।'

মনে মনে ভাবলাম, কোথায় নর্মাল?

'ওই বিয়ের পর থেকে শুধু যা একটু পেটের প্রবলেম শুরু হয়েছে। তার জন্য তো খুব সাবধানে রাখি। বাইরের কোনও ভুলভাল খাবার খেতে দিই না। বাড়িতেও একেবারে নামমাত্র তেল-মশলায় রান্না হয়। তবু কেন যে...'

'তোরা সবাই, মানে তুই-কাকিমাও ওই তেল-ঝাল ছাড়াই খাস?'

'হ্যাঁ, নইলে ওর জন্য আলাদা করে রান্না হলে খারাপ লাগে।'

'তা ঠিক, ভালোই করিস।...একটা কথা জিগ্যেস করব তোকে? কিছু মনে করবি না?'

'না, না, বল না।' আমার দিকে সোজা তাকাল জয়ন্ত।

'না মানে তেমন কিছু নয়...ইয়ে...মানে ওর অন্য কোনও ডিপ্রেশন নেই তো?'

'দেখ, আচমকা চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, তার ওপর স্কিনের ব্যাপারটা তো আছেই। লোকের মুখ আর কত আটকাব বল। সারাদিনই তো কারও না কারও প্রশ্ন, সহানুভূতি আর কৌতূহলের মুখে পড়ে থাকে। আমি সময় পেলেই বোঝাই, তোমার মনখারাপের কোনও ব্যাপারই নেই। লোকে যে যা বলুক, আমি তো জানি তুমি একইরকম আছ। আমার

মা-র কাছেও...' হুড়মুড় করে কথাগুলো বলে যেতে যেতে হিক্কা তুলল জয়ন্ত। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। অপ্রয়োজনীয় শুকনো চোখ।

আমি জয়ন্তর হাতে আলতো হাত রেখে বললাম, 'বাদ দে সব। তুই নিজে সুখী তো? ব্যস তালেই যথেষ্ট।'

'ঠিক জানি না রে' ফ্যাসফ্যাসে গলায় কথাটা বলে ফেলেই জয়ন্ত বলল, 'তোদের দুজনকে দেখলে ভালো লাগে। দুটোতে রয়েছিস বেশ!'

আমি মুখে কিছু বললাম না, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে থুতু ফেলার মতো করে একটু হাসি বার করলাম আমি। 'হ্যাঁ চলে যাচ্ছে আর কি।'

'তোদের তো প্রায় চার বছর হয়ে গেল না?'

'হ্যাঁ ওইরকম।' যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি আমি। নিজের প্রসঙ্গ ভ্যাজাতে ভালো লাগে না। যত পারি অ্যাভয়েড করি।

'তো এবার কিছু কর। আর ওয়েট করছিস কেন? কাকা-টাকা হই।'

'হবে-হবে।'

'ফালতু আর দেরি করিস না। এরপর প্রবলেম এসে যাবে।'

'দেখি', বলে আমি হাসলাম। পুকুরের জলে আমার কালো শরীরটা কাঁপছে।

'চল ওঠা যাক', বলেই উঠে পড়লাম আমি।

একটা ভ্যানরিকশায় চেপে চারজনে পুরো এলাকাটা চষে ফেললাম। নাহ্ কোথাও কোনও ঘর খালি নেই। কাল পর্যন্ত সব বুক্‌ড। মাথায় হাত আমাদের। দু-দিন এখানে কাটানোর প্ল্যান ছিল। সব চৌপাট। আজ রাত্তিরটা ওই ঘরটায় কোনওমতে কাটিয়ে কাল সক্কালেই কাট মারতে হবে। আমিই মনে মনে একটু বেশি বিরক্ত হয়ে পড়ছি। জয়ন্ত জানে না, বিয়ের পর আমি আর শিউলি দুজনের কেউই ওয়েট করতে চাইনি। ইস্যু চেয়েছিলাম, কিন্তু শালা এমন কপাল, রাতের পর রাত হাজার ঠোকাঠুকি করেও আগুন আর জ্বলে না দেখে গাইনির কাছে হত্যে দিয়ে

পড়লাম। পরীক্ষায় শিউলি পাশ করে গেল, মাতৃত্বে কোনও অসুবিধা নেই। সব ঠিক আছে, তাহলে? তাহলে আমি শৈবাল চ্যাটার্জি, আমার স্পার্মে কোনও প্রাণ নেই। কেসটা জানার পর শিউলি এমন অদ্ভুতভাবে আমাকে অ্যাভয়েড করতে শুরু করল। অথচ দুজনের মিলতে তো কোনও প্রবলেম ছিল না। আমি প্রাণ সৃষ্টি হয়তো না করতে পারি কিন্তু প্রাণের খেলায় মাততে পারি পুরোপুরি। কিন্তু কে জানে শিউলির ওসব ফালতু মনে হত। একবার আমি কাছে যেতেই বলেই ফেলেছিল, 'আর কী হবে এসব নাটকে?'

'নাটক বলছে কেন? সন্তানের জন্ম দেওয়াই কি শেষ কথা, শরীরের নিজের কোনও চাওয়া নেই? আমি কি শালা মানুষ না? কী মনে হয় তোমার?' সেদিন আর কোনও উত্তর দেয়নি শিউলি। নিজেকে দিয়েছিল। আমার খিদেটা মিটতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম মোদ্দা কথায় শিউলি নিজের শরীরটা ভিক্ষে দিয়েছে আমায়। নিজেকে একটা ঘেয়ো কুকুর মনে হয়েছিল সেদিন। তারপর থেকে আমিও আর পারতপক্ষে ঘেঁষতাম না। ওই নামেই পাশাপাশি থাকা। কোনও বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজনের মধ্যে কারও বাচ্চা হচ্ছে না শুনলে হেভি আরাম লাগে আমার। কোনও বন্ধুর বিয়ের পর বছরখানেক পার করলেই আমি রিপিটেডলি তাকে জিগ্যেস করতে থাকি ইস্যু কেন নিচ্ছে না, কোনও প্রবলেম আছে কি? এমন প্রশ্নের জন্য বন্ধুদের কাছ থেকে দু-একবার কড়া জবাবও শুনেছি কিন্তু আমি আটকাতে পারি না নিজেকে, প্রশ্নটাকে। এই যে জয়ন্তকে এরমধ্যেই আমার বার দুয়েক জিগ্যেস করা হয়ে গেছে ছেলেমেয়ে কবে হবে? জয়ন্ত বেশ মনমরা ভাবেই উত্তর দিয়েছে, 'এখন তো একেবারেই সম্ভব নয়। ওর শরীরের যা অবস্থা। এত ওয়েট কম...দেখি একটু ঠিক হোক ও...।' আমি শুনেছি, হ্যাঁ, আরাম হয়েছে শুনে।

ঘর খুঁজতে খুঁজতে রাত্রি হয়ে গেল। ভ্যানওয়ালাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যেতে বলায় সে বলল রাত্তিরে যাবেন না। খুব অন্ধকার। চুরি-ছিনতাইও হয়। সেই হোটেলে নেমে খেয়েদেখে আশ্রমে ঢুকলাম। মন্দিরের

চাতালে-সিঁড়িতে অনেক মানুষ বসে রয়েছে। আকাশে ঝকঝকে চতুর্দশীর চাঁদ। আলোয় উপচে পড়ছে চারদিক। শিউলি বলল, 'ঘরে ঢুকে কী হবে, এখন চাঁদের আলো! চলো পুকুরটার ধারে যাই।'

কাজরী বলল, 'উঁহু, তার চেয়ে বরং মন্দিরের সিঁড়িটায় বসা যাক।'

'কেন, পুকুর দেখব।' শিউলির বায়না।

জয়ন্ত বলল, 'আচ্ছা, বেশ বেশ, তুমি এক কাজ করো, শৈবালের সঙ্গে পুকুরধারে যাও, আমি বাচ্চাটাকে একটু মন্দিরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।'

'কে বাচ্চা? আমি!' ঠোঁট ফোলাল কাজরী।

আমি আর শিউলি হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের সামনে এসে বসলাম। স্থির জলে চাঁদ এসে চুপ করে বসে আছে। মাছেদের চলাফেরায় কেঁপে উঠছে কখনও।

'খুব শান্ত, না, জায়গাটা?' আমি বললাম।

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর শিউলির।

'তবে বেটাইমে চলে এসেছি।'

'সে কী, এত সুন্দর রাত্তির পেয়েও...'

'না, না, জ্যোৎস্নার কথা বলছি না। আমি বলছি ঘরটার কথা, ভাবো তো বেড়াতে এসেও...'

'সে একটা রাত্তির সবাইকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কী করা যাবে এখন।'

'সেকথা বলছি না। বলছি যা গরম ঘরটায়। থাকব কী করে সারারাত, কিন্তু বাইরে কত ঠান্ডা হাওয়া দেখো।'

'সে না হয় আজকে বাইরেই কাটিয়ে দেব সবাই।'

আমি আর হুঁ হাঁ কিছু করলাম না। কিছুক্ষণ নিজে নিজের মনে কথা বলে চুপ থাকার পর বললাম, 'কাজরী কি রোগা হয়ে গেছে না? দেখলে এত কষ্ট লাগে। তোমার সঙ্গে তো দেখছি ভালো মিশে গেছে।'

'হুঁ। তুমি আবার এই নিয়ে কিছু বলনি তো?'

'ধ্যাস তাই আবার কেউ বলে। বেচারা জয়ন্তটার জন্য খারাপ লাগে।'

'ভীষণ ভালো ছেলে জয়ন্তদা। এখনকার দিনে সত্যিই রেয়ার।'

কথাটা হয়তো সত্যি। জয়ন্ত যখন কাজরীকে পছন্দ করে বিয়ে করে ঠিক করে তখন কাজরীর শরীরে রোগটা ভালোমতোই ধরে গেছে। জয়ন্ত হুগলির একটা সরকারি স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। সত্যি কথা বলতে ওকে দেখতে মোটেও ভালো নয়। ওপরের পাটির সব ক'টা দাঁত মাড়ি সমেত ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে থাকে সবসময়। পাতলা চুল, কুঁজো, কিন্তু দেখতে যেমনই হোক সব জেনেশুনে একটা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া মুখের কথা নয়। কাজরীও যখন বিয়ে করে জয়ন্তকে তখন ও রবীন্দ্রসংগীতে বেশ নাম করে ফেলেছে। সম্ভাবনাময় শিল্পী। এদিক-ওদিক থেকে প্রোগ্রামের ডাকও আসে। কিন্তু রোগটা চেপে বসবার পর দুম করে গানটা পুরোপুরি ছেড়ে দিল। জয়ন্ত যে কাজরীকে ভালোবাসত আমরা বন্ধুরা সবাই জানতাম। কিন্তু ইনট্রোভার্ট আর দেখতে একটু খারাপ বলে কোনওদিই সাহস করেনি কাজরীকে সেকথা জানাতে। কাজরীর গানের ছিল ও অন্ধ ভক্ত। যেখানে ওর প্রোগ্রাম সেখানেই জয়ন্ত হাজির হয়ে যেত। আমরা জয়ন্তকে বারবার বলতাম কাজরীকে জানাতে। ও বলত, 'ধুস, পাত্তাই দেবে না আমায়।' কিন্তু জয়ন্ত শেষপর্যন্ত যখন জানিয়েছিল তখন কাজরীর আর পাত্তা না দিয়ে উপায় ছিল না। গোটা গায়ে একটা দৃষ্টিকটু রোগ নিয়ে ডিপ্রেশনের শেষ কোনায় ঠেকে যাওয়া কাজরী রাজি হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তকে বিয়ে করতে। অথচ সবাই জানে কাজরী পুরোপুরি সুস্থ থাকতে কোনওদিন ফিরে তাকায়ওনি জয়ন্তর দিকে।

আমার শুধু দুটো জিনিস জানতে খুব ইচ্ছে করে, বিছানায় কাজরীর সাদা-কালো ছোপ শরীরটা দেখে জয়ন্তর কী মনে হয়? আর কি ইচ্ছে আসে প্রেমের? জয়ন্ত কি পস্তায় মনে মনে? জানি দুটো প্রশ্নই করা আর উত্তর দেওয়া কঠিন, অন্যায়।

'ওরা দুজনে বেশ ভালো আছে, না?' পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে

অন্যমনস্কের মতো বলল শিউলি।

'হয়তো আছে।'

'হয়তো কেন বলছ, দেখে বোঝো না', শিউলির গলায় ঝাঁঝ।

'দেখে কি সব বোঝা যায়?'

'দেখতে চাইলেই বোঝা যায়। তোমার তো সব কিছুতেই খুঁত খোঁজা স্বভাব।'

'কী মুশকিল, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?' বিরক্তি লাগল আমার।

'কেন বলব না।'

'না বলবে না।' মাথা গরম হয়ে গেল আমার। 'আমাদের তো বাইরে থেকে সবাই দেখে ভাবে খুব ভালো আছি দুজনে।'

'তার জন্য কি আমি দায়ী?' বলেই উঠে চলে গেল শিউলি। আমি চুপ করে বসে রইলাম।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত একটা খাটেই চারজনকে শুতে হল রাত্রে। গুমোট গরম, অথচ আশ্চর্যভাবে শোওয়ার একটু পরেই কাজরী ফুরফুর নাকে নাক ডাকতে শুরু করল। আমি আর জয়ন্ত শুয়ে আস্তে আস্তে গল্প করছিলাম, একটু পরে দুজনেই থেমে গেলাম। শিউলি তো সন্ধের পর থেকেই চুপ। আমার পাশে শুয়ে। আমি জানি ও ঘুমোয়নি। অসহ্য রাত সরতে সরতে শেষ কোণে ঠেকল যখন আমি ঘর ছেড়ে বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। অনেক দূর থেকে খুব হালকা সমুদ্রের শব্দ ভেসে আসছে। পৃথিবীর গায়ে মিহি ওড়না জড়ানো। অদ্ভুত চারদিক। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। জয়ন্ত কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি।

'খুব গরম ঘরটায়, একটু ঘুম হল না।'

'হুঁ।'

'কাজরীর খুব শখ সানরাইজ দেখবে। ওটা দেখেই সকালে কলকাতার বাস ধরে নেব, কী বলিস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ', সংক্ষেপে উত্তর দিলাম আমি। তারপর বললাম, 'রেস্ট হল না একটুও, শুধুই ছোটাছুটি।'

'তোর হয়তো হয়নি। আমার কিন্তু রেস্ট হল আজ', বলে ফিক করে হাসল জয়ন্ত। শেষরাতের চাঁদের আলোয় জয়ন্তর উঁচু এবড়ো-খেবড়ো দাঁতগুলো অতিরিক্ত অদ্ভুতভাবে জেগে উঠল একবার।

'সে কী রে, রেস্ট হল মানে?' জিগ্যেস করে আমি দায়সারা হাসলাম।

'এই যে আজকে সবাই একসঙ্গে শুলাম বলে আমার একদিন হলিডে গেল। নইলে রোজ রাত্রে আমাকে দেবী পুজো করতেই হয়।'

'বলিস কী! রোজ!'

'হ্যাঁ, আর বলিস না। একদিন বাদ গেলেই অদ্ভুত টেনশনে পড়ে যায় ও।'

'কেন?'

'জানি না। একেকদিন যদি খুব টায়ার্ড থাকি, ইচ্ছে করে না। ঘুমিয়ে পড়ি। ব্যস ওর মুখ ভার হয়ে যায়। পরদিন সকাল থেকে প্রায় কথা বন্ধ। শুধু এক ডায়ালগ, আমি নাকি ওকে আর ভালোবাসি না। অ্যাভয়েড করি...কী জ্বালা বল তো?'

আমি শুনলাম, শুনে আমার দাঁত বের হল। চাঁদের আলোয় সেই দাঁত কেমন দেখতে জয়ন্ত জানল। বললাম, 'ভালোই তো, এই বয়সে রেস্ট কী নিবি, চালিয়ে যা।' বলেই আমি প্রসঙ্গ পালটালাম। 'তবে কাজরী গান করাটা একেবারে ছেড়ে দিল কেন? এত সুন্দর গলা ছিল। কেরিয়ারটাও তৈরি হচ্ছিল...'

'কী বলব বল, আমি তো কম বোঝাইনি। বিয়ের পর থেকে তো এক দিনের জন্যও রেওয়াজে বসাতে পারিনি। বলবে ধুস কী হবে ওসব করে, সব ফালতু, এত খারাপ লাগে...হয়তো আমার জন্যই না কি...' আবার দুজনে চুপ।

'ভোর হচ্ছে বুঝলি জয়ন্ত, তবে আকাশটা দেখেছিস? সূর্য উঠবে বলে

মনে হয় না।' জয়ন্ত উত্তর না দিয়ে ঠোঁট ওলটাল। ওর মুখটাও আকাশটার মতোই গুমোট হয়ে গেছে। 'কাজরীকে ডাক জয়ন্ত, সানরাইজ দেখবে বলেছিল, চল বেরোনো যাক।'

'উঁ...হ্যাঁ যাই।' ঘরের দিকে যাচ্ছিল ও। আমি ডাকলাম 'শোন।'

'কী?' আমার দিকে ফিরে তাকাল ও। আমি ওর হাত ধরে বললাম 'মুড অফ করে দিলাম?'

'না, না কিছু না, বাদ দে ওসব।'

'সরি।'

'হেরে যাচ্ছি শৈবাল, মনে হয় হেরে যাচ্ছি।' আমার হাতের আঙুলগুলো প্রচণ্ড শক্ত করে জড়িয়ে ধরল জয়ন্ত...'এত কঠিন হবে বুঝিনি, এত কঠিন'! হাত ছেড়ে দিয়ে ও চলে গেল ঘরের ভেতর। আমি একা গেটের দিকে হাঁটতে থাকলাম। ওরা ঠিক ধরে নেবে আমাকে। বিচ্ছিরি ভোর। আলো নেই, হাওয়া নেই।

আশ্রম থেকে প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে পৌঁছোলাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ পার করে হলুদ বালির সমুদ্রতীর। একেবারে অন্যরকম। আর এত সুন্দর সি বিচ আমি কোথাও আগে দেখেছি মনে পড়ে না। হু-হু ফাঁকা, আবছা আলোর ঘষা ঘষা মেঘলা আকাশ, হাওয়া দিচ্ছে, ঢেউ ছুটে এসে পড়ছে নির্জন বালিতে বার বার, ছোট্ট একটা ঘর থেকে আচমকা এমন এক অনন্তের সামনে এসে পড়ায় মনটা কেমন যেন হয়ে উঠল। কাজরী বলল 'হাঁফিয়ে গেছি, একটু বসবে তোমরা?' জয়ন্ত অদূরে একটি বালির টিবি দেখিয়ে বলল, 'চলো ওখানে গিয়ে বসি।' এদিকটায় চারদিকে ইতস্তত ফণীমনসার ঝোপ, অন্য চেনা-অচেনা ছোট ছোট গাছও আছে। টিবিটার একটু পিছনেই টলটলে ছোট একটা ঝিল।

আজ সকালে আমরা চারজনেই বড় চুপ। তিনজনে টিবিটার ওপর

বসলাম। জয়ন্ত বসল না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। জলের শব্দ, হাওয়া আমাদের শরীরে মিশছে। আকাশের কালো মেঘ জমছে সমুদ্রে।

'বৃষ্টি হবে বোধহয়,' আমি বললাম, 'কেমন মেঘ জমছে দেখছিস?'

'কী জানি,' অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিল জয়ন্ত।

'কাজরী আমার একটা কথা রাখবি? স্রেফ আজকের জন্য' শিউলি হঠাৎ বলল।

'কী বল?'

'শুধু আজ এই ভোরবেলাটার জন্য একটা গান গাইবি?'

চুপ থাকল কাজরী।

'আমাদের জন্য নয়, তোর জন্যও নয়। ধর না, এই সমুদ্রটার জন্য, এই মেঘটার জন্য...'

'কী হবে গেয়ে?'

'কিছুই হবে না, কিছুই হবে না হয়তো। কিন্তু তবু যদি তোর কোনওদিন মনে হয় ইশ ওই সময়টায় কেন একটু গান গাইনি।'

আমি তাকালাম মেয়েদুটোর দিকে, ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে কী যেন পড়ছে। জয়ন্তও একবার তাকাল ওদের দিকে। তারপর আবার অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

কাজরী খুব নীচু গলায় বলল, 'হাঁফিয়ে পড়ব। অভ্যাস নেই।'

'সেখানেই থেমে যাবি।'

'আচ্ছা...'

কাজরীর 'আচ্ছা' শব্দটায় জয়ন্ত মুখ ফেরাল না এদিকে। শুধু ঢিবিতে বসল সমুদ্রের দিকে চোখ রেখেই।

'কী গান শুনবি বল?'

'তোর এক্ষুনি যা মনে আসছে।'

'বেশ, পিঠ সোজা করে বসল কাজরী, দু-চোখ বন্ধ করল। আর ঠিক তক্ষুনি বৃষ্টির একটা ফোঁটা আকাশ থেকে নেমে পড়ল। কাজরী

আচমকা শুরু করল 'তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে।'

ছাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতর। আমি দেখলাম শিউলিও চোখ বন্ধ করল। '...কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে...' আরও দু-এক ফোঁটা। জয়ন্ত স্থির হয়ে বসে। মৃত নারকেল গাছের মতো। কাজরী গাইছে, এতদিন পর, এতটা দিন পর গানে মিশে যাচ্ছে ও। 'তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন আমার হৃদয় পাগল হেন...' আচমকা আকাশ ফেটে বৃষ্টি এল, কী তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ফোঁটা; মেঘ বিদ্যুৎ সমুদ্রের গর্জন...কাজরীকে কেউ বললাম না 'থামো'। উঠে দাঁড়াতেও পারলাম না, আবদ্ধ হয়ে গেছে কেমন গোটা শরীর। কাজরী গেয়েই যাচ্ছে বারবার ঘুরে ফিরে। বজ্রে-বৃষ্টিতে ওর গান শুনতে পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। বৃষ্টির ধোঁয়ায় আমরা পরস্পরের কাছে ঝাপসা হয়ে আসছিলাম। হঠাৎ, কারণ জানি না কেন, এত কান্না পেল আমার, এমন অদ্ভুত সময়ে অকারণে! নির্বোধ সময়জ্ঞানহীন চোখের জলে অযথা ভেসে গেল আমার গাল-চিবুক-গলা-বুক এই মাটি। বৃষ্টির জলের জন্য আমাকে কাঁদতে ওরা দেখতে পারছে না। কিন্তু আমি এও জানি, আসলে আমরা চারজনেই কাঁদছি এখন। আর অবিশ্রান্ত কথা বলে চলেছি পরস্পরের অশ্রুর সঙ্গে।

উদিতা
সেপ্টেম্বর ২০০৯
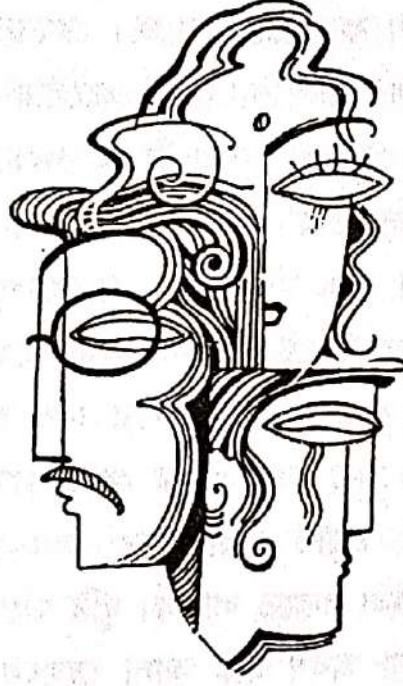
আত্মবিষ

কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি পড়ছে। ঠান্ডা ভেজা মাটির গন্ধ। চুপচাপ যেতে যেতে হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল ব্রজ। গাড়ি থামিয়ে রিকশার ছেলেটা বলল, 'তাড়াতাড়ি সারবেন।'

হাসি পেল ব্রজর। ভেবেছে ওর পেচ্ছাপ পেয়েছে। রিকশা থেকে নেমে মানিব্যাগ বার করে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে ব্রজ বলল, 'আমি এখানেই নামব।'

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, 'বললেন যে হাউজিং যাবেন।'

'যাব না।'

টাকা নিয়ে রিকশা ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে বিড়বিড় করল ছেলেটা, 'শাল্লা যত মালখোর আমার কপালেই জোটে!'

মালখোর...! গত পনেরো-ষোলো দিনের মধ্যে এক ছিপিও মদ খাওয়া হয়নি, আশ্চর্য! নিজেই যেন আলতোভাবে একবার চমকে উঠল ব্রজ।

রাত্রি দশটার দিল্লি রোড নির্জন। শুধু মাঝেমধ্যে তীব্র আলো আর গতি

নিয়ে গাড়িগুলো হুশ হুশ করে চলে যাচ্ছে। রোডের ধারে খানিকটা ঢালু জমি, তারপর একটা খাল। আকাশের ফিকে আলোয় সাদা শাপলা ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে। বহু দূরের আকাশ থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে চটি খুলে তার ওপর বসে পড়ল ব্রজ। পায়ের পাতায় শিরশিরে ঠান্ডা, অকারণ বসে রইল ব্রজ, অনেকক্ষণ। দূরের বিদ্যুৎ এখন ব্রজর মাথার ওপর চমকে উঠছে। আকাশ লাল। খেয়াল হল না। এমনকী বেশ জোরে বৃষ্টি এসে যাওয়ার পরেও স্থির হয়ে বসে রইল ব্রজ। বৃষ্টির জল গোটা শরীর চুঁইয়ে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে থাকল খালে। একটু দূরে পাঁচিলঘেরা, বন-জঙ্গলে ভরতি কবরখানায় লম্বা বটগাছটার পাতাগুলো বিদ্যুতের আলোয় ঝিলমিল করতে লাগল। দৃষ্টি জলের ফোঁটায় ঝাপসা...। হঠাৎ একটা তীব্র আলো অবশ হয়ে আসা চোখের ওপর ঝলসে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ব্রজ। কয়েক গজ দূরে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। একজন নামল। গায়ে রেনকোট, মাথায় ছাতা। আবার সেই ঘোরটা শুরু হতে থাকল। দৃশ্যটা যেন আলতোভাবে ঘটছে।

'এখানে কী করছেন?'

ব্রজ তাকিয়ে থাকল শুধু।

'কী হচ্ছে এখানে?'

'কিছু বলবেন?'

'বলছি কী হচ্ছে এখানে?'

'কিছু না।'

'কিছু না মানে?'

'বসে আছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কেন?'

'এমনি।'

'ন্যাকামো হচ্ছে? উঠে দাঁড়ান।' ব্রজ চুপচাপ উঠে দাঁড়াল।

'বাড়ি কোথায়?'

'ডানকুনি হাউজিং।'

'কী করেন?'

ব্রজ চুপ।

'কী হল? কী করেন?'

ব্রজ ফিসফিস করে বলল, 'জানি না।'

'কী?'

'জানি না।'

গাড়ির ভেতর থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'শালা ঢ্যামনামো হচ্ছে! দেব ভেতরে পুরে।'

'গাড়িতে উঠুন।' ব্রজ দাঁড়িয়ে থাকল।

'আরে গাড়িতে উঠুন।'

পুলিশের জিপটা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঘোরটা কাটতে থাকল ব্রজ চক্রবর্তীর। বালিশ থেকে মাথাটা তুলতে গিয়ে আবার নামিয়ে নিল। অসম্ভব ভার লাগছে মাথা। গায়ে চাদর ঢাকা দেওয়া। নিশ্চয়ই আরতি দিয়েছে। চোখের পাতা দুটোতেও প্রচণ্ড ক্লান্তি।

'কী গো!'

ঘাড় ফেরাল ব্রজ, আরতি এসে দাঁড়িয়েছে।

'তোমরা সবাই মিলে কেন এমন করছ?'

ব্রজ চুপ।

'কেন করছ?' বিছানায় ব্রজর মাথার কাছে বসে কেঁদে ফেলল আরতি। চাদর থেকে হাত বার করে ধীরে ধীরে আরতির হাতের ওপর হাত রাখল ব্রজ। বাইরে বৃষ্টিটা ততক্ষণে থেমেছে।

দুই

সকালে আলফা সেরামিক থেকে ফোন করল ব্যানার্জি। গাড়িটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করে বলল, 'আপনার ছেলের কথা শুনেছি স্যার,

ভেরি স্যাড। এখন কেমন আছে?'

'ভালো।'

'স্যার, কোথায় ভর্তি রয়েছে?'

'একটা বেসরকারি হসপিটাল?'

'ওহ্, কোনও প্রবলেম হলে আমাকে জানাবেন স্যার।'

'আচ্ছা রাখছি।' বলে ফোনটা রেখে দিল ব্রজ। খেয়ালই ছিল না গাড়িটা তিন-চার দিন ধরে আটকে রেখেছে। এক্সাইজ ইনস্পেকটর হওয়ার সুবাদে মাস মাইনের বাইরে বিভিন্ন কর্পোরেট থেকে যেটা আসে, তা দিয়ে দু-দুটো গাড়ি কিনে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু দরকার কী! শপিং থেকে শুরু করে কালনায় অসুস্থ কাকাকে দেখতে যাওয়া কিংবা দু-দিনের দিঘা ট্রিপের জন্য ফোকটে বিভিন্ন কোম্পানির গাড়ি পাওয়াটা কবে যেন অধিকারে এসে দাঁড়িয়েছে।

গাড়িটা ছেড়ে দিল ব্রজ।

আরতি জিগ্যেস করল, 'ছেড়ে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে যাবে তাহলে?'

'সবাই যেভাবে যায়। ট্রেনে। তারপর বাসে।'

'তুমি এরকম করছ কেন?'

'আরতি আমি কিছু করিনি। কিচ্ছু করা হয়নি।'

'প্লিজ তুমি একটু শান্ত হও। এই বিপদে তুমি এমন করলে আমি কী করব বলো তো?'

'আমি ঠিক আছি।'

ডানকুনি ডাউন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে চারদিকে আবার তাকাল ব্রজ। কত বছর পর দেখল স্টেশনটাকে। অনেক বদলে গেছে। গাড়ির ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মনে মনে তৈরি হল। যা ভিড়!

'আরে ব্রজদা, ও ব্রজদা!'

ব্রজ পিছন ফিরল। পাশের বাড়ির সমীর। ব্রজর থেকে বছর দুয়েকের ছোট। ছেলেবেলায় বন্ধু ছিল। এখন বাড়ির সামনে একটা স্টেশনারি দোকান খুলেছে। মোটামুটি চলে।

'কী ব্যাপার! ট্রেনে?'

'এই-ই!'

'সজল এখন কেমন?'

'আছে?'

'কবে ছাড়বে কিছু বলেছে?'

'নাহ্!'

ট্রেন ঢুকে গেল। ব্রজর ইচ্ছে ছিল সমীরকে এড়িয়ে অন্য কামরায় উঠবে। কিন্তু সমীরই হাত ধরে বলল, 'চলো। ট্রেনে কথা বলব।'

কয়েক সেকেন্ড প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি। ট্রেনে উঠে মনে মনে সমীরকে ধন্যবাদ দিল ব্রজ। সমীর না থাকলে দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ত ব্রজ কোনও কালেই অফিস টাইমের ট্রেনে উঠতে পারত না।

ভেতরে গুমোট গরম। সমীর তুখোড় কায়দায় পাঁকাল মাছের মতো ব্রজকে নিয়ে ভিড় কাটিয়ে চ্যানেলে গিয়ে দাঁড়াল। এখানটায় তবু স্বস্তি। বুকের ভেতরটা দপদপ করছে। আরতি বার বার বারণ করেছিল। ব্রজ শোনেনি, ইদানীং কী যে হয়েছে!

'আজ হঠাৎ ট্রেনে যাচ্ছ কেন বললে না?'

বহু পুরোনো স্মৃতি একবার ঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে হল! না, নিজেকে বদলে ফেলা? নাহ্! অতটা নয়! তবু কী যেন একটা...উত্তর ভেবে পেল না ব্রজ। শুধু আলতো হেসে বলল, 'এমনিই!'

'একদিন যে দেখতে যাব, কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি না। এত ভালো ছেলেটা...' থেমে গেল সমীর।

ব্রজ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকল। ভালো ছেলে সজল। বোধহয় ক্লাস সেভেন যখন ব্রজর প্রমোশন হয়। এক্সাইজ ইনস্পেকটর। আনন্দের ঢেউয়ে ভেসে গেছিল সেদিন তিনজনের সংসার। তারপর থেকে সব যেন

হু-হু করে পালটাতে শুরু করল। ঘরের আসবাবের সঙ্গে সঙ্গে মনগুলোও বদলে যেতে থাকল দিনে দিনে। ব্রজ যেদিন প্রথম ঘুষ খায় সেদিন পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে প্রচণ্ড ভয়ে বাড়ি ফিরেছিল। খালি মনে হচ্ছিল কে যেন ওকে ফলো করছে। সে সব দেখেছে, সব কিছু। একা থাকলেই মনে হত একটা ছায়ামূর্তি পেছন থেকে সবসময় ওকে দেখছে।

দিন দুয়েক পর আরতি খবরের কাগজ মোড়া টাকার গোছাটাকে তোশকের তলা থেকে বার করে ব্রজর সামনে বলেছিল, 'এভাবে কেউ রাখে!'

ধরা পড়ে থরথর করে সেদিন কেঁপে উঠেছিল ব্রজ। কিন্তু আরতি আর কিছু বলেনি।

তারপর আর একটু, আরও একটু...একদিন পিছনে লেগে থাকা ছায়ামূর্তিটা উধাও হয়ে গেল। পাঁচটা-ছ'টা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আরতির নামে সল্টলেকে একটা ফ্ল্যাট, এখন ফাঁকা পড়ে থাকে। রিটায়ারমেন্টের পর শিফ্‌ট করবে। প্রচুর সুখের নীচে কখন যে সজল অন্যভাবে বেড়ে উঠেছিল, টেরও পাইনি দুজনে। প্রথম ধাক্কাটা এল পুজোর সপ্তমীর রাত্রে। মাঝরাতে ডানকুনি থানার ওসি ফোন করেছিল। সজল লকআপে। পরদিন ভোরবেলায় ছাড়াতে দৌড়েছিল ব্রজ। হেড লাইট, ক্লাচ ভাঙা বাইকটা থানায় রাখা ছিল।

'ছেলে এই বয়েসে নেশা করছে, একটু নজর দিন।'

মাথা নীচু করে অপমান গিলে সজল আর ওর দুটো বন্ধুকে ছাড়িয়ে এনেছিল। বাড়ি ফিরে চড়টা সপাটে কষাতে গিয়ে ব্রজ দেখেছিল সজল বড় হয়ে গেছে, বেশ অনেকটা। হাত নেমে গেছিল। পরের কয়েক দিন অতিরিক্ত শাসন। তারপর আবার যে যার জগতে।

'ব্রজদা এত ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'উঁহু...না না ভাবছি না।'

'ছোটভাই হিসেবে একটা কথা বলছি কিছু মনে কোরো না, সজল এবার বাড়ি ফিরলে একটু খেয়াল রেখো। মানে ওর বন্ধু-বান্ধবগুলো...' ইঙ্গিতটা দিয়ে থেমে গেল সমীর।

বন্ধু! সজলের নতুন বন্ধুদের প্রথম দেখেছিল পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয়।

সজলের জন্মদিনের পার্টি সেবার ওখানে হয়েছিল। প্রচুর উড়িয়েছিল ব্রজ। অফিস কলিগ, বন্ধু-বান্ধব আর দু-চারজন হাই র‍্যাঙ্কের অফিসার নিয়ে ভালোই জমে উঠেছিল সন্ধেটা। রাত্রি ন'টা নাগাদ তিনটে গাড়ি চেপে সজলের বন্ধুরা এল হইহই করে। কয়েক মুহূর্তে পরিবেশটা হুড়মুড় করে বদলে গেছিল। এরা কারা! সজলের বন্ধু?...সজল! কী বিচিত্র তাদের পোশাক, কথাবার্তা, হাবভাব, 'হাই আংকল, হ্যালো আংকল।' ব্রজ ঠোঁটে জোর করে হাসি টেনে ওদের উত্তর দিচ্ছিল। হঠাৎ একটা চাবুক যেন ওর গোটা শরীরে আছড়ে পড়েছিল। কী যেন নাম ছিল মেয়েটার? সিঙ্কি। হাঁটু পর্যন্ত কাটা লতপত করা জিনসের প্যান্ট আর বগলকাটা জ্যালজ্যালে শার্ট পড়ে ব্রজর সামনে এসে বলেছিল, 'হাই! আমি সিঙ্কি।'

ব্রজ উত্তর দিতে পারেনি। সাদা মশারির মতো জামার ভেতর দিয়ে ঝকঝকে কালো ব্রেসিয়ার, গভীর নাভি, ঠেলে আসা বুক। ছেলের বান্ধবীকে দেখে শরীরের নীচে একটা মোচড় খেয়েছিল ব্রজ। ভুরুর নীচে গয়না পরা, চোখে নীল কনট্যাক্ট লেন্স, বাঁ-হাতে চুড়ির মতো করে পরা রুদ্রাক্ষ আর ডান হাতে...।

'এ কী!' বলে শিউরে উঠেছিল ব্রজ। মেয়েটার ডান হাতে মোটা ট্রান্সপ্যারেন্ট প্লাস্টিকে ভরা একটা সাপ।

ব্রজর পাশে থাকা আরতিও প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'ও মাঃ ও কী!'

'ডোন্ট ওয়ারি আন্টি, ইটস মাই লাভলি স্নেকি, জানিস সুজু আজ ইভিনিংয়ে বিজয় এটা গিফট্ করেছে। হোয়াট এ লাভলি সারপ্রাইজ!'

প্যাকেটটা উঁচু করে তুলে ধরেছিল মেয়েটা। প্যাকেটে ভরা খানিকটা জলের মধ্যে মেটে রঙের প্রাণীটা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে।

আর একটু পরেই আরতি বলেছিল, 'বাড়ি যাব।'

ব্রজরও প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। ছেলের রিকি মার্টিন, ব্রিটনি স্পিয়ার বন্ধুদের উদ্দাম নাচগান ওই সাপটার মতো পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিল ওদের, যতক্ষণ না ছেলেমেয়েগুলো নিজেরা ক্লান্ত হয়।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরে আরতি প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, 'এরা

তোর বন্ধু সুজু।'

'হ্যাঁ, কেন?'

'কেন মানে, এরা মানুষ!'

'আশ্চর্য কথা বলছ! মানুষ নয়তো কী?'

'আমি যেন ভবিষ্যতে তোকে এদের সঙ্গে মিশতে না দেখি।'

'দেখো মা, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।'

আরও গড়াত। ব্রজ তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে সামলে নিয়েছিল। রাত্তিরে আরতিকে বলেছিল, 'ওসব নিয়ে ভেব না। উঠতি বয়স। এখন একটু-আধটু এরকম হবেই। পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী ঠিক হয়ে যাবে?'

প্রশ্নটা উত্তরে আটকে গেছিল ব্রজ।

'চলো ব্রজদা, এগোতে হবে।'

সমীরের কথায় হুঁশ ফিরল ব্রজর। প্ল্যাটফর্মে নেমে দম আটকে এল। এত ভিড়! এত মানুষ! পা ঘষে ঘষে এগোতে এগোতে বুকের খাঁচাটা যেন চেপে আসতে লাগল।

'কী হল ব্রজদা, শরীর খারাপ লাগছে?'

'নাহ্, ঠিক আছে।'

'আর বোলো না। সারাদিন ধরে মানুষগুলো এইভাবেই ছুটছে, কোথায় যে আলটিমেট পৌঁছোতে চায়...!'

ব্রজ উত্তর দিল না। কোনওরকমে গেটটা পার করে সফট ড্রিংকস্ কর্নারে এসে দাঁড়াল।

'দুটো কোক দেখি।'

'আমি খাব না ব্রজদা। তুমি খাও।'

'কেন?'

'ক'দিন ধরে টনসিলটা ভোগাচ্ছে।'

ব্রজ পুরো বোতলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল। একটা ঢেঁকুর উঠল।

এখন একটু আরাম লাগছে।

'তুমি তো ট্যাক্সিতে যাবে। আমি তাহলে হাঁটা লাগাই।'

'কোথায় যাবি?'

'এই তো ক্যানিং স্ট্রিটে। মাল কেনার আছে কিছু।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

সমীর ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। ব্রজর ইচ্ছে ছিল বাসে যাবে। কিন্তু ট্রেনের মধ্যেই সেই সাহসটা উবে গেছে। কিছুতেই সম্ভব নয়। অত সহজে বোধহয় পুরোনো নিজেকে ফেরানো যায় না। স্টেশন পেরিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসল ব্রজ।

তিন

ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতে আরও মিনিট কুড়ি বাকি। চেয়ারে বসেছিল ব্রজ। এই হাসপাতালের ভেতরটায় এমন সুন্দর একটা নরম স্বপ্নের মতো মায়াবী আলো ছড়িয়ে থাকে, মনে হয় অন্য কোনও জগৎ। সজল কি আজকে কথা বলবে? এ ক'দিনের মধ্যে সজল ব্রজর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। অবশ্য শুধু কি ক'দিন! বাপ-ছেলের মধ্যে প্রকৃত কথা ধীরে ধীরে কবে বন্ধ হয়ে গেছিল! সজল কমার্স নিয়ে নাইট কলেজে ভর্তি হয়েছিল। প্রথম প্রথম রাত্রি সাড়ে ন'টা-দশটা। তারপর এগারো-সাড়ে এগারো-বারো। কখনও ফোন করে বলে দিত, 'ফিরব না।'

'কেন?'

'বন্ধুর বাড়িতে পার্টি আছে। কাল কলেজ করে ফিরব।'

নাগালের বাইরে চলে গেছিল। সজলের সেই বন্ধুদের আর একবার দেখেছিল ব্রজ নন্দন চত্বরে। সেবার শাঁসালো একটা পার্টি পাওয়া গেছিল। নন্দনের সামনে বিকেল চারটেয় টাইম ছিল ফাইনাল কথাবার্তার। একটু আগেই পৌঁছে গেছিল ব্রজ। গাছতলায় বসে সিগারেট টানছে হঠাৎ, 'হাই আংকল!'

দেখেই চিনেছিল ব্রজ। ভুরুতে গয়নাপরা সেই মেয়েটা। স্কিনটাইট কালো হাত কাটা গেঞ্জি আর হাঁটু পর্যন্ত জিনসের প্যান্ট। সঙ্গে একটা ছেলে। পনিটেল করা চুল, কাঁধে গিটার।

'আপনি এখানে?'

'অ্যাঁ...ওই...একজনের আসার কথা আছে। তারপর তোমাদের খবর কী?'

'ফাইন!'

'কী করছ এখন?'

'জাস্ট এনজয়িং লাইফ।'

ব্রজ হঠাৎ একটু মর্ডান কায়দায় উপদেশ দিয়ে ফেলেছিল। 'বাট ডোন্ট ওয়েস্ট ভ্যালুয়েবল টাইমস্।'

সবুজ কনট্যাক্ট লেন্স লাগানো চোখে হাসির ঝিলিক দিয়ে মেয়েটা বলেছিল, 'উই নেভার ওয়েস্ট টাইম আংকল, র‍্যাদার টাইম ওয়েস্টস আস।'

পুরোপুরি চুপসে গেছিল ব্রজ চক্রবর্তী, যার কাছে বড় বড় কোম্পানির কর্তারা কুকুরের মতো লেজ নাড়ে, একটা হাঁটুর বয়েসি মেয়ের কাছে এমন সপাট শব্দের লাথি হজম করতে পারেনি। ওরা চলে যাওয়ার পরেই মুখ থেকে একটা কাঁচা খিস্তি বেরিয়ে এসেছিল। পরক্ষণেই মনে হয়েছিল, যাহ্, হাজার হোক ছেলের বন্ধু সম্পর্কে...ধুস শালা ছেলে।

ব্রজর পাশে বসে থোকা আধবুড়ো লোকটা বোধহয় খিস্তিটা শুনে ফেলেছিল। ঠোঁটের ফাঁকে মিটমিটে হাসি এনে জিগ্যেস করেছিল, 'চেনেন এদের?'

'হুঁ!'

'পাশের ছেলেটাকেও চেনেন?'

'না।'

'সে কী? চেনেন না!'

ভালো লাগছিল না কথা বলতে। কিন্তু তবু একটা কৌতূহল সুড়সুড় করছিল।

'কেন? কে?'

'হে, হে, ব্যাটাছেলে রক্ষিতা।'

'মানে!' ভুরু কুঁচকে উঠেছিল ব্রজর।

'মেয়েটাকে তো জানেনই, কোটিপতি বাপের স্পয়েল্ট প্রোডাকশন। আর ছেলেটা সাদিসুদা, হিন্দমোটরে বাড়ি। ও ব্যাটাকে এই হারামজাদি নিজের শখ মেটনোর জন্য ফুসলে তুলে এনে আলাদা ফ্ল্যাটে রেখেছে। যখন যা চায় তাই দেয় আর ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে, সেই আগেকার দিনের বাবুদের মতো। শালা ছেলে হয়ে...লজ্জাও করে না...ছ্যাঃ!'

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ব্রজ টের পেল ওর হাতের তালু ঘামে ভিজে উঠেছে। ফলের প্লাস্টিকটা শক্ত করে ধরল। সজল আজকে কথা বলবে?

সবুজ পর্দাটা সরিয়ে কেবিনে গিয়ে আবার বেরিয়ে এল ব্রজ। সজল বিছানার ওপর বেডপ্যানে বসে। দুজন আয়া ধরে রয়েছে ওকে। মিনিট দশেক পরে একজন আয়া বাইরে এসে বলল, 'যান ভেতরে।'

সজল চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়েছিল। ব্রজ ঢোকার পরেও একবার পাশ ফিরে তাকাল না। ফলের প্যাকেটটা মিটসেফের ওপর রেখে চেয়ারে নিঃশব্দে বসল ব্রজ। দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ। তারপর গলা খাঁকরে মিনমিন করে বলল ব্রজ, 'কেমন আছিস আজকে?'

কাঁপা হাতে সজলের হাতটা মুঠোয় নিল ব্রজ। ঠান্ডা হাত, সজল তাকাল না।

'প্লিজ!' শব্দটা গলা দিয়ে বেরোতে গিয়েও কীসে ধাক্কা খেয়ে ভেতরে চলে গেল।

দিন পনেরো আগে রাত্রি সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরেছিল সজল। ব্রজ ভেবেই নিয়েছিল আজ একটা এসপার-ওসপার করতে হবে। সজলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ক্রোধটা বারুদের মতো দপ করে উঠেছিল। 'শুয়োর, মদ খেয়ে মাঝরাতে বাড়ি ঢুকছ। বেরোও, বেরোও বাড়ি থেকে।'

সজল ভালো করে তাকাতে পারছিল না। 'কেন, খেয়েছি তো কী

হয়েছে, তুমি খাও না?'

'শাট আপ রাস্কেল, আমার পয়সায় এখানে এসব চলবে না।' আরতি বাধা দিতে গিয়েছিল। এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছিল ব্রজ। 'গেট আউট!'

'আরে ধোর, চোখ রাঙাচ্ছ কাকে? এ-বাড়ির দরজায় আমি মুতি শালা।'

'আরতি ওটাকে দূর করো। একটা নোংরা কুলাঙ্গারকে পয়সার শ্রাদ্ধ করে জান ঢেলে বড় করছি...'

'এই শোনো', আঙুলটাকে ব্রজর মুখের সামনে তুলেছিল সজল। 'ওসব পয়সার গল্প শুনিও না।...শালা ঘুষের পয়সা তার আবার শ্রাদ্ধ...কী...কী করেছ আমার জন্য অ্যাঁ...? তোমরা সব শালা বিট্রে করেছ আমার সঙ্গে...' বলতে বলতে বেরিয়ে গেছিল সজল। মোটরবাইকের শব্দটা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্রজ চিৎকার করেছিল।

রাত্রি একটা নাগাদ ফোন এসেছিল পিজি থেকে। কোনা এক্সপ্রেস ওয়েতে সজল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। দু-দিন পর জ্ঞান ফিরেছিল সজলের। প্রাণে বেঁচে গেছে একটুর জন্য। কপালে তিনটে স্টিচ, কোমর আর হাঁটুতে ফ্র্যাকচার। ব্রজর কাঁধে হাত রেখে ডাক্তার বলেছিলেন, 'ডোন্ট ওয়ারি, এখন আউট অব ডেনজার। তবে মাস ছয়েকের জন্য পুরো বিছানায় ধরে নিন।'

'ছ'মাস!'

ব্রজর অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন ডাক্তার। মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এটাকে একটা সুযোগ হিসেবেও ভাবতে পারেন। দেখুন বাড়িতে থাকলে হয়তো পালটে যেতে পারে, যা জেনারেশন এখন। বাপ-মা মুখে রক্ত তুলে খাটবে আর এরা সব...টোটালি ফিলিংলেস।'

চার

সন্ধে সাতটায় বাড়ি ফিরল ব্রজ। আরতি ব্যালকনিতে বসেছিল। দেখা মাত্র ছুটে এল।

'কী গো কেমন?'

'ঠিক আছে।'

আরতি একটু চুপ করল। তারপর আস্তে আস্তে জিগ্যেস করল, 'কথা বলেছে আজকে?'

ব্রজ উত্তর দিল না।

'বলেনি?'

'আহ্ আরতি, ভালো লাগছে না। তোমার ছেলে কথা বলুক না বলুক কিস্যু এসে যায় না আমার। নিজে দোষ করেছে, ফল ভুগছে। আমি কী করতে পারি?'

আরতি আর কিছু বলল না। পায়ে পায়ে কিচেনের দিকে গেল।

ব্রজর মাথা দপ দপ করছিল। শাল্লা এখনও বাপের পয়সায় ট্রিটমেন্ট করতে হচ্ছে তার ওপর আবার রোয়াব দেখানো! থাকত পড়ে সরকারি হাসপাতালে, সব টেম্পার বেরিয়ে যেত।

জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকল ব্রজ। বাথরুমটা দারুণ সাজানো। দেওয়ালে মেঝেতে দুধ সাদা মার্বেল। এক কোণে কাচ দিয়ে ঘেরা স্নান করার জায়গা। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল আয়নাটার দিকে তাকাল ব্রজ। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়েও আবার তাকাল। খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। নিজের চোখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। রাগটা বন্ধ ঘরের ভেতর গুমগুম শব্দ করছে, মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'ধ্যার শা...হ্' তারপর কাচের দরজা খুলে হ্যান্ড শাওয়ার চালিয়ে দিল।

ডাইনিং টেবিলের ওপর চা রেখে বসেছিল আরতি। ব্রজ বাথরুম থেকে বেরিয়ে সটান ফ্রিজ খুলে হুইস্কির বোতল, গ্লাস আর এক জগ জল নিয়ে এসে আরতির মুখোমুখি বসল। আরতি একবার তাকাল। কিছু বলল না।

বড়সড়ো দুটো পেগ মেরে তিন নম্বরের বেলায় আরতির দিকে আড়চোখে তাকাল ব্রজ। হালকা হলুদ রঙের স্লিভলেস নাইটি পরে রয়েছে। ফরসা চকচকে নিটোল হাত টেবিলের ওপর জড়ো করে রাখা। এখনও আরতির চেহারা দেখার মতো। দেখে কে বলবে ছেলে কলেজে পড়ে!

অফিস পার্টিতে আরতিকে নিয়ে গেলে ব্রজর দাম আরও বেড়ে যায়। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। ভার হালকা হচ্ছে ধীরে ধীরে।

ব্রজ গলা খাঁকরে বলল, 'আজ ট্রেনে সমীরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

আরতি চুপ।

'অনেকদিন পর কথা হল। ভালো ছেলেটা। কিছু করে উঠতে পারল না।'

'আর খেয়ো না।'

'নাহ্।'

'খাবার বাড়ব?'

'নাহ্ খেয়ে এসেছি।'

আরতি উঠে দাঁড়াল। ব্রজ উঠতে গিয়ে টাল খেল একবার। ফ্রেশ রিমঝিমে আরাম লাগছে শরীরে।

নরম সবুজ আলো জ্বলছে বেডরুমে। ব্রজ কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে আরতির দিকে ঘেঁষে এল। মুখের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর আরও একটা-দুটো অকারণ কথা বলে আরতির নাইটির বুকের বোতামে হাত দিতেই ছিটকে সরে গেল আরতি।

'কী করছ!'

'কী আবার করছি!'

'তোমার...তোমার লজ্জা করে না?'

'কেন?'

'ছেলেটা হসপিটালে রয়েছে, আর...'

'তার জন্য আমি দায়ী? আমার দোষ, অ্যাঁ?'

'তুমি...সত্যিই...ছিঃ' পাশ ফিরে কুঁকড়ে শুল আরতি।

'হ্যাঁ, ছিঃ তো বলবেই।' আহত বাঘের মতো গর্জে উঠল ব্রজ। এতদিন ধরে আরামে মায়েপোয়েতে খাচ্ছ, ওড়াচ্ছ যার জন্য, এখন তাকে ছিঃ বলবে না?...শাল্‌লা!' কপালের রগ ছিঁড়ে পড়ছে যেন।

'অ্যাই শোনো, এদিকে শুনে রোখো', আরতিকে ধাক্কা দিল ব্রজ। 'আমার

আর টাকা নেই ছেলেকে বড় হাসপাতালে রাখার। কাল ওকে মেডিকেলে ভর্তি করে দেব।...ইয়েস আই উইল ডু ইট।' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্রজ। গোটা শরীর কাঁপছে। টলতে টলতে বাথরুমে গেল।

বাথরুমের পাশে সজলের ঘর। দরজা বন্ধ। কী মনে করে ব্রজ আস্তে আস্তে ওদিকে গিয়ে সজলের বন্ধ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। কুটকুটে অন্ধকার ঘরটা। সুইচবোর্ডটা যেন কোন দিকে? বাঁদিকে হাতড়াল ব্রজ। পেল না। তারপর ডান দিকে দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দু-পা যেতে সুইচবোর্ডে হাত পড়ল। প্রথম সুইচে শুধু খুট শব্দ। দ্বিতীয়টায় পাখা। তিন নম্বরে টিউব জ্বলে উঠল। পরিষ্কার করে পাতা বিছানা-বালিশ। খাটের পিছনে কাঠের দেওয়াল আলমারি। ব্রজ ওটার কাছে গেল। একটু থামল। তারপর বহুকাল পরে ছেলের নিজস্ব আলমারির দরজা খুলল। একটা র‍্যাক ভর্তি ম্যাগাজিন, বইপত্র। দ্বিতীয়টায় ক্যাসেট, সিডি। ব্রজ কেমন যেন ঘোরের মধ্যে অকারণ একটার পর একটা সিডি বার করে দেখতে থাকল! বেশির ভাগই ইংরেজি। কিছু হিন্দি, একটা রিকি মার্টিনের সিডি-অ্যালবাম। প্যাকেটের গায়ে লেখা, 'উইথ বেস্ট উইশেস টু মাই সন অন হিজ বার্থ ডে—বাবা, টু থাইজেন্ট টু'। সিডিটাকে বিছানার ওপর রাখল ব্রজ। তারপর ক্যাসেটগুলো ঘাঁটতে শুরু করল। ম্যাডোনা, মাইকেল জ্যাকসন, দালের মেহেন্দি, কাঁটা লাগা, ধুম মচা দে সরাতে সরাতে একেবারে এক কোণে যেখানে টিউবের আলো পৌঁছোয়নি, সেখানে হাত বাড়াল ব্রজ। হয়তো সজলের একান্ত গোপন কিছু লুকোনো আছে। ক্যাসেটে হাত ঠেকল। বার করে আনল ব্রজ। প্লাস্টিকের কভার। দীর্ঘ দিনের অব্যবহারের ঝাপসা হয়ে গেছে। ক্যাসেট খুলে ভেতরের ছবিটা বার করে আনতে আনতে হাতটা শিরশির করে উঠল ব্রজর। কিশোরকুমারের রবীন্দ্রসংগীত। ভেতরে বিবর্ণ হয়ে আসা ঝরনা কলমে লেখা 'সুজুর জন্মদিনে বাবা, উনিশো নিরানব্বই'।

নিজের ঘরের দিকে এল ব্রজ। গলার কাছটা বিষ তেতো। ভেতরে কী যেন একটা দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে রয়েছে। দরজা খুলে ঢুকতেই থমকে গেল। আরতি বিছানায় বসে রয়েছে। হাঁটু দুটো বুকের কাছে জড়ো করা।

ব্রজ কিছু বলল না। পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। এত অস্থির লাগছে।

আরতি মিহি গলায় বলল, 'কী গো?'

ব্রজ উত্তর দিল না।

'অ্যাই!'

'উঃ!'

'রাগ করেছ আমার ওপর?'

'না!'

'হ্যাঁ করেছ!' বলেই আচমকা কিশোরী মেয়ের মতো ব্রজর বুকে ঢলে পড়ল আরতি। ব্রজ ভুরু কুঁচকে আরতির দিকে তাকাল।

'খুব রাগ না!' আরতির গলায় আদুরে বেড়ালের মতো সোহাগ।

ব্রজকে ঘাঁটতে শুরু করল আরতি।

'আহ্ ভালো লাগছে না আরতি।'

'হ্যাঁ ভাল্লাগছে।'

'প্লিজ!'

'না!'

খানিকক্ষণের চেষ্টায় সফল হল আরতি। ব্রজ ধীরে ধীরে বাঁধল আরতিকে। আজকে আরতি যেন বেশি উচ্ছ্বল, ব্রজও আরতিকে প্রাণপণ আকঁড়ে ধরে শরীর নয় অন্য কী যেন অস্থিরভাবে খুঁজে যাচ্ছিল। চূড়ান্ত মুহূর্তটার দু-এক কদম আগে আরতি হঠাৎ থিরথিরে গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো, ছেলেটাকে ট্রান্সফার করবে না তো?'

দেশ
জুন ২০০৬
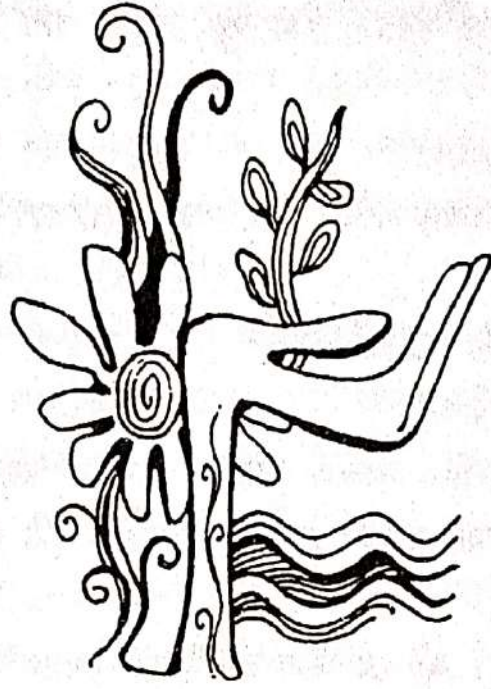
যে জীবন আমাদের

এবারে অনেকদিন পরে অফিসে এল ব্যারি। শ্রেয়া নিজের ডেস্কে বসে আড়াচোখে একবার ব্যারিকে দেখে নিয়ে আন্দাজে হিসেবটা করে নিল। তা প্রায় মাস তিনেক হবে, এই রে ব্যারি এদিকেই আসছে।

'হ্যালো শ্রেয়া' বলে পাশের একটা চেয়ার হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে ব্যারি বসে গেল শ্রেয়ার পাশে। 'হাউ আর ইউ?'

'ভালো, কী খবর, এতদিন কোথায় ছিলে?' শ্রেয়া জিগ্যেস করল।

'...অ্যাঁ, কোথায়?...' কোঁকড়োনো রুক্ষ চুলগুলোর মাথাটায় রোগা রোগা আঙুলগুলো বার কয়েক চালিয়ে নিয়ে ব্যারি বলল, 'এই তো বাড়িতেই ছিলাম,' বলেই গলা খুব নামিয়ে বলল, 'একটা খুব ইমপর্টেন্ট কাজে বিজি ছিলাম, পরে বলব।'

শ্রেয়াও মুচকি হেসে এইরকম ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক আছে, পরে বোলো।'

'না, না, ইয়ার্কি নয়। সিরিয়াস কেস, আমার লাইফ...'

'আরে ব্যারি, কী খবর?' অমরেশ শ্রেয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল।

'ওহ্ ডিয়ার, ফাইন।'

'বেশ বেশ', পিৎজায় কামড় দিয়ে অদ্ভুত উচ্চারণে বলতে বলতে চলে গেল অমরেশ।

'শংকরদা আছেন চেম্বারে?'

'হ্যাঁ, আছেন, যাও।'

উঠে দাঁড়াল ব্যারি। ঢলঢলে প্যান্টটা টানাটানি করে খানিকটা ওপরে তুলে নিয়ে বলল, 'যাই তাহলে দেখা করে আসি। তুমি আছো তো? অনেক কথা আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছি।' এই রে আজ তার মানে কপালে দুঃখ আছে। বকবক করে মাথা খাবে ব্যারি।

ব্যারি হাঁটা লাগাল শংকরদার চেম্বারের দিকে। শংকর গুপ্তা শ্রেয়ার বস। 'ওয়েক আপ' ইংলিশ ডেইলির হেড ডিজাইনার। এখন বয়স প্রায় ষাট। কোনও অজ্ঞাত কারণে অবিবাহিত। খুব ভালোমানুষ। অফিসে নিবেদিত প্রাণ।

ব্যারির হেঁটে যাওয়ার দিকে তাকাল শ্রেয়া। এই ক'মাসে রোগা ব্যারি আরও টিংটিংয়ে হয়ে গেছে। সেই যথারীতি একটা রংচটা টি শার্ট ঢলঢলে জিনসের প্যান্ট। চেম্বারের কাছাকাছি চলে গিয়ে আবার ফিরে এল ও। 'সরি, জিগ্যেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম, হাউ ইজ ইয়োর হাজব্যান্ড?'

'হি ইজ ফাইন' বলেই ভীষণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শ্রেয়া, এই প্রসঙ্গটা এলেই গোটা গায়ে চামড়ার ভেতর এত অসহ্য জ্বলতে শুরু করে!

'ভেরি গুড ভেরি গুড, হ্যাপি ম্যারেড লাইফ...ভেরি গুড', আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে আবার ফিরতি হাঁটা লাগাল ব্যারি। শ্রেয়া আবার মাথা তুলে তাকিয়ে থাকল আনস্মার্ট বেখেয়ালি হেঁটে যাওয়াটার দিকে।

ব্যারি দাসকে শ্রেয়া চেনে প্রায় বছর দুয়েক হয়ে গেল। এই কাগজের অফিসে ট্রেনি আর্টিস্ট হিসাবে জয়েন করার কয়েক দিন পরেই পরিচয় হয়েছিল ব্যারির সঙ্গে। এমন আধখ্যাচড়াটে অগোছালো মাঝবয়সি অ্যাংলো

লোকটার সঙ্গে কথা বলে বেশ মজাই লেগেছিল শ্রেয়ার। চল্লিশ কী বেয়াল্লিশ বয়স। রোগা, লম্বা, রোদে পোড়া লালচে গায়ের রং, একমাথা কাঁচা-পাকা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। সরু কাঁধ। কোমর খুব বেশি হলে আঠাশ। রুকুদার সঙ্গে কথা বলেছিল একমনে। হঠাৎ শ্রেয়ার দিকে আঙুল তুলে জিগ্যেস করেছিল, 'হু ইজ শি?'

সিনিয়র আর্টিস্ট রুকুদা হেসে বলেছিল 'ওহ্...ও হল আমার এক মেয়েই বলতে পারো। ওর নাম শ্রেয়া। নতুন জয়েন করেছে।'

'তোমাদের ডিপার্টমেন্টে?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড। হ্যালো শ্রেয়া। আয়্যাম ব্যারি।'

'হ্যালো' বলে প্রত্যুত্তর দিয়েছিল শ্রেয়া।

ব্যারি খুব ব্যস্তভাবে হাতের বিবর্ণ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগটার ভেতর হাত চালিয়ে দুটো মিইয়ে আসা গাছের চারা বার করে শ্রেয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'গিফ্‌ট ফর ইউ। আজই বাড়িতে টবে বসিয়ে দিও। আর শিকড়ে যে মাটি দিয়ে রেখেছি সেটা ছাড়ানোর দরকার নেই, কেমন?'

শ্রেয়া তো হতবাক, এ আবার কেমন অদ্ভুত গিফ্‌ট!

রুকুদা হেসে বলেছিল, 'নিয়ে নে, এই তো শুরু হল।'

ব্যারি চলে যাওয়ার পর রুকুদা বলেছিল, 'ব্যারি অফিসে এলেই সবাইকে ফুলগাছের চারা উপহার দেয়। আগে রঙিন মাছও নিয়ে আসত প্লাস্টিকে জলে ভরে। এখন সেটা বন্ধ হয়েছে।' রুকুদার কাছে আরও ডিটেল পেয়েছিল শ্রেয়া। সত্যিই বিচিত্র মানুষ এই ব্যারি। পুরোনো পার্ক স্ট্রিটের বহুদিনের বাসিন্দা। চাকরি করত সি ই এস সি-তে। বউ আর এক মেয়েকে নিয়ে দিব্যি চলছিল, হঠাৎ করে ব্যারি কোত্থেকে জোটাল গাঁজার নেশা। দিনরাত গাঁজা খাওয়া, অদ্ভুত সব বন্ধুবান্ধব, ঢিলেঢালা স্বভাবের ব্যারি খুব তাড়াতাড়ি ডুবে গিয়েছিল। বউয়ের হাজার বারণ, ঝামেলা কোনও কিছুতেই কান নেই, দিনের পর দিন অফিস না যাওয়া, নন পে, বাড়ি ফেরার ঠিক নেই। বাচ্চাটার খাবার জোটে কি জোটে না। ব্যারির নেপালি বউ পাসাং নিরুপায় হয়ে ব্যারিকে ছেড়ে দিয়ে উঠল ব্যারির দাদার বাড়িতে।

দাদা অবিবাহিত। একটা বেকারিতে চাকরি করত। একাই থাকত রিপন স্ট্রিটে একটা ভাড়া ঘরে। শোনামাত্র ব্যারির মাথায় আগুন। দাদার বাড়িতে গিয়ে হুজ্জতি, শেষে ওপাড়ার লোকের কাছে চড়-থাপ্পড় শাসানি খেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিল। তারপর থেকে আরও বাউন্ডুলে অবস্থা। চাকরিটাও গেল শেষপর্যন্ত। এই কাগজের অফিসটায় বহুদিন থেকেই যাতায়াত ছিল ওর। ও সুস্থ থাকার সময় থেকেই শখে এখানে টুকটাক ইলাসট্রেশনের কাজ করত। শ্রেয়া দেখছে ব্যারির ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং যথেষ্ট বোল্ড। কনসেপশনও ক্লিয়ার। তবে কম্পিউটারটা একেবারেই জানে না। শ্রেয়াকে প্রথম দিকে বার কতক রিকোয়েস্ট করেছিল। 'আমাকে কম্পিউটারে ছবি আঁকা শিখিয়ে দাও না।' শ্রেয়া শেখাতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দু-দিনে এও বুঝে গিয়েছিল গাঁজা খেয়ে খেয়ে ব্যারির মাথাটা একেবারে গেছে। কিচ্ছু মনে রাখতে পারে না, দু-মিনিটেই সব ভুলে যায়। হাল ছেড়ে দিয়েছিল ও। ব্যারিও। রুকুদা বলেছিল, ওর খ্যাপামোয় বেশি মাথা ঘামাস না। শোধরাবার নয়। দম দিয়ে দিয়ে মাথাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। তবে ছেলেটার মনটা একেবারে সাদা, জানিস, কষ্ট হয়। ব্যাটা এইটুকু বয়স থেকে প্রেম করে বিয়ে করল কিন্তু বউটাকে রাখতে পারল না। মেয়েটারও দোষ নেই। অনেক সহ্য করেছে। কপালই খারাপ।'

শংকরদার চেম্বার থেকে বের হল ব্যারি। মুখটা ঝুল। তার মানে মনখারাপ। ব্যারির যেকোনও এক্সপ্রেশনই খুব প্রকট। সরল মানুষদের যেমনটা হয়।

শ্রেয়ার পাশের চেয়ারে ঝপ করে বসে পড়ল ব্যারি।

শ্রেয়া ওকে দেখেও না দেখার ভান করে কাজে ব্যস্ত রইল।

কিছুক্ষণ চুপ করে ব্যারি বলল, 'তুমি খুব বিজি?'

'উঁঃ বলো।'

'একটু কথা ছিল।'

'হ্যাঁ, শুনছি বলো।'

'প্লিজ দু-মিনিট টাইম দেবে আমাকে?'

কম্পিউটার থেকে মুখ ফেরাল শ্রেয়া। 'বলো কী বলবে।'

'আমি খুব প্রবলেমে। আমাকে হেল্প করতে পারো?'

'আমি।...কী হেল্প, বলো।'

'আমাকে তোমাদের অফিসে একটা জবের ব্যবস্থা করে দিতে পারো?'

'জব! আমি! কী বলছ ব্যারি, আমি কী করে...!'

'আমি খুবই মানিটারি প্রবলেমে আমি, জানো। কিছু একটা কাজ খুব দরকার।'

'তো শংকরদাকে বলো গিয়ে।'

'বললাম তো, শংকরদার রিপ্লাই করল, হবে না। তোর মাথায় কিছু থাকে না। ইরেসপনসিবল।'

'হুঁ।' শ্রেয়া এবার বুঝল চেম্বার থেকে কেন ব্যারি মুখ ঝুলিয়ে বেরিয়েছিল।

'তুমি প্লিজ আমার জন্য শংকরদাকে একটু রিকোয়েস্ট করো না।'

'কী করে বলি বলো তো, শংকরদা নিজেই যখন নেগলেক্ট করছে।'

'তুমি তো ভালো মেয়ে, সিনিসিয়র। প্লিজ একবার যদি...'

'আচ্ছা ঠিক আছে, বলে দেখব।'

'ও ডিয়ার থ্যাঙ্কস...থ্যাঙ্কস।'

'কী ব্যারি, কেমন আছ?' রুকুদা শ্রেয়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল। ব্যারি উত্তরে হাসিহাসি মুখ করে কিছু একটা বলার আগেই রুকুদা একইসঙ্গে হালকা ধমক দিয়ে গেল, 'মেয়েটাকে কাজ করতে দে, বকবক করে মাথা খাস না।'

চুপসে আবার এইটুকু হয়ে গেল ব্যারির মুখ।

'আহা রে', কষ্ট লাগল শ্রেয়ার।

'সরি তোমার কাজে ডিসটার্ব করছি' বলে ধড়মড় করে উঠে পড়ল ও। 'বাই' বলে দু-পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এসে ঘাড় ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে শ্রেয়াকে জিগ্যেস করল, 'অনলি ওয়ান কোশ্চেন, ভালো বায়নাকুলার কোথায় পাওয়া যায়, জানো?'

'অ্যাঁ?' হঠাৎ এমন একটা প্রশ্নে চমকে উঠল শ্রেয়া, 'না তো...জানি না তো?'

'ওকে ওকে—নো প্রবলেম...আমি খুঁজে নেব...'

ব্যারি চলে যাওয়ার পরক্ষণেই শ্রেয়ার মোবাইল বেজে উঠল, স্ক্রিনে চোখ ফেলেই অবাক। শ্বশুরবাড়ির ল্যান্ড লাইন নাম্বার, শাশুড়ি ফোন করেছে, অবাক কাণ্ড!

'হ্যালো।'

'হ্যাঁ শ্রেয়া শোনো, আমি একটু বেরোচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে। চাবিটা অনন্যাদের ফ্ল্যাটে দিয়ে যাচ্ছি। বুবাই এলে বোলো ওর জিনিসটা ডিপ ফ্রিজে রাখা আছে', শ্রেয়াকে হুঁ-হাঁ কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে স্রেফ নিজের ইনফরমেশনটুকু জানিয়ে দিয়ে শাশুড়ি কট করে কেটে দিলে লাইনটা। মোবাইলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও। রাগটা দলা পাকাচ্ছে।

বুবাই নামে লোকটার সঙ্গে শ্রেয়ার তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু শ্রেয়ার ভাবতে ভালো লাগে ওদের বিবাহিত জীবন তিরিশ-চল্লিশ বছর পার করে গেছে, শ্রেয়ার বয়স এখন হিসাবেরও চেয়ে অনেক বেশি। যে-কোনওদিন মরে যাবে...উহ্ শান্তি! কিন্তু পরক্ষণেই রাগে গা চিড়বিড় করে ওঠে। কেন মরব আমি? কী দোষ করেছি? ভাবনাটায় থুতু ছিটোয় ও, গালাগাল দেয়। মাথার ভেতর থেকে দূর হয়ে যেতে বলে। বুবাই আর ওর মায়ের ওপর ভীষণ অকৃত্রিম ক্রোধ আসে। বিয়ের আগে মাস সাতেকের প্রেম। বুবাই চাকরি করত একটা বিদেশি সফ্টওয়্যার কোম্পানিতে। ফেসবুকে পরিচয় হয়েছিল দুজনের। বুবাইয়ের প্রোফাইল ভালো লেগেছিল শ্রেয়ার। ওয়াল পোস্ট, মেসেজ থেকে অ্যাপো, তারপর সটান বিয়ের ডিসিশন। তখন কত বয়স শ্রেয়ার। পঁচিশ হবে। এই ডেইলিতেই ও তখন ট্রেনি আর্টিস্ট। শংকরদা বিয়ের কার্ড হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'খুব তাড়া বিয়ের? সব ঠিকঠাক দেখেশুনে নিয়েছিস তো বাবা?' শ্রেয়া উত্তরে কী বলবে ভেবে না পেয়ে হেসে ঘাড় কাত করেছিল। ফুলশয্যার রাতে বিছানায় বুবাই বলল, 'শোনো মা বলেছে আমাদের ইস্যু নিতে দেরি

না করতে।' বলেই ব্লাউজের প্রথম হুকে হাত।

হাতটা চেপে ধরে শ্রেয়া বলেছিল, 'মা বলেছে মানে? এসব ব্যাপারে তো আমরা দুজনে ডিসিশন নেব, তাই না?'

'না মানে...তোমারই বা অসুবিধাটা কোথায়?'

'বাহ্, অসুবিধা নেই! আমার কেরিয়ারটাই ভালো করে তৈরি হল না এখনও, এর মধ্যেই এসব...না।'

'না' শব্দটায় ধাতুতে ঠোকা খাবার মতন আওয়াজ হয়েছিল, সেদিন আর কথা বাড়ায়নি, বুবাই, কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই আবার সেই আবদার, তার পর আর একটু বেশি, জোরাজুরি-বাড়াবাড়ি...

'কী ব্যাপার কী বুবাই, এত জোরাজুরি করছ কেন বুঝতে পারছি না। আমার কিন্তু এবার বিরক্ত লাগছে।'

'বিরক্ত আমারও লাগছে। তোমারই বা অসুবিধাটা কোথায়? জানো যখন আমার মা হার্টের পেশেন্ট, বয়স্ক মানুষ, নাতি-নাতনির মুখ দেখতে চায় তাড়াতাড়ি। বাইচান্স কোনওদিন কিছু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে তখন আপশোসের সীমা থাকবে না।'

'কিছু মনে কোরো না বুবাই, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার হলে কোনওদিন কেন, আজ বা কালকেও কিন্তু হয়ে যেতে পারে, তখন কী করবে? তোমার তাহলে উচিত ছিল কোনও বাচ্চাকাচ্চা সমেত মেয়েকে বিয়ে করে আনা। তাহলে প্রথম দিনেই তোমার মা-র শখ পূরণ হয়ে যেত।'

'শ্রেয়া লিমিট ক্রস কোরো না। তোমার প্রবলেমটা একটু খোলসা করে বলো না শুনি।...ফিগার নষ্ট হয়ে গেলে প্রমোশনে অসুবিধা, না কি কনসিভ করার ক্যাপাসিটিই নেই?...উঁ?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলা বেকার বুবাই, আসলে আমারই ভুল আগে বুঝতে পারিনি, তুমি ঠিক মানুষের পর্যায়ে পড়ো না, তার থেকে দু-এক ধাপ নীচে আছো, আগে মানুষ হও তারপর না হয় কথা বলা যাবে।' দাউদাউ জ্বলতে থাকা মাথাটাকে আপ্রাণ ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করতে করতে কথাগুলো বলেছিল শ্রেয়া। তার পরেও তিন তিনটে বছর প্রেমহীন অভ্যাস যাপন। অবশ্য তিন বছরে একই প্রতিজ্ঞায় থাকেনি ও। অফিসে চাকরিটা

কনফার্ম হয়ে যাওয়ার পর একদিন রাত্রে ও নিজেই টেনে নিয়েছিল বুবাইকে। কিন্তু সত্যিই কি ভালোবাসা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ আসতে চায় না, নাহলে একবারের জন্যও বীজ প্রোথিত হল না। ডাক্তার, টেস্ট, পুজো-যজ্ঞ অমুক-তমুক, সবই তো ঠিক আছে শ্রেয়ার, তাহলে?

'বুবাই তুমিও একবার টেস্ট করিয়ে নাও না।'

'আমি! আমি কেন?'

'প্রবলেম তোমারও তো থাকতে পারে, তাই না? ট্রিটমেন্ট করালে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি পুরোপুরি ফিট আছি। আমাকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। আমার শা-হ্ কপালটাই খারাপ।'

'একবার কিন্তু করে দেখাতে পারতে। আমাকেও তো এত কিছু করালে, কোনওটায় না বলেছি?'

'তুমি কি তার শোধ তুলতে চাইছ?'

'বোকার মতো কথা বোলো না তো, শোধের কী আছে, আমি সব চেক করিয়েছি, কোনও প্রবলেম নেই, এবার তুমিও একবার করে দেখবে। সিম্পল ব্যাপার।'

'আমি কনফার্ম আমি ঠিক আছি।'

'তাই? এতটা কনফার্ম হচ্ছ কী করে জানতে পারি?'

'মানে! কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আমি তো কিছু বলতে চাইছি না, তুমিই তো বলছ।'

'সবাইকে নিজের মতো ভেব না শ্রেয়া!'

'নিজের মতো!...মানে?'

'মানে তুমিই জানো।'

অনেকবার ভেবেছে শ্রেয়া...এবার ডিভোর্সটা করেই ফেলবে। আর পারা যাচ্ছে না। ইচ্ছে করে সারাদিন সারারাতও অফিসে কাজ করে কাটিয়ে দিতে। শংকরদাকে বলেওছিল বার কয়েক ওকে নাইটে করে দেওয়ার জন্য। শংকরদা জিভ বার করে উত্তর দিয়েছে 'পাগল না কি! তোর বিয়ে হয়েছে সবে বছর দুয়েক বোধহয়—এর মধ্যেই তোকে নাইটে পাঠিয়ে দিলে তোর

বর এসে আমাকে ঠ্যাঙাবে।'

ডির্ভোসের কথা ভাবলেই হুড়মুড় করে কতকগুলো মুখ চোখের সামনে চলে আসে। বাবা-মা-বোন, অস্বস্তিকর পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন। সে কী, কেন? কী করে হল? ওরা নিজেরা বিয়ে করেছিল না?...সত্যি আজকালকার...শাশুড়িও কম যায় না। সামনাসামনি যুদ্ধে না দাঁড়ালেও ঠারেঠোরে অবজ্ঞার মিসাইল ছোঁড়ে। পাড়ায় কারও বাচ্চা হলে সেই আলোচনায় বাড়ি মাত করে রাখে ক'দিন, শ্রেয়া চুপ থাকে। কিন্তু আর কত দিন? ভাবতে গেলে তালগোল পাকিয়ে যায় সব। তবে একটা ব্যাপার ও খুব ভালো বোঝে, ওর প্রেসে চাকরিটার জন্য ছেলে আর মা সবটা খাপ খুলতে সাহস পায় না। বুবাই মাঝে দু-একবার বলেছিল, 'তুমি বরং কাগজের চাকরিটা ছেড়ে দাও।'

'কেন?'

'কেন মানে...এমনিই।'

'এমনিই হঠাৎ ছেড়ে দেব!'

'বেটার কোথাও ট্রাই করো, এখানে তো মাইনেকড়ি খুব একটা দেয় না বলো।'

'এনভয়রনমেন্টটা তো ভালো, টাকাটাই সব নয়।'

'হুম।'

দুই

'কিনেছি, এই দেখো।' প্লাস্টিকের ব্যাগটা সামান্য ফাঁক করে দেখাল ব্যারি।

'কী?' বলে সামনে ঝুঁকল শ্রেয়া। প্লাস্টিকের ভেতরে একটা সস্তার বায়নাকুলার।

'আস্তে কথা বলো, কেউ জানতে না পারে' নিজের ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল ব্যারি।

'আচ্ছা, কিন্তু কেন?'

'এটার খুব দরকার ছিল আমার।' ফিসফিস করে বলল ব্যারি। উফ আবার নতুন খ্যাপামো, ভাবল শ্রেয়া। 'ও আচ্ছা, ভালো হয়েছে।' বলে কম্পিউটার স্ক্রিনে চোখ ফেরাল। ব্যারিকে একবার প্রশ্রয় দিলেই এখন রামায়ণ খুলে বসবে।

'তোমাকে একটা গিফ্‌ট দেওয়ার আছে।'

শ্রেয়া জানে গিফ্‌টটা কী ঠিক তাই। প্লাস্টিকে মোড়া কয়েকটা গাছের চারা। হাতে নিয়ে শ্রেয়া বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'এই অফিসে তুমিই সব থেকে ভালো। আমি আর কাউকে প্ল্যান্ট দেব না।' আহত গলায় বলল ব্যারি।

'কেন, কী হল?'

'রুকুদাকে সেদিন প্ল্যান্টগুলো দিলাম। বাড়ি নিয়ে যায়নি। অফিসেই ফেলে গেছে। সবক'টা প্ল্যান্ট মরে গেছে জানো।'

'ই-স।'

'বলো, কষ্ট হয় না?'

'হ্যাঁ! ঠিকই তো, আচ্ছা এবার থেকে তুমি শুধু আমাকেই প্ল্যান্ট দিও, কেমন!'

উত্তরে একগাল হাসল ব্যারি। 'এগুলো চন্দ্রমল্লিকা, আজই বাড়িতে গিয়ে টবে বসিয়ে দিও। আমি ক'দিন পর এসে তোমাকে ফার্টিলাইজার দিয়ে যাব। দেখবে সিজনে কী ভালো ফুল হবে। এত্ত বড় বড়।'

'আচ্ছা', বলে হাসল শ্রেয়া। ব্যারির দেওয়া চারগাছাগুলো শ্রেয়া বাড়ির ব্যালকনিতে টবে বসায়। এখনও একটা গাছেও ফুল আসেনি। ধরবে কি না তাও জানা নেই, তবে গতবছর যে চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলো দিয়েছিল সেগুলোতে সত্যিই খুব সুন্দর ফুল হয়েছিল। এগুলোর ধরবে কি না কে জানে, কোনও গ্যারান্টি নেই। তবু এত আন্তরিকভাবে দেয় লোকটা, ফেলে দিতে পারে না।

'তোমাকে আরও একটা জিনিস দেওয়ার আছে।'

'আরও! কী?'

ব্যারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে পকেট থেকে খুব সাবধানে একটা খাম বার করে শ্রেয়ার হাতে দিয়ে বলল। 'এক্ষুনি লুকিয়ে ফেলো। পরে পড়বে।'

'আচ্ছা', এতে আবার কী পাগলামো ভরা আছে কে জানে!

'আমি চলি', বলে হনহন করে চলে গেল ব্যারি।

শংকরদা টয়লেটে গিয়েছিল। বেরোবার সময় ব্যারিকে পিছন থেকে দেখে শ্রেয়াকে এসে জিগ্যেস করল, 'পাগলটা এসেছিল?'

'হুঁ।'

'আবার কী বলে?'

'কিস্যু না, ওই যেমন বকে যায়।'

'আবার চারা। উফ!'

'হ্যাঁ', হেসে ফেলল শ্রেয়া।

'ছেলেটাকে দেখলে কষ্ট হয়। কে যে খেল ওর মাথাটা, ব্যাটার কাজে যদি একটু সিনসিয়ারিটি থাকত না তাহলে ওকে ঢুকিয়ে নিতাম। কিন্তু...'

শ্রেয়া চুপ।

'তবে তোকে কিন্তু ওর বেশ পছন্দ। অফিসে এলে যত গল্প সব তোরসঙ্গেই। দেখিস বাবা, ওর কিন্তু বউ পালিয়েছে।'

'শংকরদা ইয়ার্কি মারবে না কিন্তু। ভালো হবে না।'

হাসতে হাসতে চলে গেল শংকরদা।

লাঞ্চ আওয়ারে নিজের ডেস্কে টিফিন খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়তে ড্রয়ার খুলে খামটা বার করল শ্রেয়া। দেখি তো কী আছে? ইংরেজিতে লেখা কিছু কাগজ। ব্যারির হাতের লেখাটা বেশ সুন্দর। আলগোছে চোখ বোলাতে থাকল ও। খানিকটা পড়েই বুঝতে পারল ব্যারির মতোই ভয়ংকর এলোমেলো অগোছালো লেখাটা। পড়ে পুরোটার মানে বুঝতে পারে কার সাধ্য। লেখাটা শুরু হয়েছে 'ইট ইজ হিয়ার বাই নোটিফাইড

টু...' নোটিশের কায়দায়। ফুল পাগলা একটা। পুরোটার সারমর্ম মোটামুটি এইরকম, ব্যারি একটা বায়নাকুলার কিনে ওর দাদার বাড়ির আশেপাশে ক'দিন ধরে হানা দিচ্ছে এবং বায়নাকুলারটা দিয়ে রাস্তা থেকে দাদার ঘরের ভেতর দেখেছে যে দাদা এবং ওর বউ একই ঘরে থাকে। বাচ্চাটাও। ব্যারির দাদা এখন ব্যারির বউকে নিজের বউয়ের মতোই ভালোবাসে। আর বাচ্চাটাও দাদাকে এখন বাবা বলে ডাকে। সেটা অবশ্য বায়নাকুলারে ও কী করে শুনতে পেল তা ব্যারিই জানে। চিঠির শেষে লেখা ও শিগগির এ ব্যাপারে আরও গোপন তথ্য বার করবে এবং তাই নিয়ে আদালতে মামলা করবে, যাতে ওর বউ এবং মেয়েকে ব্যারির কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কাম্য। শেষ পাতায় একটা ড্রয়িং। একজন লোক রাস্তায় এই ফুটে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে অপর ফুটে একটা দোতলা বাড়ির ঘরে একজন পুরুষ এবং মহিলাকে বায়নাকুলার দিয়ে দেখছে।

'ওহ্ গড!' মুখ থেকে বেরিয়ে এবং শ্রেয়ার।

'কী পড়ছ শ্রেয়াদি?' তমাল জিগ্যেস করল, জুনিয়র সাব এডিটর।

'ধুর কিছু না' বলে কাগজগুলো আবার খামে ভরে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলল শ্রেয়া।

সন্ধেবেলা আবার এসে হাজির ব্যারি। 'পড়েছ?'

'হুম।'

'কী বুঝলে?'

'যাহ্ বুঝলে না! আমি তো পুরো প্রুভ দিয়েছি যে দাদা আমার ওয়াইফ আর ডটারকে জোর করে নিয়ে গেছে। ওরা দুজনেই আমার কাছে ফিরে আসতে চায়। দাদা ফিরতে দিচ্ছে না।'

'এসব কে বলল তোমাকে?'

'আমি রিয়ালাইজ করেছি। আর ডিসাইডও করে ফেলেছি, এই

রাইটিংটা লিফলেট করে আমি দাদার পাড়ার সবাইকে ডিসট্রিবিউট করব। তাহলে সবাই জানতে পারবে। তুমি যদি একটু...'

'দেখো ব্যারি', ঘুরে বসল শ্রেয়া। 'এই সব তোমার ভুল ধারণা। তোমার ওয়াইফ চলে গেছে তার জন্য তুমি রেসপনসিবল। নিজেকে আগে ঠিক করো তাহলে হয়তো কখনও ফিরে আসলেও আসতে পারে।'

'কেন, আমি কি খারাপ লোক?'

'খারাপ তো বলছি না, কিন্তু তোমার এসব পাগলামো, কাজকম্ম না করে, নেশা ভাং, খাওয়াবে কী ওদের?'

'আমাকে কেউ কাজ না দিলে আমি কী করব?'

'সেটাও তোমার দোষে। তোমার কাজে কোনও সিনসিয়রিটি নেই। আসা-যাওয়ার রেগুলারিটি নেই। এগুলো যদি ঠিক পারো তাহলে তোমার এখানেই কিছু একটা...'

'তুমি কি আমার জন্য শংকরদাকে বলেছিলে?' চিকচিক করে উঠল ব্যারির চোখ।

'বলে কী হবে? তুমি দু-দিন আসবে তারপর আবার দু-মাস আসবে না। তখন কী হবে?' কথাগুলো একটু রুক্ষভাবেই বলল শ্রেয়া।

ব্যারি চুপসে গেল শ্রেয়ার আচমকা এমন কথায়। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ মাথা নীচু করে চলে গেল।

খারাপ লাগছিল শ্রেয়ার এভাবে বলতে। আর ওরই বা দরকার কী পরের ব্যাপারে অত ভাবনাচিন্তার। নিজের জ্বালাতেই...ধুস! কাজে মন দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল ও।...কিন্তু লোকটা আশ্চর্যভাবে নিজের বউকে এত ভালোবাসে! এত কিছুর পরেও!

'ঘরভর্তি কাদামাটি লেপছে, এটা কি ভালো হচ্ছে?' তোয়ালে পরে বেসিনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে কামাতে বলল বুবাই।

গতকাল রাতে কিনে আনা ব্যালকনিতে রাখা মাটির টবটায় মাটি

বসাচ্ছিল শ্রেয়া। আজকেই ভোরবেলায় উঠে নীচ থেকে লোক দিয়ে খানিকটা মাটি কাটিয়ে ওপরে এসেছে। ঝুরঝুরে আধভেজা মাটি ঘাঁটতে এত ভালো লাগে! মাটি বসানো হয়ে গেলে ব্যারির দেওয়া চারা দুটো বসাতে হবে। তারপর সামান্য জল...ভাবনাগুলো পরপর সাজাতে সাজাতে অন্যমনস্ক ছিল শ্রেয়া। আচমকা বুবাইয়ের তেতো কণ্ঠস্বরে চটকা ভাঙল। ঘুরে তাকাল বুবাইয়ের দিকে। 'কিছু বললে?'

'হ্যাঁ, বলছি সাতসকালে ঘরদোরগুলোয় কাদামাটি না লেপলে চলছিল না?'

'না গো। চলছিল না', হেসে বলল শ্রেয়া। কাজে মন দিল আবার।

গম্ভীর হয়ে গেল বুবাই। একটু চুপ থেকে আবার বাঁকা সুরে বলল, 'হঠাৎ গাছ-গাছড়ায় এত শখ দেখছি ক'দিন ধরে, আগে তো এসব দেখিনি।'

শ্রেয়া চুপ। চারা দুটো টবে বসাল। ঝিমিয়ে আছে। শ্রেয়া বিড়বিড় করে বলল, 'এই তো বিকেলের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবি দুজনেই।'

'তোমার কি কথার উত্তর দিতে কষ্ট হয়?'

'কী হল আবার?'

'কোনও কথা কেউ জিগ্যেস করলে তার উত্তর দিতে হয়, শেখোনি?'

'বলো কী বলছ?' শ্রেয়া পরম উপেক্ষায় বলল।

'বলছি গাছগুলো কি নিজেই জোগাড় করছ না কেউ সাপ্লাই দিচ্ছে?'

'দিচ্ছে' নির্লিপ্ত গলায় বলল শ্রেয়া।

'কে সে?'

'তুমি চেনো না।'

'তবু শুনি', রেজার চালানো থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বুবাই।

হাসি পেল শ্রেয়ার পুরুষমানুষদের চিরকালের স্বভাব দেখে। 'যাকে চেন না আমি নাম বললেও চিনবে না, তাই না।' বলে বুবাইয়ের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল ও। বুবাই খপ করে শ্রেয়ার হাতটা পিছন থেকে ধরল। শাশুড়ি বাথরুমে স্নানে গিয়েছিল। বেরিয়ে গতিক সুবিধার না দেখে

অন্যমনস্কের ভান করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। শ্রেয়া জানে একপেট আনন্দ নিয়েই ঘরে ঢুকলেন মহিলা।

'তা পিসটি কে শুনি? ছেলে না মেয়ে?' চিবিয়ে বলল বুবাই।

'শুনে তোমার কী লাভ? হাতটা ছাড়ো। সকালবেলাতে বস্তির সিনটা না-ই বা করলে।'

'বুঝেছি। পিরিত মারানো হচ্ছে। ভালো ভালো...তা হিরোকে একবার বোলো এসব নকল চারাগাছ আর না দিয়ে একটা আসল চারাগাছ যদি তোমার পেটে গিফ্‌ট করতে পারে তালে বুঝব পিরিতের দম আছে।'

অদ্ভুত স্থিরভাবে বুবাইয়ের দিকে তাকাল শ্রেয়া। তারপর নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সটান বাথরুমে ঢুকে মুখভর্তি জমে ওঠা ফ্যানা থুতুর দলাটাকে থক করে বেসিনে ফেলল। মাথার ভেতরটায় অসহ্য ঝিঁঝি পোকার শব্দ হচ্ছে। কান ফাটানো শব্দটা গোটা শরীরে ছড়াচ্ছে দ্রুত। শাওয়ার খুলে দিল ও। আপ্রাণ ভিজতে চেষ্টা করল।

তিন

'চা খাননি ম্যাডাম?' কাপ ফেরত নিতে এসে বলল বিমল।

'উঁ...না খাব না, নিয়ে যাও।'

'আরেক কাপ এনে দিই?'

'না, না নিয়ে যাও', গায়ে পাক দিয়ে উঠছে বার বার, সকালে বুবাইয়ের কথাগুলো মনে পড়লেই এমন একটা কিছু হচ্ছে গোটা শরীর আত্মা মন জুড়ে, অসম্ভব তীব্র জ্বালা জ্বালা, ভীষণ একটা কিছু এই মুহূর্তে করে ফেললে যেন এর যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পরশুর সাপ্লিমেন্টের চারটে পেজ ছাড়তে হবে আজই, সারাটা দিন কম্পিউটারের সামনে স্রেফ বসে রইল শ্রেয়া। একটা পেজও কমপ্লিট হয়নি অথচ তার জন্য একটুও টেনশন হচ্ছে না। কেমন যেন একটা ঘোর...। লাঞ্চও করল

না। শংকরদা এসেছিল এদিকে একবার। 'কী রে চুপচাপ বসে আছিস কেন? দেখ বাইরে কেমন মেঘ করেছে, বৃষ্টি হবে বোধহয়। আজকে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করিস হাজব্যান্ডের সঙ্গে।'

শ্রেয়া উত্তর দেয়নি। স্থির চুপ।

বিকেল চারটে নাগাদ হঠাৎ ব্যারি এল। চোখ-মুখ টকটকে লাল, চুল উসকোখুসকো। ঠোঁটের কোণে ফোলা রক্ত জমে রয়েছে। পুরোনো শার্টটার বুক পকেট আর দুটো বোতাম ছেঁড়া। রুকুদা দেখতে পেয়ে বলল, 'হেই ব্যারি, হোয়াট হ্যাপেন্ড?'

'নো, নাথিং সিরিয়াস' বলে শ্রেয়ার পাশের চেয়ারটায় এলিয়ে বসে পড়ল। রুকুদা বলল, 'ব্যারি, আজ কিন্তু শ্রেয়াকে ডিসটার্ব কোরো না। ওর শরীর ভালো নেই', ব্যারি রুকুদার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল একটুক্ষণ, তারপর শ্রেয়ার দিকে তাকাল বোকার মতো। শ্রেয়া একদৃষ্টে স্ক্রিন সেভারের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ এক ঝটকায় ফিরে তাকাল ব্যারির দিকে। 'আচ্ছা ব্যারি এই যে তুমি অফিসে আমার কাছে এতবার করে আস, কই আমাকে কখনও তোমার বাড়িতে এক কাপ কফি খাবার জন্য ডাকো না, কেন?' আচমকা এমন একটা প্রশ্নে বেজায় ঘাবড়ে গেল ব্যারি। আমতা আমতা করতে থাকল।

'কী হল বলো, কেন যেতে বলো না?'

'না-না, মানে আমার ঘরে তো কেউ...ইয়ে...'

'কেন, তুমি থাক না? তুমি পারো না চা বানাতে?'

'হ্যাঁ, মানে...'

'আমি আজকে ইভিনিংয়ে তোমার বাড়িতে যেতে চাই। নিয়ে যাবে কি না বলো?'

সপাটে পরিষ্কার গলায় জিগ্যেস করল শ্রেয়া, সারাটাদিন পর।

'আ-জ...উঁ...আজই...এখন তো...'

'হ্যাঁ আজ, বিকেল পাঁচটার পর, ইয়েস, অর নো। কি, নিয়ে যেতে চাও না, তাই তো?—এক গ্লাস জলও কি তোমার বাড়িতে খাওয়াতে

পারবে না আমাকে?'

'ওহ্ ডিয়ার প্লিজ চলো, আমি সেভাবে—আসলে আমি...মানে একা তো ঘরটা ...কেউ তো নেই...'

'ডাজ নট ম্যাটার, তোমার অ্যাড্রেসটা লিখে দিয়ে যাও। গিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করো। আমি সন্ধেবেলা যাচ্ছি। ভালো চা বানাতে হবে কিন্তু। উইথ নিমকি বিস্কিট, ওকে?' নিজের বলে যাওয়া কথাগুলো নিজের ভেতরেই ঢুকছিল না শ্রেয়ার। শরীরের বাইরেই ধাক্কা খাচ্ছিল। ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হচ্ছিল শব্দগুলোর আঘাতে। ব্যারি একটা কাগজে অ্যাড্রেসটা লিখে 'প্লিজ কাম' কথাটাও লিখে দিয়ে 'বাই' বলে উঠে চলে গেল হন্তদন্ত হয়ে। কিছুক্ষণ সময় পার করে শ্রেয়াও উঠল। মনিটর অফ করতে গিয়ে দেখল ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখের কোণে রক্ত জমে রয়েছে। বেখেয়ালে নখ কাটতে কাটতে চামড়াও খেয়ে ফেলেছে কখন। আশ্চর্য জ্বালা করছে না একটুও।

এসপ্ল্যানেডের মোড়ের কাছে শ্রেয়াদের অফিস থেকে ট্যাক্সিতে লেনিন সরণি হয়ে রয়েড স্ট্রিটে পৌঁছোতে বেশিক্ষণ লাগে না। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চোদ্দো নম্বর রয়েড স্ট্রিটের সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল শ্রেয়া। চারপাশটা স্বপ্নের মতো আলগা, ভারহীন, মাথার ভেতর যেন কিছুই স্পর্শ করছে না। শুধু এক আশ্চর্য জ্বালা ছাড়া। সে জ্বালার প্রকট অনুভূতি নেই, কিন্তু বোধ আছে।

জায়গাটা ঘিঞ্জি, মুসলিমদের ঘরদোরই বেশি। একটা চপের দোকানের পাশ দিয়ে সরু গলি। গলির মুখেই একটা ল্যাংটো বাচ্চা হামা টানছে। বাচ্চাটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ও। গলির শেষে বাঁদিকে একটা কাঠের দরজা। খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকল, আবছা অন্ধকার ভেতরটায়। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। প্রথম সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে একমুহূর্ত থামল। ওপর থেকে একটা ছেলে হুড়মুড় করে নেমে আসছে। শ্রেয়ার

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আপাদমস্তক মেপে গেল ওকে বিচ্ছিরিভাবে।

দোতলায় উঠতেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল ব্যারি। 'কাম-কাম, দিস ইজ দ্য রুম।' ব্যারি একটা পরিষ্কার জামা-প্যান্ট পরেছে। ঘরটায় ঢুকল শ্রেয়া। কেরোসিন তেলের গন্ধে ঘরভর্তি। দেখলেই বোঝা যায় নোংরা ঘরকে খুব তাড়াতাড়ি পরিচ্ছন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তক্তপোশে একটা সাদা চাদর পাতা, একটা দিক ঢাউস উঁচু। ওর নীচেই নিশ্চয়ই নোংরা বালিশ, চাদরগুলো ঢাকা দেওয়া আছে। ঘরের এক কোণে পাম্প স্টোভ, কেরোসিনের বোতল, কাপ-ডিশ, চা পাতা-চিনির কৌটো, আর পাশে ভাতের হাঁড়ি, জলের কুঁজো। শ্রেয়া বসল তক্তপোশে, ব্যারি কী করবে বুঝতে পারছি না। 'অ্যাকচুয়্যালি একা থাকি তো, পুরোনো বাড়িটা তো ছেড়ে দিয়েছি, এখানে একাই থাকি। রেন্টেড। রুমটা ডার্টি, তোমার খারাপ লাগছে জানি...'

'চুপ করে বসো তো, আমার খারাপ লাগছে না, একটু জল খাওয়াও আমাকে।'

'ওহ্ শিওর।' কুঁজো কাত করে গ্লাসে জল ঢালতে গিয়ে নার্ভাস ব্যারি খানিকটা জল মাটিতেও ফেলল। জল খেয়ে গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখল শ্রেয়া। ঘরে একটাই ফ্রেমে বাঁধানো বহু পুরোনো যিশুখ্রিস্টের ফটো। শান্ত দৃষ্টিতে শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে। অন্য দিকে চোখ সরাল শ্রেয়া। ব্রিজের ওপর দিয়ে মাঝরাতে মেল ট্রেন অতি দ্রুত চলে যেতে থাকলে যেমন শব্দ হয় চরাচর জুড়ে তেমনি শব্দ হচ্ছিল শ্রেয়ার বুক জুড়ে। বড় বড় শ্বাস ছাড়তে থাকল ও। 'উ-ফ!'

'তোমার গরম লাগছে শ্রেয়া। আসলে ঘরের এই জানলাটা খোলা যাবে না। খুললেই খুব বাজে গলা আসবে নীচে থেকে।'

'ঠিক আছে। তুমি বরং টেবিলফ্যানটার স্পিড আর একটু বাড়িয়ে দাও।'

'সরি। ওটা আর বাড়ে না। আমি চা বানাই তাহলে?'

'উঁ...'

'বানাই চা?'

'হ্যাঁ বানাও।' আহ্-হ্ এত শব্দ কেন শরীর জুড়ে! ব্যারির কথাগুলো যেন বহু দূর থেকে আসছে। ব্যারি মেঝেতে উবু হয়ে বসে স্টোভ জ্বালাল। শ্রেয়া তাকাল লোকটার দিকে, মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল, এলোমেলো, সরল শিশুর মতো দুটো চোখ মেলে একমনে কাজে ব্যস্ত। ছুঁচলো চিবুকের কাছে কাঁচাপাকা দাড়ি। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল আর নিজের অজান্তেই বিছানার চাদর খামচে ধরছিল একটু একটু করে। তোমার ঠোঁটের ওখানে কী হয়েছে ব্যারি?'

ব্যারি চুপ।

'কী হয়েছে।'

ব্যারি চিকচিকে দু-চোখ তুলে বলল, 'আমাকে মেরেছে।'

'মেরেছে! কে? কেন মেরেছে?

'দাদা। আরও কয়েকজন ছিল সঙ্গে।'

'কেন, কী করেছিলে তুমি? এদিকে এসো আমার কাছে।'

ব্যারি উঠে এল।

'বোসো আমার পাশে। কী হয়েছিল?'

'আজ সকালে আমি বায়নাকুলারটা দিয়ে দাদার বাড়ির সামনে গিয়ে আমার ওয়াইফ আর ডটারকে ওয়াচ করছিলাম, দাদা দেখতে পেয়ে আমাকে এসে মারল, আরও অনেকে মারল জানো বাট...বাট...'

'কীসের...কিন্তু?'

'আমার ওয়াইফ কিন্তু এল না আমাকে সেভ করতে! ও জানলা থেকে দেখছিল আমায়—তারপর সরে গেল...'

'ইশ ঠোঁটের পাশটায় তো কেটে গেছে ব্যারি। মেডিসিন কিছু লাগিয়েছ?'

'না। তুমি আমাকে লাইক করো, তাই আমার উন্ড দেখতে পেলে। সারাদিন আর কেউ দেখেনি জানো।'

'ইশ কতটা কেটে গেছে। ঘরে কোনও অ্যান্টিসেপটিক আছে?'

'না।'

'এখানে বোসো আমার পাশে।' বলে হাতটা আস্তে আস্তে বাড়াল শ্রেয়া ব্যারির ঠোঁটের দিকে।...কিন্তু অনন্তকাল যেন কেটে যেতে থাকল সে হাত পৌঁছোতে। এত দেরি কেন? এত দূরে কেন? চারদিকে সব কিছু ঘন কুয়াশার মতো ঝাপসা। সামনের কিছুই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। অবশ ঘোরের মধ্যে প্রাণপণে হাতটা বাড়াতেই থাকে শ্রেয়া। পৌঁছোয় না, কিছুতেই পৌঁছোতে পারে না আঙুলগুলো।

'বাট-বাট-আই-স্টিল বিলিভ মাই ওয়াইফ লাভস মি। ইয়েস, আই নো—আমার ওয়াইফের খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে সেভ করার, কিন্তু নিশ্চয়ই ঘরের দরজা দাদা বাইরে থেকে লক করে রেখেছিল বলে ও আসতে পারেনি। আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছিল বলে ও জানলা থেকে সরে গিয়েছিল' বকে চলেছিল ব্যারি আপনমনে শ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে। বলতে বলতেই 'ওফ শিট' বলে উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে গেল, সসপ্যানে টগবগ করে ফুটে উপচে ওঠা জলটাকে শান্ত করতে।

আমার সময়
ডিসেম্বর ২০০৯

ডানাকাটা পরি

আমি পরি নামাতে পারি। মন্ত্র আছে আমার কাছে। রোজ রাত্রে আমার ডাকে পরি আসে। যাকে চাই সেই-ই আসে। মন্ত্রটা অসংখ্য লাল-নীল কাগজে লেখা। কাগজগুলো সবসময় আমার সঙ্গে রাখি। এক এক পরির এক এক মন্ত্র। যে পরি আসে সে সারারাত আমার কাছে থেকে তার মন্ত্রলেখা কাগজ নিয়ে চলে যায়। তাতে আমার মন্ত্রভাণ্ডার এতটুকু কম পড়ে না। আমার কাছে অমন অজস্র আছে। নিযুত কোটি...আমি ঠিক নিজেও জানি না কত। আমার ঘরে বসে রাত্রে আমি মন্ত্রোচ্চারণ করি আর তারা এসে যায়। তারা এই শহরেব ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে কেউ জানালা দিয়ে আমার ঘরে ঢোকে, কেউ বা দরজা দিয়ে। তাদের এক এক জনের এক এক মাপের ডানা। কারও বড়, কারও মাঝারি, কারও বা ছোট। কেউ কাছাকাছি থাকে, কেউ বা আসে বেশ দূর থেকে। তারা প্রত্যেকে আমায় শ্রদ্ধা করে, ভয় পায়। আমি সব পারি এই মন্ত্রের জোরে। যা চাই স-ও-ব।

ওদের কেউ গান গায়, কেউ নাচ দেখায়, আবার কেউ বাঁশি বাজিয়ে শোনায় আমাকে। আমি জানি ওরা সবাই ভালোবাসার ভান করে শিখে নিতে চায় আমার মন্ত্র জানার উপায়। উঁহু সেটি হচ্ছে না! সে ব্যাপারে আমি সাংঘাতিক সেয়ানা। ওদের মধ্যে অনেককেই আমার বেশ ভালোই লাগে, তবে একসময় প্রিয় পরি ছিল লিলি। এটাও ওর আসল নাম কি না জানি না। তবে এই নামটা ভালো লাগত বলে ওকে এ নামেই ডাকতাম। কোনও এক দেবতার সভায় রোজ সন্ধেয় নাচ-গান করে আনন্দ দিত। তো আমি মাঝেমধ্যেই লিলিকে ডাকতাম। যদিও এক পরি আমার দ্বিতীয় বার পছন্দ নয়, তবু কেন যে ওকে বার বার ডাকতাম! লিলির গায়ের চামড়া থেকে অদ্ভুত একটা ঘাস ঘাস গন্ধ বের হত। শীতের বিকেলের মস্ত মাঠে একা চুপচাপ দাঁড়ালে হিমে ভেজা মাঠের থেকে যেমন একটা গন্ধ পাওয়া যায় ঠিক সেইরকম গন্ধ। তবে লিলির জিভে মাখানো লালাতে অন্যান্য পরির মতোই একইরকম স্বাদ ছিল। এই কারণটা আমি বুঝি না, সব পরির কী একইরকম লালা নিঃসৃত হয় জিভে? সবসময়ই কি আমার মতো দেবতাদের সান্নিধ্যে থাকার সময়? ওর বাড়ি ছিল...নাহ্ জায়গার নামটা আর মনে নেই। তবে মফস্‌সল। আমি সবুজ ডিম লাইট জ্বালিয়ে সুরাপাত্রে চুমুক দিতাম আলস্যে। আর ও আমার চোদ্দোশো স্কোয়ার ফিটের একাকী ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে গান গাইত। আমি আনন্দ পেলে মন্ত্র ছেটাতাম ওর গোটা শরীরে। ও আবেগে শিউরে শিউরে উঠত সেই মন্ত্র-স্পর্শে। সপাটে জড়িয়ে ধরত আমাকে। ওর ঘাসের গন্ধ মাখা, চামড়া ঢাকা শরীর দিয়ে। আমার তখন ওই গন্ধে আরও ঘন নেশা হয়ে যেত।

অন্য সব পরির ডানার রং ছিল সোনালি, রুপোলি, লাল-নীল-গোলাপি। একমাত্র লিলির ডানা ছিল ঘন সবুজ রঙের। এর কারণ ওকে জিগ্যেস করলে ও হেসে উত্তর দিত, 'জানি না। আমার জঙ্গল ভালো লাগে।' ডানা ঝাপটে যখন বসত আমার পাশে তখন দু-একটা পালক খসে পড়লে আমি দেখেছি ওগুলো অবিকল গাছের পাতার মতো। অবশ্য পরিরা যখন ফিরে যায় কিচ্ছু ফেলে যায় না। একটা পালকও নয়। এটাই ওদের দস্তুর। ঘন সবুজ রং আমার সব চেয়ে প্রিয়, সেই ছোটবেলা থেকে। ছেলেবেলার স্মৃতি যদিও আমার কাছে অনেকটা ঝাপসা। তবু টুকরো ছবির মতো মনে

পড়ে গ্রামের কথা। গ্রামের শেষ মাথায় আমার খড়চালার বাড়ির কথা। বাড়ির পিছনে দাঁড়ালেই হু-হু সবুজ মাঠ, ধানখেত। হাওয়া বইলে ধানগাছের ঝিনঝিন শব্দ। হাওয়ার রংও যে সবুজ হয়, গন্ধও যে সবুজ রঙা হতে পারে সেই ছোটবেলায় দেখতে পেরেছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম আমি। বাবা-মা-দিদি-আমি-আমার শৈশব-কৈশোরের বন্ধুরা...সবাই যেন সবুজ সবুজ রঙের দেখতে ছিল। ইশকুলের মাস্টারমশাই আমার ছবি আঁকার খাতা টেনে নিয়ে হো হো করে হেসে বলত, 'গাছও সবুজ, গরুও সবুজ, আকাশও সবুজ! করেছিস কী?' কিন্তু কী করব, আমি যে ওই রংই দেখতে পেলাম সব কিছুতে। সত্যি কথা বলতে মাস্টার মশাইয়ের হো হো হাসিটাও তখন সবুজ রঙের দেখতে লাগত। পড়াশোনায় খুব মাথা ছিল আমার। ইশকুলে বরাবর ভালো রেজাল্ট। স্কুল পাশের পর কলেজে ভর্তি হয়ে কলকাতায় মেসে থাকতে শুরু করলাম। আমার নতুন জীবনের প্রসূতি ঘর ওই মেসে। চোখের সবুজ রং একটু একটু করে ঘষটাতে শুরু করল তখন থেকে। কলেজের মেসের বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধ-নিষিদ্ধ অনেক জায়গায় যেতে যেতে ঘুরতে ঘুরতে চোখের রং পালটাতে শুরু করে দিল দ্রুত। গ্রামের আলো নিজেকে দেখায় না, দেখতে দেয় সব কিছুকে। শহরের আলো শুধু নিজেকেই দেখায়। তীব্রতা মন কাড়ে তাড়াতাড়ি। নিজের গ্রামের বাড়িতে আর ফিরতে ইচ্ছে করত না। টান কমছিল। তবে এত কিছুতেও পড়াশোনা থেকে মন সরাইনি কিছুতেই। একটা জিনিস খুব ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে, এশহরে একদিন আমি শুধু টিকে থাকব না, দাপিয়ে বেড়াব, তার জন্যে ভিত চাই, ভিত। কলেজেও ভালোভাবে পাশ করে আর ঘরে ফিরে যাইনি। দু-চার জায়গায় কিছুদিন টুকটাক চাকরি করতে করতে বড় একটা জায়গায় লেগে গেল। তারপর নিজের এই দুই মুঠি আর মাথাটাকে প্রাণপণ খাটিয়ে চড়চড় করে ওপরে উঠতে উঠতে একেবারে শহরের দক্ষিণে একটা বারোতলা ফ্ল্যাটের সবচেয়ে টপ ফ্লোরের চোদ্দোশো স্কোয়্যার ফিট পুরো আমার। ব্যালকনি থেকে নীচে তাকালে অনেক দূরের কোনও গ্রহের দিকে তাকিয়েছি মনে হয়। মানুষগুলোকে সুড়সুড়ি পিঁপড়ের মতো দেখতে লাগে। দারুণ মজা হয়!

আমার ইতিহাস আমাকে খুব বেশি দূর তাড়া করতে পারেনি। এত

দ্রুত গতি আমার। সে কিছু দূর পর্যন্ত আমার পিছনে দৌড়ে হাঁপিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। আমি তাকে ফেলে অনেক অ-নে-ক এগিয়ে গেছি। পিছনে তাকালে কাউকে দেখতে পাই না। ভাগ্যিস!

আমার আসলে মনে হত লিলির সঙ্গে আমার কোথাও খানিকটা মিল আছে। ভালোবাসার অন্যতম ছুতোই হল মিল খোঁজা। সেজন্যই কি? লিলিও কি মিল খুঁজত? ঠিক জানি না, বুঝি না। লিলিকে আমি কখনও আহ্লাদে জিগ্যেস করে ফেলেছি ওর পুরোনো ফেলে আসা কথা। আর প্রতিবারই ও এক এক রকমের ইতিহাস বলেছে নিজেকে, যার কোনওটার সঙ্গে আগেরটার মিল নেই। সবটাই বানানো এবং সুখের। আমি ধরে ফেলতাম মনে মনে। কিন্তু বলতে বাধা দিতাম না ওকে। কেমন ঘোরের মধ্যে ও বলে যেত, ওর শৈশব-কৈশোর-ভিটে...জন্মদাগ...তবে প্রতিটি গল্পে ওর পুরোনো বাড়ির জায়গার নাম, ভাই-বোনের সংখ্যা পালটে গেলেও বাড়ির পাশে একটা মস্ত জঙ্গল ঠিক থাকত। সেটা হয়তো সত্যিই। 'আমার বাড়ির ঠিক পাশেই একটা বি-শা-ল জঙ্গল ছিল' দু-হাত টান করে ছড়িয়ে চোখ বড় করে আপ্রাণ বিশালত্ব বোঝাতে চাইত লিলি। তা হলে শুধু একমাত্র জঙ্গল ছাড়া বাকি সব কথা কি ওর স্রেফ মিথ্যে? হয়তো ঠিক মিথ্যে নয়, ওগুলো ওর স্বপ্ন-কথা। স্বপ্ন কি মিথ্যে না সত্যি? মানুষ যা পেয়েছে সেটাই কি একমাত্র সত্যি আর যা আজীবন চেয়েছে সেটা কি সত্যি নয়?

যাই হোক লিলির ইতিহাস জানার থেকে ওর ভূগোলের প্রতিই স্বাভাবিকভাবে আমার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি। এভাবেই চলতে চলতে জানি না কীভাবে কখন প্রেমে পড়ে গেলাম। ওর গন্ধটা...কিংবা ডানার রং...না কি সেই মিথ্যে গল্পের জন্যে...কে জানে? প্রেমই বলব অবশ্য। নইলে রোজ রোজ হরেক কিসিমের পরি নামানোর মন্ত্র জানা সত্ত্বেও আমি কী করে একদিন পানপাত্রে একটি চুমুকও না দিয়ে ওর হাতের আঙুলে আঙুল রেখে বলে ফেলেছিলাম 'থাকবে?'

লিলি ওই শব্দ শোনা মাত্র দুই ডানা মেলে উড়ে গিয়েছিল। তারপর আমি অনেক এই সভা, ওই সভায় খোঁজ করেছি ওর, পাইনি। সারারাত ধরে প্রচণ্ড জেদে, ক্রোধে আমার সমস্ত মন্ত্র ঢেলে ডেকেছি ওকে। কাজ

হয়নি মন্ত্রে। অবাক হয়েছি নিজের পরমপ্রিয় মন্ত্রের অক্ষমতায়। কোথাও কি আনন্দও পেয়েছি মন্ত্রের অসহায়তা দেখে?...মনে পড়ে না।

অনেক সময় পার হয়ে গেছে তার পর। অন্য সব পরিদের কাছে ভাসাভাসা খবর পেয়েছি লিলির। আমার সঙ্গে না থাকলেও লিলি থাকে। অন্য একজনের সঙ্গে। বিয়ে হয়েছে লিলির। ঠিক দুঃখ কিংবা রাগ অথবা বিস্ময় কিছুই হয়নি সেকথা শুনে। লিলিকে ছাড়াই পার করছিলাম আমার জীবন। তারপর হঠাৎই একদিন ওকে দেখতে পেয়ে গেলাম গড়িয়াহাটে একটা জুতোর দোকানে। বাচ্চাদের জুতো পছন্দ করছিল। ওর কোলে ছোট্ট একটা শিশু। আর সঙ্গে রোগাটে, লম্পাপানা টিপিক্যাল ছাপোষা প্যাটার্নের কালচে রঙের বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। বুঝে গিয়েছিলাম লিলির সঙ্গে ও কে। আর আবাক হয়ে গিয়েছিলাম লিলির পিঠের সেই সবুজ ডানা দুটো নেই দেখে। একটুও নেই। কেটে ফেলেছে, নাকি খসে গেছে? একেবারে মেয়েদের মতো তেল চকচকে চাঁছাপোঁছা পিঠ। আমি ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি বুঝতে পেরে লিলি একবারের জন্যে স্রেফ আলগোছে আমার দিকে দৃষ্টি ফেলেছিল। চিনতে পারেনি। আমি বুঝেছিলাম ও সত্যি সত্যিই চিনতে পারেনি। কিন্তু ওকে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল আগের থেকে। কোলের বাচ্চাটা যখন এমনি এমনি হঠাৎ হেসে উঠছিল তখন অদ্ভুত এক আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল লিলির শরীর থেকে। সুন্দর! ডানাকাটা পরি...উঁ...ডানাকাটা বউ পরি...নাহ্ মা পরি...ধ্যাস!

আমার অন্যান্য সব পরি জানিয়েছিল লিলির বর আর্টিস্ট, ছবি আঁকে। তবে রোজগারপাতি তেমন কিছু নয়। কোনওমতে চলে আর কি। লিলির পুরোনো পরি-জীবন কি সে লোক জানে? তার উত্তরে পরিরা বলেছিল, তাদের সেকথা জানা নেই। কিন্তু আগের সেই সুখের, প্রাচুর্যের জীবন ছেড়ে কীসের জোরে ওই চ্যাটচ্যাটে একঘেয়ে জীবনে চলে গেল লিলি? লোকটাকে দেখলেই মনে হয় গায়ে সবসময়ে ঘামের দুর্গন্ধ, নির্লোম শরীর, হাত-পায়ের নখে কালো ময়লা, ফাটা গোড়ালি, সস্তায় জাঙ্গিয়া পরে। দু-এক জায়গায় ছেঁড়া এবং সেটা নিজে কখনওই কাচে না। লিলিকে কাচতে হয়। এসব ভেবে আমি আরও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—'কেন-ও?' স্রেফ এই উত্তরটা জানার জন্যে লিলিকে আমি তারপর আবার বহুবার মন্ত্রে

ডেকেছি এবং সে একবারও আসেনি। অনেক দিন আগে আমি একবার ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'তুমি খুব ভালো আছো তাই না? ডানায় ভর করে যেখানে ইচ্ছে খুশি ঘুরে বেড়াও। কোথাও ফিরে আসার দায় নেই।' শুনে হেসেছিল ও। আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলেছিল, 'জানি না ভালো আছি কি খারাপ আছি। তবে একদিন নিশ্চয়ই নিজের মতো থাকব। আর ফেরার দায়ের কথা বলছ, ফিরে আসার দায় যে কত সুখের, যাদের ফেরার কোথাও নেই তারা বোঝে।'

বড় অদ্ভুত ঠেকেছিল ওর কথাগুলো। ভালোও নয়, খারাপও নয় নিজের মতো থাকা। সেটা কেমন ধরনের? কতটা সুখের? কথাটাকে ভুলে যাওয়ার জন্যে একা রেখে দিয়ে আমি রোজ আরও আরও পরি নামাতাম। আমার ভালো থাকার একক জগতে ফিরে গিয়েছিলাম। অজস্র ডানাওয়ালা পরি ভিড় করত আমার কাছে। কিন্তু তাদের শরীরে সব নকল ফুলের গন্ধ। ওদের খোলা গায়ে প্রাণপণে নাক ঘষে আমি এতটুকু ঘাসের গন্ধ পেতাম না। ক্রোধে দূর করে দিতাম ওদের। আবার ডাকতাম, আবার তাড়িয়ে দিতাম ঘৃণায়।

আর এর মধ্যেই চুপিসারে বয়েস কখন হুড়মুড় করে ঝুঁকতে শুরু করেছিল আমার দিকে। আমার মন্ত্রের ভাণ্ডার আরও ফুলেফেঁপে উঠতে থাকলেও মন্ত্র উচ্চারণ করতে গেলে জিভ জড়িয়ে যেত, আলস্য আর অচেনা ভয় জড়িয়ে থাকতে শুরু করল আমাকে। সেই ভয়টাও আমার মতোই একা। আমার মতোই ভিতু, কোণঠাসা। কিচ্ছু ভালো লাগত না আমার। ভুঁড়ি, চোখের কোল, দৃষ্টি, হাঁটাচলা স-ও-ব ঢিলে আর নতমুখী হয়ে উঠছিল। চোদ্দোশো স্কোয়্যার ফিটের পুরোটা আর আগের মতো 'আমি'-তে ভর্তি হচ্ছিল না। গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম। মেঝেতে সারারাত পা ঠুকে ঠুকে দুমদুম শব্দ করে হাঁটতাম। 'আমি আছি' এই প্রমাণ করার জন্যে। লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতাম, 'আমি রয়েছি' জানানোর জন্যে। মানুষের আসল ভয়টা হল মৃত্যুভয়। আমার মধ্যে কেঁচোর মতো নিঃশব্দে গর্ত খুঁড়ে ঢুকতে শুরু করেছিল সে। কোঁকড়ানো কেন্নোর মতো হয়ে উঠেছিল আমার আত্মা। চোখের সামনে সবকিছুর রং ফ্যাকাশে আর একইরকম মনে হত। ঘুম হত না কোনওদিনই। কড়া ঘুমের ওষুধ

খেতাম। আচমকা একদিন স্বপ্নে দেখলাম একটা বিস্তৃত সবুজ আকাশের মধ্যে দিয়ে উড়ছি। শোঁ-ও শোঁ-ও শব্দ হচ্ছে আমার উড়ানে। উড়তে উড়তে পাশে তাকিয়ে দেখি একটি মেয়েও আমার সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে। মুখটা দেখতে পেতাম না। অস্পষ্ট ঘষা ঘষা। বার বার চিনতে, ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিছুতেই পারছিলাম না। উদ্বেগে ঘুম ভেঙে উঠে বসতেই এতদিন পর হঠাৎ লিলির কথা মনে এল। আবার খুব ইচ্ছে হল ওর সঙ্গে কথা বলতে। আর ওর গায়ের সেই গন্ধটা...সেই অদ্ভুত গন্ধটা একবারের জন্যে প্রাণপণে নিতে। আমি আমার সর্বস্ব ঢেলে দিনরাত এক করে ডাকতে থাকলাম ওকে। জানতাম ও আসবে না। তবু ডাকতে ডাকতে আমার গলা বসে গেল। এল না। খুব আনন্দ হচ্ছিল আমার। কেন কে জানে! কিন্তু আমি থামতেই আচমকা ও এল। আমাকে অবাক করে দিয়ে, নিরাশ করে দিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে বুক ঘষটে কোনও মতে হিঁচড়ে ঘরে ঢুকল আমার, বহুকাল পরে। অপুষ্টির আলগা থলথলে চেহারা, অনেক দিনের অনভ্যস্ত রং মাখা দুই গাল, ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক, ঝলমলে বেমানান শাড়ি আর ব্লাউজের ভিতর ঢিলে দুই বুক নিয়ে আমার ঘরে এসে এমনভাবে হাঁ করে হাঁফাতে থাকল যেন পৃথিবীর সব অক্সিজেন এই মুহূর্তে ওর চাই। বললাম 'বসো।' ও বসল সোফাতে, টেবিলের জলের বোতল তুলে অনেকটা জল খেয়ে চোখ বুজে বসে রইল কিছুক্ষণ। ডিম লাইটে ওর আঁচল সরে যাওয়া খোলা স্ফীত পেটটা দেখে ক্লান্ত ব্যাঙের মতো মনে হচ্ছিল। সরাসরি জিগ্যেস করলাম 'এলে যে?'

'তুমিই তো ডাকলে।' হাসল লিলি। কালচে ছোপ পড়া দাঁত, পান খায় এখন!

'আবার আসছ তাহলে আজকাল?' গলায় ঘৃণা মিশিয়ে বললাম আমি।

'হ্যাঁ-এ-হ্যাঁ-হ' হাই তুলল ও। ঠোঁট চেটে হেসে বলল, 'আমি তো ভাবলাম তুমি বুঝি ভুলেই গেছ আমাকে।'

ভুলতে পারলে খুব ভালো হত বিশ্বাস করো। না বলে চুপ থাকলাম। জানতে ইচ্ছে করছিল, তোমার গায়ের সেই গন্ধটা আছে এখনও?

বললাম, 'তোমাকে একেবারে লোমওঠা ধ্যাসড়ানো সস্তার পরিদের মতো দেখতে লাগছে।'

শুনে গায়ে না মাথা আলস্যের হাসি হাসল লিলি। 'তাই বুঝি?...অ্যাই তোমার তো প্রচুর চেনাশোনা, আমাকে দাও না একটা সভায় ঢুকিয়ে। আমি এখনও নিশ্চয়ই সব ভুলিনি বলো?'

'সেটা আমি কী করে জানব? যাক গে তোমার হাজব্যান্ডের খবর কী?'

'ও থাকে না আমার সঙ্গে, অ-নে-ক দিন!'

'তাই-ই!'

'হ্যাঁ।' একই ক্লান্তি ওর গলায়।

'তাহলে তোমার বাচ্চাটা?'

'ও কোথায় যাবে, আমার কাছেই আছে।'

'কত বয়েস এখন?'

'এবছর ক্লাস থ্রি হল। পড়াশোনায় খুব মাথা।' জিতে যাওয়ার সামান্য আলো পড়ল ওর চোখ-মুখে। 'তবে ভীষণ দুরন্ত।'

আমি ওর মুখোমুখি এসে বসলাম। 'তোমাদের অনেক দিন আগে একবার একটা জুতোর দোকানে দেখতে পেয়েছিলাম। সেদিন তোমার পিঠে ডানা ছিল না। আবার কি নতুন করে গজাল না কি?' তাচ্ছিল্য নিয়ে হেসে বললাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল লিলি। সামনে ঝুঁকে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল। আর আমি কষ্ট পেতে পেতে দেখতে থাকলাম ওর পিঠে জোর করে ফুটিয়ে গোঁজা দুটো নকল ছোট ডানা, যা ওর নিজের নয়। পিঠে হাত রেখে একটানে ডানা দুটো উপড়ে ফেলে দিলাম আমি। পিঠ থেকে খানিকটা বদরক্ত বেরিয়ে এল। ওর ঘাড়ের কাছে মুখ রাখলাম। লিলির কানের লতির কাছ থেকে ফিকে...খু-উ-ব হালকা ঘাসের গন্ধ আসছে। অনেক দূর থেকে যেন। একবুক গুড়গুড় শব্দ নিয়ে আমি ওর কানে ফিসফিস করে বললাম—'আমিও আর মন্ত্র পরি নামাতে পারি না। তুমি আজ এমনিই এসেছিলে!'

সানন্দা
জুন ২০০৯

একটি প্রলাপের জন্ম

সবাই জানে আমার দিদি পাগলি। আমিও জানি। কিন্তু আমি জানি আমার দিদি পুরো পাগল নয়। সারাদিন ধরে দিদি খুব সুন্দর। কিন্তু বিকেল হতেই অন্যরকম হয়ে যায়। বারান্দায় চুপটি করে বসে আকাশ দেখে। দেখতেই থাকে। কোথায় যেন হারিয়ে যায়! হাজার ডাকলেও সাড়া দেয় না। আকাশে চাঁদ উঠলে দিদি অস্থির হয়ে পড়ে। পূর্ণিমার রাতে দিদিকে কিছুতেই শোয়ানো যায় না। সারারাত বসে থাকে। আকাশ দেখে। সাদা ধবধবে মেঘ দেখে। আর মাঝেমধ্যে বলে ওঠে—'ওই ওই বৃষ্টি এল। ওই যে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান, শিব ঠাকুরের বিয়ে...শিব ঠাকুরের বিয়ে—হি-হি-হি।'

দিদির এরকম হাসিতে আমি চমকে উঠি। তখন দিদিকে বড় অচেনা লাগে। আমি গুটিয়ে যাই। কীসের বৃষ্টি, কে শিব ঠাকুর আমি বুঝতে পারি না।' আমি প্রত্যেকবার একই ভয়েতে নতুনভাবে কেঁপে উঠি।

একা লাগে। দিদি বলতে থাকে—'শিব ঠাকুর ওই দেখ সোনা শিব ঠাকুর...'

সোনা আমার নাম। আমার বাবা নেই। গত বছর মারা গেছে। খুব বড় অফিসে চাকরি করত। সুইসাইড করেছিল রেললাইনে। মর্গ থেকে বাবাকে যখন বাড়িতে আনা হয়েছিল মা কাঁদেনি। আমি কেঁদেছিলাম, দিদি কেঁদেছিল। বাবার মুখটা একটা সবুজ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি বাবার মুখ দেখতে চেয়েছিলাম। কেউ দেয়নি। বলেছিল, 'দেখিস না।' আমি জানি কেন দেখতে দেয়নি। বাবার মুখটা...

আমি জানি না বাবা কেন সুইসাইড করেছিল। আমি জানি না আমার দিদি কেন এমন হয়ে গেলে। আমি ক্লাশ সিক্সে পড়ি। আমার দিদি যখন ভালো ছিল তখন কাকুর সঙ্গে বেড়াতে যেত। আমি একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছিল। রঞ্জনকাকুর সঙ্গে থাকলে দিদি খুব হাসত। আমি একদিন রঞ্জনকাকুকে আমার মাকে আদর করতে দেখেছিলাম। আমার ভাল্লাগেনি। আমি দেখতে পেয়েছিলাম বলে মা আমায় খুব বকেছিল। তারপর বাবা আর দিদিকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। আমি বাবাকে বলিনি। কিন্তু দিদিকে বলে ফেলেছিলাম। আমার মনে কেন জানি খুব কষ্ট হয়েছিল। তার পরেই আমার বাড়িতে সবাই সবার সঙ্গে খুব ঝগড়া করত। দিদি কেমন হয়ে গেল। এখন আমার মা চাকরি করে। আমি জানি মা-র চাকরিটা রঞ্জনকাকু করে দিয়েছে। আমার মা রঞ্জনকাকুর সঙ্গে বেড়াতে যায়। আমি জানি রঞ্জনকাকু মাঝেমধ্যে মাকে টাকা দেয়। আমি বড় হয়ে চাকরি করলে ওই টাকা নিতে মাকে বারণ করব।

রঞ্জনকাকু খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারত। আমিও ছবি আঁকতে পারি। কিন্তু আমি রঞ্জনকাকুকে একদম ভালোবাসি না। কিছুতেই বাসি না। আমি দিদিকে ভালোবাসি। আমার দিদি আকাশ দেখে, এক দুই তিন তারা গোনে। তারপর হঠাৎ বলে 'ধুৎ—হারিয়ে যাচ্ছে। সোনা, এই সোনামুনি ওই তারাটা আমার এনে দিবি?'

আমি বলি, 'কোনটা?'

দিদি আঙুল দিয়ে দেখায়, 'ওই যে ওইটা।' আমি হঠাৎ বড় হয়ে যাই। গম্ভীর হয়ে বলি, 'এখন না, কাল সকালে দেব। তুই ঘুমোতে যাবি চল।'

'ধুৎ পাগল, সকালে হারিয়ে যাবে। সকালে সব হারিয়ে যাবে।' আমার বাবাকে সকালে পাওয়া গেছিল, রেললাইনের ধারে। আমার মা বাবাকে ভালোবাসত না। কাওয়ার্ড বলত। আমি কাওয়ার্ড মানে জানি। বাবা মাকে হোর বলত। আমি মানে বলব না। কিছুতেই বলব না। আমার দিদি আকাশ দেখে। আকাশ থেকে বৃষ্টি দেখে। আমাকে অ্যাই সোনামুনি বলে ডাকে। সেই ডাকে আমার ঘুম এসে যায়। ঘুম...ঘুমের মধ্যে আমি বড় হয়ে যাই।

এই শহরকে আমি পূর্ণিমার রাত্রে ভালোবাসি। রাত্রিবেলা যখন লম্বা লম্বা বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি বেয়ে আমি বাড়ির দিকে ফিরতে থাকি তখন ঝুপ করে শহরের সব বাতি নিভে যায়। শুধু চাঁদের আলো রাস্তায়, বাড়িগুলোর গায়ে মেখে থাকে, তখন এই শহর আমার কাছে অচেনা হয়ে ওঠে। মানে আমি সেই ওয়ান্ডার ল্যান্ডের অ্যালিস, আমি ভালোবেসে ফেলি এই অচেনা শহরকে। রাস্তায় প্রতিটি পাথর, দেওয়ালের প্রতিটি ইট আমার সঙ্গে তখন কথা বলে। আমি তাদের আমার প্রেমের কথা বলি। তারা আমায় ইতিহাসের কথা শোনায়। মামুদ, শাহজাহান, চার্ণকের গল্প বলে। আমি বাবার কথা বলি, মা-র কথা বলি। তারা শোনে। চুপ করে শোনে। তাদের নিঃশ্বাসে আমি দুঃখের শব্দ শুনি। আমার জন্য দুঃখের শব্দ শুনি, আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না তখন। ইচ্ছে হয় ওই দেওয়ালগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ি। আমি জানি ওই দেয়ালগুলোর ভেতরে একটা অন্য জগৎ আছে। আমি দু-হাতে শ্যাওলা ধরা দেয়াল জড়িয়ে ধরি। বহু পুরোনো ইটের গন্ধ নিই।...গন্ধ...হঠাৎ লাইট চলে আসে। সব নিভে যায়। আমি বাড়ি ফিরে আসি।

আমার মা রঞ্জন ব্যানার্জির সঙ্গে চলে গেছে। আমার দিদির চুল সাদা। বদ্ধ পাগল। যখন-তখন শাড়ি খুলে ফেলে। আমি আবার পরিয়ে দিই। আমার দিদি সারাদিন একটা ঘরের ভেতর থাকে। জানলার গরাদ ধরে আকাশ দেখে। দিদি আর গাইতে পারে না। আমি ছবি আঁকতে ভুলে গেছি। আমি দিদির ঘরের বাইরে তালা দিয়ে বের হই। আমার চাকরি নেই। কয়েকটা টিউশন করি। আমি দিদির সঙ্গে থাকি, এই শহরের সঙ্গে থাকি। এই ইট, শহর, চাঁদের সঙ্গে কথা বলি। আমার এদের কথা লিখতে ইচ্ছে করে। ভীষণ ইচ্ছে করে। আমি লিখব।

আমি একটা গল্প লিখব। লিখতেই হবে। সহস্র কথা আমার নাড়িভুঁড়ি বের করে আনছে। ওদের না লিখতে পারলে আমি শেষ হয়ে যাব। আমি খুঁজতে থাকি আমার গল্পের শুরু শেষ মাঝখান...

'শ্যামলকাকু আছেন?' বছর পয়ঁত্রিশ-ছত্রিশের মহিলাকে জিগ্যেস করলাম আমি।

'না উনি তো নেই?' ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে গভীর শোকের ছায়া।

আমি বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'উনি মানে কখন আসবেন...'

'আপনি জানেন না ওর কী হয়েছে?'

বুকের ভেতর সপাং করে উঠল। এত ভালো লোকটা, এত সুন্দর কবিতা লেখে, কী হল? আমি দুরুদুরু ভাবে বললাম—'না তো, কী হয়েছে?'

ভদ্রমহিলার মুখে একটা অসহায়তায় ছায়া আরও গভীর, তীব্র হয়ে উঠল। বললেন, 'উনি তো এই মাসে রিটায়ার করে গেছেন। এখন বাড়ি ফেরা, বেরোনো কোনও ঠিক নেই।'

শ্যামলকাকু বিয়ে করেনি। একটা এক্সপোর্ট কোম্পানির সুপারভাইজার ছিলেন। ওর বেকার ভাই শ্যামলকাকুর মাইনের ভরসায় বিয়ে করে নিয়েছিল। ভদ্রমহিলা সেই ভাইয়ের বউ। শ্যামলকাকুর রিটায়ার করা

অথবা মৃত্যু মহিলার কাছে এক হয়ে গেছে।

কিংবা;

মা চিৎকার করে উঠল—'ইউ আর এ কাওয়ার্ড। গুড ফর নাথিং।'

বাবাও হিসহিস করে উঠল—'শাট আপ ইউ হোর। গো টু হেল।' আমি বিছানায় দিদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছি।

অথবা,

মা টাকাগুলো গুনে নিয়ে রঞ্জনকাকুকে বলল, 'এ মাসে আর একটু বেশি দিলে ভালো হত।'

রঞ্জন বলল, 'একটু চেপে চালাও। দুটো ফ্যামিলি আমায় এই বাজারে মেনটেইন করতে হচ্ছে।'

মা বলল, 'মেয়েটার ওষুধের পেছনেই তো একগাদা চলে যায়।'

'কী দরকার অত...ফ্রুটলেস।' বলে রঞ্জন মাকে পোষা একটা বেড়ালের মতো জড়িয়ে ধরল।

বা,

দিদি অদ্ভুত মিষ্টি সুরে বলল, 'অ্যাই সোনামুনি, ওই তারাটা আমায় এনে দিবি?'

আমি তিনশো বছরের শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, দিদির শাড়ি খুলে মেঝেতে লুটিয়ে রয়েছে। আমি শাড়িটা তুলে দিদির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'কোনটা রে দিদি?'

'ওই যে, ওই তারাটা থেকে বৃষ্টি পড়ছে। দে না এনে। শিব ঠাকুরের বিয়ে শিব ঠাকুরের বিয়ে—হি-হি।'

এখন আরও অযুত-নিযুত সংলাপ, চরিত্র আমাকে পাগলা মোষের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমি প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে খুঁজে চলেছি একটা গল্প, আমার মুখ দিয়ে গ্যাঁজ উঠছে ঘোড়ার মতো, পা অবশ হয়ে আসছে। আমার আয়ু কাঁপছে শেষ হয়ে আসা মোমবাতির মতো। এই শহরে কোনও গল্প নেই?...নেই?

আমি পারিনি। সামনের এ-শহরে কোনও গল্প নেই। এই নিঃঝুম শহরে মানুষের কোনও গল্প নেই। কতগুলো অগোছালো চরিত্র, সংলাপ শুধু। ওই আকাশ, চাঁদ, শ্যাওলা ধরা ইট দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার সামনে টেবিলে রাখা বিষ। এক শিশি বিষ। আমি আর পারছি না। আজীবন যন্ত্রণা নিতে। আজ একেবারে শেষ করে দেব। বিষের পাশে রাখা প্যাড আর কলম। আমার বাবা লেখেনি কিন্তু আমি সুইসাইড নোট লিখব।

কী লিখব? সিলভিয়া প্লাথ—

'Dying is art

I do it exceptionally well'

অন্তত মৃত্যুটা আমি মহান করে যেতে চাই। একটা কবিতার মধ্যে দিয়ে শেষ। আমি জানি না দিদির কী হবে। কেউ জানে না কার কী হবে। আমি আর পারছি না। I hate all the bitrayers। সবাই ঠকিয়েছে আমায়, আমি এক নিশ্বাসে লিখে ফেলি কবিতার লাইন ক'টা। শিশিটা হাতে নিতেই একবার দিদির কথা মনে পড়ে; শেষ একবার দিদিকে দেখতে ইচ্ছে হয়। আমি শিশিটা টেবিলে রেখে দিদির ঘরে যাই। অন্ধকার ঘর। লাইট জ্বালাই। দিদি ঘুমোচ্ছে। আমি কতদিন দিদিকে এমনি করে ঘুমোতে দেখিনি। এত শান্ত, এত সুন্দর। দিদির মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিই। তারপর দিদির পাশে শুয়ে ওর শুকনো বুকে মুখ রাখি। বহু পুরোনো কেমন দুধ দুধ গন্ধ আসে নাকে। একটা রেলগাড়ির শব্দ শুনতে পাই দিদির বুকের ভেতর। আমি তাকিয়ে দেখি একটা লাল রঙের ট্রেন বৃষ্টির মতো ঝমঝম শব্দ করতে করতে যাচ্ছে। আমি হুস করে ঢুকে পড়ি দিদির বুকের ভেতরে। ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে থাকি। পাহাড়-মাঠ-জঙ্গল পেরিয়ে। হঠাৎ রেলগাড়িটা ঘোড়া হয়ে যায়। আমি ওর ওপর চেপে বসি। ঘোড়াটা আকাশে লাফ দেয়। উড়তে থাকে। এটা কি

পক্ষীরাজ! বিশাল, বি-শা-ল আকাশ। দিদির বুকে রয়েছি ভুলেই যাই। আমি উড়তে থাকি কুচকুচে অন্ধকারের মধ্যে হীরের মতো ছড়িয়ে থাকা তারাদের পাশ দিয়ে। ঝনঝন ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা হঠাৎ আমার দিকে তাকায়। রঞ্জনকাকুর মতো মুখ!

'ইউ হোর', বলে ঘোড়াটা আমায় লেজের ঝাপটা মেরে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ায়। আমি কেঁপে উঠে পড়ে যাই। পড়ে যেতে থাকি।...মা-আ-আ...অন্ধকার আরও অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে আমি আছড়ে পড়ি দিদির বুকের বাইরে। আমি আবার কেঁপে উঠি। দিদি জেগে যায়। আমাকে দেখে একটুও চমকে ওঠে না। আমার মাথায় আলতো হাত রেখে কী সুন্দর করে বলে—'কী হয়েছে সোনা, জল তেষ্টা পেয়েছে?' ঝুপ করে শহরের বাতি নিভে যায়। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে ঢুকে পড়ে ডোরাকাটা চাঁদের আলো। হাওয়ায় হিমের গন্ধ আসে। আমি দিদির বুকে মুখ রেখে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকাই। ছাদটা উধাও হয়ে যায়। চৌকো আকাশটাকে দেখতে পাই। আমি অবাক হয়ে দেখি ঝকঝকে, ঘন সাদা মেঘের মতো আমি আমার স-ব চরিত্রদের দেখতে পাই। সেই গল্প, শ্যামলকাকু; তার ভাইয়ের বউ, দিদি, মা, বাবা রঞ্জনকাকু, আমার আকাশলীনা। এই শহরে অচেনা কত অঢেল চরিত্র—সবাই লিখে চলেছে। আমি দেখতে পাই তাদের লেখা প্রতিটি অক্ষর। যাদেরকে আমি লিখব ভেবেছিলাম তারাই সকলে নিঃশব্দে লিখে চলেছে আমাকে! আমার জীবন আমার মৃত্যুকে লিখছে, কাটছে, তাদের লেখা প্রতিটি শব্দে জন্ম হচ্ছে আমার!...

আমি একটা শব্দে পাশ ফিরে তাকাই। বিষের শিশিটা আমার ঘর থেকে দিদির ঘরে চলে এসেছে। ও ফিসফিস করে খানিকটা বিষণ্ণভাবে বলল—'কী হল এসো, আমি অপেক্ষা করছি।'

আমি বলি, 'তুমি যাও। আমি আসছি।'

সে ফিরে যায় আমার ঘরে।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠি। দিদির দিকে তাকাই। দিদি আবার ঘুমিয়ে

পড়েছে কখন। একবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াই। বোধহয় শেষরাত। শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে।

আমি আমার ঘরে যাই। দেখি শিশিটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। আমি খাঁটি প্রেমিকের মতো তার চিবুকে হাত রেখে মুখটা আমার সামনে তুলে ধরি। তারপর বলি, 'আসলে তুমিও খুব অসহায়। একটু শান্ত হয়ে বসো এখানে। তোমার কি কাউকে কিছু বলার আছে?'

বিহান
বইমেলা ২০০৫
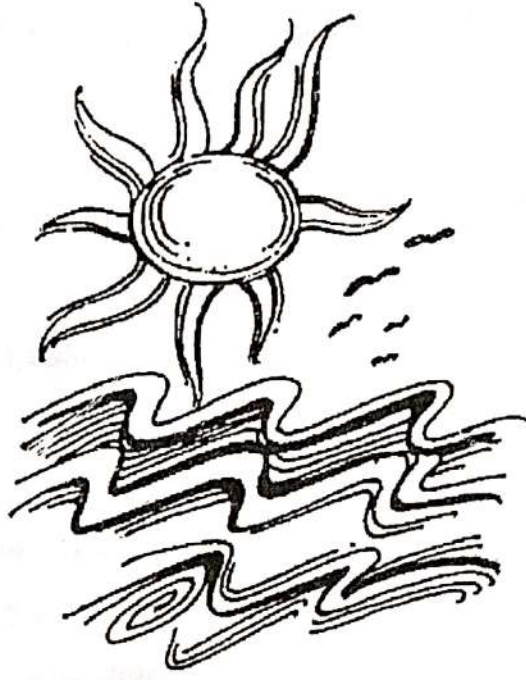
মানুষীর কথা

প্রথম দিকে অতটা কেউ খেয়াল করেনি। মণিই প্রথম দেখাল। 'দেখ দেখ, ঢলানি দুটোকে দেখ একবার।' সঙ্গে সঙ্গে তাস ফেলে চার দু-গুণে আট আর মণির নিজের দুটো মিলিয়ে মোট দশটা চোখ ঘুরে গেলে ছেলে-মেয়ে দুটোর দিকে। ছেলেটা বছর ত্রিশ-বত্রিশের। একটা লালচে হয়ে আসা শার্ট আর খয়েরি রঙের ফুলপ্যান্ট পরে পা তুলে সিটের ওপর বসে। ফুলপ্যান্টটা আবার হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। লিকলিকে, কালচে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ইয়াব্বড় গোল কালো রঙের একটা গুঁফো। মাথার চুল রুক্ষ। তোবড়ানো গাল নিপুণভাবে সেভ করা। লালচে সরু গোঁফ। মেয়েটা কত হবে, খুব জোর চব্বিশ-পঁচিশ। তেল চকচকে শ্যামলা গায়ের রং। পরনে একটা টকটকে লাল রঙের ব্লাউজ আর লাল-সাদায় একটা শাড়ি। শাড়িটা বেশ নতুন নতুন। মেয়েটাও সিটের ওপর উবু হয়ে বসে। শাড়ির নীচ দিয়ে সায়ার খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে। মুখটা বেশ।

ছেলেটা ওর শিরা ওঠা হাত দুটো বাড়িয়ে মেয়েটার ডান হাতের তালু থেকে ব্লাউজের হাতার প্রান্ত পর্যন্ত সুড়সুড়ি দিতে দিতে একবার উঠছে আর নামছে! বেড়ালচুরি খেলছে বোধহয়। মেয়েটা সুড়সুড়ির চোটে ওর ডান কাঁধ উঁচিয়ে ঘাড় কাত করে খিলখিল করে হাসছে। কিন্তু হাত সরাচ্ছে না।

দুজনের নিখুঁত বর্ণনাটা গোগ্রাসে গিলে নেওয়ার পর ইলা বলল, 'ওভাবে দেখিস না, দেখছি বুঝলে আরও বাড়বে।'

অনু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতা।'

চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার ফিস খেলায় মন দিল ওরা।

এই দলটার নাম পঞ্চপাণ্ডবী। বয়সটা বছর খানেক বেশি বলে প্রথম পাণ্ডবী লক্ষ্মী। বাকিরা সব পঞ্চান্নর কোঠায়। পরিচিতদের দেওয়া এই খেতাবটার জন্য দলের পাঁচজনেরই বেশ একটা অহংকার রয়েছে মনে। অনু আর ইলা এক পাড়ার বন্ধু। বাকিদের সঙ্গে পরিচয় কলেজে আসার পর। লক্ষ্মী তখন বেথুন কলেজে জি এস। কলেজ সোশ্যালে দুর্গার অসাধারণ টপ্পা, অনুর ডেকরেশন, মণির আবৃত্তি আর ইলার হইহই স্বভাব পাঁচটা মাথাকে এক করে দিয়েছিল। তারপর কলেজ পালিয়ে এদিক-ওদিক যেতে-যেতে একেবার বাড়ির সঙ্গে প্রায় লড়াই করেই বসন্ত উৎসবে শান্তিনিকেতন। অনুর মামা বিশ্বভারতীতে চাকরি করতেন। তিনিই গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই প্রথম এক অচেনা স্বাদ। তারপর থেকে প্রত্যেক বছরে দু-একবার করে দীঘা, শান্তিনিকেতন, পুরী, ডুয়ার্স। কলেজ শেষ হবার পর প্রথম লক্ষ্মীর বিয়ে। সেই-ই শিলিগুড়ি। তারপর সবার একে একে বিয়ে হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে গেল। বছর কয়েক শুধু ফোনে, 'কী রে কেমন আছিস?' একদিন লক্ষ্মীর পাঠানো ওর দ্বিতীয় ছেলের অর্ণবের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ কার্ড। সঙ্গে একটা ছোট্ট হুমকি। 'এবারে যদি কেউ না আসিস তাহলে জন্মের মতো...'

বাকি চারজন পরামর্শ করে ঠিক করল এবার যেতেই হবে। দুর্গা স্কুল টিচারি করে। ছুটি পাবে কি না সেই নিয়ে একটু চিন্তা ছিল। মঞ্জুর

হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে কোনওমতে রাজি করিয়েই দে ছুট। তারপর দু-তিনটে দিন হই-হুল্লোড়, পুরোনো সেই দিনের কথা। সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, আর নয়। এবার থেকে আবার বেরোতে হবে। অন্তত বছরে একবার। সেবছরেই ঠিক হল গ্যাংটক।

তার পর কেদারনাথ, তারপর...তারপর করতে করতে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছরে গোটা ভারতটাকেই চষে ফেলেছে দলটা। তারমধ্যে কয়েক বার যে-যার পতি পুত্র-কন্যা নিয়েও একসঙ্গে যাওয়া হয়েছে। মাঝেমধ্যে কয়েকটা বছর শুধু বাদ গেছে এর অসুখ কিংবা ওর মেয়ের পরীক্ষা অথবা তার ছেলের বিয়ে ইত্যাদি কারণে। শত্তুরের মুখে ছাই দিতেই যেন দলটা দিনে দিনে আরও মজবুত, আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে বয়স বেড়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। লক্ষ্মীর এক মেয়ে আর ইলার দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে। দুর্গার স্বামী মারা গেছে। বড় ছেলে চাকরি নিয়ে স্টেটসে চলে গেছে। ছোট ছেলের কাছে থাকে। মণির কোনও ইস্যু হয়নি। অনুর মেয়ে জেবিটি ট্রেনিং নিচ্ছে।

এই এতগুলো বছরে পাঁচটা থালাবাটি-গ্লাসে কখনও ঠোকাঠুকি লাগেনি তা নয়। কিন্তু তা কখনওই সম্পর্কের অস্তিত্বে টান মারতে পারেনি।

এবছর ওদের গন্তব্য পুরী। বয়স হয়ে গেছে বলে বাড়ির কেউ ছাড়তে চাইছিল না। বহু কষ্টে এবারেই শেষ বার ইত্যাদি বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে। পুরীতে আগেও বার দুয়েক এসেছে ওরা। কিন্তু সমুদ্রের টান...।

'কী রে খেয়ে নিবি না কি? সাড়ে আটটা বাজে', মণি বলল।

'দাঁড়া তো, ট্রেনে উঠলেই খালি খাই খাই,' ইলা ধমক দিল।

লক্ষ্মী বলল, 'হ্যাঁ রে আমরা শেষবার পুরী এসেছিলাম তখন কি এটাতেই গেছিলাম?'

মণি মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, পুরী এক্সপ্রেসে।'

দুর্গা মন দিয়ে বনফুল পড়ছিল। অনু বলল, 'এই যে দিদিমণি, বই

পড়ার নাম করে ওদের খুব টেরিয়ে দেখছিস না?'

'যাহ্ খালি ইয়ার্কি!

'হি-হি।'

দুর্গা বই বন্ধ করে জানলার বাইরে তাকাল। বাইরেটায় চোখে অস্বস্তি ধরিয়ে দেওয়া নিকষ অন্ধকার। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো আলো নিমেষে জানলার সামনে ছুটে এসে পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। তাস রেখে ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে দুলতে দুলতে গল্প শুরু করল ওরা।

জগন্নাথ এক্সপ্রেসের এস-ফাইভ কামরার সতেরো থেকে একুশ নম্বর স্লিপার ওদের। ওদের উলটোদিকের জানলার ধারে তেইশ-চব্বিশ নম্বর স্লিপারে ছেলেমেয়ে দুটো। লাগেজ বলতে একটা বিগ শপার, একটা জাফরিওলা বাকেট আর একটা ছোট সাইড ব্যাগ। ব্যাগটা ছেলেটার। ছেলেটা এখন খইনি বানাচ্ছে।

মণি নাক টিপে বলল, 'অসহ্য! এক্ষুনি থপথপ করে ঝাড়বে আর ডাস্টগুলো এদিকে আসবে।'

মেয়েটা এবার বিগ শপার থেকে খাবার বার করল। এক পাউন্ড পাউরুটি গোটা কয়েক মর্তমান কলা আর একটা পুঁচকে সন্দেশের বাক্স।

লক্ষ্মী ফিসফিস করে বলল, 'রাত্রিবেলা কাঁচা পাউরুটি আর কলা! আমার তো দেখেই অম্বল হয়ে যাচ্ছে রে।'

মণি বলল, 'আমারও তালে বার করি।'

অনু বলল, 'হ্যাঁ বাবা কর, গতজন্মে না খেয়ে মরেছিলি না কি?'

সাদা রুটি, পেঁয়াজ ছাড়া বাঁধাকপির তরকারি আর দুটো করে কালাকাঁদ কাগজের প্লেটে খেতে খেতে ইলা ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সদ্য বিয়ে করেছে, বুঝলি, হনিমুনে যাচ্ছে বোধহয়।'

মণি বলল, 'কী করে বুঝলি?'

'কপালে সিঁদুরটা দেখ, আনতাবড়ি লাগানো। শাঁখা-পলাটাও নতুন।'

আবার সবাই তাকাল ওদিকে। মেয়েটার কালো হাতে শাঁখা ঝকমক করছে।

অনু বলল, 'সত্যিই! ব্যোমকেশের স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে রে?'

দুর্গা বলল, 'ব্যোমকেশী।'

'হি হি হি।'

হাসির শব্দে ছেলেমেয়ে দুটো ওদের দিকে তাকাল একবার। তার পর আবার খেতে খেতে নিজের মধ্যে গল্প শুরু করল।

খাবার পর প্লাস্টিকের বোতল খুলে ঢকঢক করে জল খেল ছেলেটা। মেয়েটাও খেল।

লক্ষ্মী আবার আঁতকে উঠল, 'কাঁচা পাউরুটির পর জল! মরবে।'

'আরে দুর, থাম তো! ওদের কিছু হয় না।'

খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর প্লেটগুলো জানলা দিয়ে ফেলে হাত-টাত ধুয়ে বাথরুম সেরে আবার একপ্রস্থ তাস। তারপর শুয়ে পড়ল ওরা।

ছেলেমেয়ে দুটো তখনও গল্প করছে। টিউব লাইট নেভানো। শুধু নীলরঙের ডিম লাইটটা জ্বলছে। আবছা অন্ধকারে মাঝেমধ্যে মেয়েটার— 'অ্যাই ধ্যাত...হি-হি', শোনা যাচ্ছে। কী বেলেল্লাপনা করছে কে জানে!...ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

লক্ষ্মী আর দুর্গা লোয়ার বার্থে শুয়েছিল। অনেক রাত। হঠাৎ 'ও মাসি, ও মাসি, উঠুন না।'

আচমকা ঠেলা খেয়ে 'কে কে' বলে ধড়মড় করে উঠে বসল লক্ষ্মী। দুর্গাও জেগে উঠে টিউব জ্বালাল।

মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে-মুখে প্রচণ্ড ভয়।

কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে বলে লক্ষ্মী বেশ বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কী হল কী?'

'ও মাসি, ও উঠল না তো।'

দুর্গা জিগ্যেস করল, 'কে উঠল না?'

মেয়েটা একটু ঢোঁক গিলে বলল, 'দুলাল, আমার বর।'

ট্রেনটা বোধহয় কোনও স্টেশনে থেমেছিল। আবার গতি নিচ্ছে। দুর্গা বলল, 'এত রাতে হঠাৎ নামতে গেল কেন?'

'বলল যে খাবার জল নিয়ে আসছি।'

'অ। তাহলে দেখ নিশ্চয়ই অন্য কোনও কামরায় উঠে পড়েছে।'

'যদি না উঠতে পারে!' ভেউ ভেউ করে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলল মেয়েটা।

লক্ষ্মী বলল, 'আরে কী মুশকিল, জোয়ান ছেলে উঠতে পারবে না কেন? তুমিও যাও বসো গিয়ে। দেখবে একটু পরেই চলে এসেছে।'

মেয়েটাকে তাও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাইট নিভিয়ে দিল দুর্গা। নীল রঙের আবছা আলোয় মেয়েটাকে ভূতের মতো লাগছে।

লক্ষ্মী বলল, 'আরে চিন্তার কিছু নেই। তুমি যাও না, বসো গিয়ে।'

মেয়েটা চুপচাপ নিজের বার্থে গিয়ে বসল।

দুর্গা খানিক বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল। লক্ষ্মী শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে করতে মেয়েটার ফোঁপানো শুনতে পেল। আচ্ছা জ্বালাতন তো! আবার উঠে বসল লক্ষ্মী। পায়ে চটি গলিয়ে মেয়েটার কাছে গেল।

'কী হল, আসেনি এখনও?' বলে কী ভেবে মেয়েটার মাথায় হাত রাখল। মেয়েটা ডুকরে উঠল।

লক্ষ্মী বসল মেয়েটার পাশে। 'দুর বোকা, কাঁদার কী আছে? আমাদেরই কত বার এমন ঘটনা হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।'

চোখের জল মোছা ভেজা হাতটা লক্ষ্মীর হাতের ওপর রাখল মেয়েটা, অনেক দূরের কোনও নিয়ন আলো জানলার শার্সিতে পড়ল। লক্ষ্মী মেয়েটার মুখ দেখতে পেল একঝলক। অন্যরকম সে মুখ। লক্ষ্মী বলল, 'দাঁড়াও, ওদের তুলি।'

টিউবটা আবার জ্বালিয়ে লক্ষ্মী ঠেলা মেরে তুলল অন্যদের। সবাইকে বলল ঘটনাটা। হাঁ হয়ে শুনল সকলে। সন্ধেবেলার বিরক্তি কারও মনে নেই।

অনু বলল, 'কী হবে তালে?'

মণি বলল, 'তাই তো বুঝতে পারছি না। উঠে থাকলে এতক্ষণে তো চলে আসা উচিত। এক যদি না জেনারেলে ওঠে।'

ইলা মেয়েটাকে জিগ্যেস করল। 'তোমরা যাচ্ছ কোথায়, পুরী?'

'হুঁ', কান্না চেপে গলা ভেঙে গেছে মেয়েটার।

'তোমার নাম কী?'

'সন্ধ্যা।'

তারপর কথা চলল প্রায় সারারাত। খুব পরিচিত একটা গল্প। সন্ধ্যার বাড়ি বাগনানের কাছারিপাড়ায়। দুলালের বাড়ি মেচেদায়। দুজনেই জগন্নাথ ঘাটে এসে ফুল বেচত। পাশাপাশি বসার সুবাদে একদিন পরিচয় থেকে প্রেম। দুলালদের অবস্থা সন্ধ্যার থেকে ভালো। নিজেদের কিছু জমিজায়গা, একটা ফুলের বাগান আছে, জাতে গোপ। সেদিক থেকে সন্ধ্যা জাতে ছোট। অবস্থাও ভালো নয়। সুতরাং দুলালদের বাড়ির বিয়েতে অমত। বাপের সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে দুলালও কেঁচিয়ে দিতে চেয়েছিল। শেষে সন্ধ্যার অজস্র চোখের জলের বিনিময়ে রাজি হয়েছে। পরশু রাতে দুজনে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে ধাঁ। সোজা কলকাতায় এসে উপস্থিত। মেছুয়াপট্টিতে দুলালের এক বন্ধুর বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে সকালে কালীঘাটে বিয়ে সেরে এখন পুরীতে হনিমুনে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার গল্প শুনতে শুনতে ব্যোমকেশী ইলাই প্রথম সন্দেহ করে অনুর কানে কানে বলল, 'হ্যাঁ রে ছেলেটা আবার পালায়নি তো? আজকাল এসব তো আকছার।'

দুই

সকাল দশটায় স্বর্গদ্বারের সামনে সিন্ধু লজের দোতলার ঘাটে বসে লক্ষ্মী আর অনু খরচের হিসাব করছে। মণি দেওয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে ক্রিম মাখছে। দুর্গা চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়ছে। ইলা খাটের ওপর শুয়ে।

গতকাল পুরী স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মে এদিক-ওদিক দুলালকে খুঁজেছিল

ওরা। না পেয়ে ওখানে থেকে সোজা থানায় গেছিল। বড়বাবু ওদের লজের ঠিকানা নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন কোনও খবর পেলেই জানাবেন।

সন্ধ্যা বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বলল, 'চলো চলো আমার হয়ে গেছে।'

দুর্গা বই নামিয়ে রেখে বলল, 'এর মধ্যেই চান হয়ে গেল? এই তো ঢুকলি।'

'ভিজে চুল এক পাশে এলিয়ে ভিজে গামছা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে সন্ধ্যা বলল, 'হ্যাঁ, হয়ে গেল তো।'

'সাবান মেখেছিলি?'

'নাহ্।'

'হতচ্ছাড়া মেয়ে, নোংরা কোথাকার।' বলে দুর্গা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সন্ধ্যার গলায়, ঘাড়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ, কত ময়লা জমে, চল সাবান মাখবি, নইলে আজ থেকে মাটিতে শুবি।'

সন্ধ্যা ঠোঁট উলটে আবার বাথরুমে ঢুকল, পিছনে দুর্গা। বাথরুমের মেঝেতে উবু হয়ে বসল সন্ধ্যা। দুর্গা চৌকাঠে বসে সন্ধ্যার পিঠের কাপড় সরিয়ে বলল, 'এই চান হয়েছে। দুনিয়ার নোংরা জমে, আদ্দেক জায়গায় ভালো করে জল পড়েনি। দে সাবান দে।' সন্ধ্যা সাবান আর ছোবাটা পিছনে হাত বাড়িয়ে দুর্গাকে দিল, দুর্গা মগের জলে ছোবা ভিজিয়ে সাবান মাখিয়ে সন্ধ্যার পিঠে ঘষতে শুরু করল, কালচে ফেনা।

দুর্গা বলল, 'কদ্দিন সাবান মাখিস না বল তো?'

'মেখেছি তো।'

'কোন সালে?'

হেসে উঠল সবাই। শুধু মণি গম্ভীর।

ছোবা দিয়ে ভালো করে ঘষার পর দু-মগ জল ঢালতেই সন্ধ্যার শ্যামলা যুবতী পিঠ জানলা দিয়ে গলে আসা রোদ্দুরে ইলিশ মাছের মতো চিকচিক করে উঠল। কোমরের দু-পাশে আদুরের চর্বির ভাঁজ। দুর্গা একমুহূর্তের জন্য কোথায় যেন একটু হারিয়ে গেল। তার পরেই ওর

চোখ পড়ল সন্ধ্যার ঘাড়ের পাশে নখের আঁচড়ের লাল কয়েকটা দাগ। দুর্গা বুঝল দুলালের সঙ্গে এক রাত্তির থাকার চিহ্ন। আলতোভাবে দুর্গা হাত রাখল সেখানে। তারপর মুখ টিপে হেসে ইশারায় মণিকে ডাকল। মণি এল। দুর্গা মণিকে নিঃশব্দে সন্ধ্যার ঘাড়ের দাগগুলোকে দেখাল। মণি দেখতে পেল না। ও চেয়ে রইল সন্ধ্যার টানটান চামড়ার পিঠের দিকে। গোলগাল নরম দুটো হাত...একমাথা চুল...। সন্ধ্যা দু-হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে রয়েছে।

মণি ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসল শুধু। হাসিটা তাচ্ছিল্যের। কোনও প্রাণ নেই।

'কী-ই গো মাসি, হল?'

'দাঁড়া তো বাপু', বলে দুর্গা সন্ধ্যার মাথায় শ্যাম্পু ঢালল। মণি সরে এসে আয়নাটার সামনে আবার দাঁড়াল। চোখের পাশে ভাঁজ, হাতের চামড়া ঢিলে হয়ে এসেছে। শাড়ি পরবার সময়ে নাভির চারপাশে দলাপাকানো কুঁচকে যাওয়া চর্বিটাকে দেখে ভিতরটা কেমন তীব্র বিস্বাদ হয়ে উঠল মণির।

বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে সন্ধ্যা আবার স্নান করছে। দুর্গা ঘরে এক কোণে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলল, 'বুঝলি লক্ষ্মী, ছেলেটা আসলে পালিয়েছে।'

ইলা বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

অনু বলল, 'যাক গে, দুটো দিন আমাদের সঙ্গে যেমন রয়েছে থাকুক। তারপরে তো...'

এই এক দিনের মধ্যেই মেয়েটা পাঁচটা প্রৌঢ়ার কাছে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। সবাই মিলে ওকে বুঝিয়েছে দুলাল নিশ্চয়ই উঠতে পারেনি। তাই বাড়ি ফিরে গেছে। দু-দিন পর ফিরলেই আবার দেখা হবে। সরল মেয়েটা বিশ্বাসও করে নিয়েছে ওদের মিথ্যে আশ্বাস।

মণি হঠাৎ বলে উঠল, 'যাই বলিস, তোরা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস মেয়েটাকে নিয়ে।'

অনু বলল, 'বাড়াবাড়ি আবার কোথায় দেখলি?'

'নয়তো কী? সাবান মাখানো, পাশে নিয়ে শোয়া। লক্ষ্মী তো ওকে একেবারে নিজের মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে।'

মণির বাঁকা কথাগুলো শুনে লক্ষ্মী বলে ফেলল, 'ওভাবে বলিস না মণি। নিজের একটা থাকলে বুঝতি।'

মুহূর্তে মণির মুখটা কালো হয়ে উঠল। পরিবেশটা থমথমে, কারও মুখে কথা নেই। সেই সময় সন্ধ্যা বেরিয়ে এসে ঝপাং করে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে বলল, 'এবারে কিন্তু আমার সত্যি-সত্যি হয়ে গেছে।'

গৌরবাটশাহী ধরে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে সকলে। ইলা, দুর্গা, অনু আর সন্ধ্যা একটু এগিয়ে হাঁটছে। দিদিমণি দুর্গা নীলাচলের পৌরাণিক কাহিনি শোনাচ্ছে ওদের।

মণি আর লক্ষ্মী ওদের কয়েক পা পিছনে। দুর্গার গল্প কানে আসছে মাঝেমধ্যে। দুজনে চুপচাপ পাশাপাশি চলতে চলতে লক্ষ্মী হঠাৎ মণির হাতটা ধরে বলল, 'মণি, কিছু মনে নিসনি তো? আমি ওভাবে বলতে চাইনি রে কথাটা।'

মণি লক্ষ্মীর দিকে তাকাল। সামান্য হেসে বলল, 'ভুলটাই বা কী বলেছিস?'

'প্লিজ মণি, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে। মাথাটা তখন হুট করে কেমন যেন হয়ে গেছিল। আসলে এই এক দিনেই এমন মায়া পড়ে গেছে মেয়েটার ওপর।'

মণি এবার লক্ষ্মীর হাতের মুঠোয় আলতো চাপ দিয়ে আঙুলগুলো ধরল।

লক্ষ্মী হেসে ফেলল। মণিও।

ওদিকে দুর্গা বলে চলেছে, 'বুঝলি তো এই জগন্নাথ হল আসলে নীলমাধবের অঙ্গচ্যুত রোম...।'

সবাই মন দিয়ে দুর্গার গল্প শুনছিল। সন্ধ্যা হাঁ করে দুর্গার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁটার জন্য রাস্তায় বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। মন্দিরের সিংহদ্বারের অরুণস্তম্ভের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। সেখানে একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর মন্দিরের ভেতর ঢুকল। সন্ধ্যা তিন বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে চলল।

গর্ভমন্দির থেকে বেরিয়ে ওরা মন্দির পরিক্রমা শুরু করল।

অক্ষয়বটের সামনে এসে দুর্গা সন্ধ্যাকে বলল, 'এই দেখ, একে বলে কল্পতরু, ভগবান অনন্তদেবের গাছরূপী শরীর। সবাই এর কাছে তার মনের প্রার্থনা জানায়।' ঈশ্বরের কাছে মানুষের অসংখ্য কামনা বটের ঝুরির মতো, সুতোয় বাঁধা ঢিল হয়ে ঝুলছে।

সন্ধ্যা একদৌড়ে গেল সেখানে। তারপর অন্যদের দেখাদেখি গাছে মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ ঠোঁট নাড়িয়ে ফিরে এল।

মণি বলল, 'সব জায়গায় কী এত বর চাইছিস বল তো?'

সন্ধ্যা এই প্রথম একটু লজ্জা পেয়েই বলল, 'কী আর বর চাইব!'

'কেন দুলালকেই আবার চাইতি। বরকে বর হিসাবেই বেশ চাওয়া হত।' হেসে উঠল সবাই।

সন্ধ্যা ফিকে হেসে বলল, 'তাই তো চাইলাম। মানুষটা ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছোলেই বাঁচি।'

ইলা ধমক দিল। 'খুব হয়েছে। আর পাকামো করতে হবে না। ভালোমতো না পৌঁছোনোর কী আছে শুনি!'

পরিক্রমা শেষ করে পশ্চিম দিকে খাজাদ্বারের সামনে এসে বসে পড়ল সবাই। লক্ষ্মী বলল, 'ওরে বাবা, আর আর পারছি না, অনেক হাঁটা হয়ে গেছে।' সন্ধ্যা বসেনি। ও এদিক-ওদিক ঘুরছে দেখে অনু হাঁক পেড়ে বলল, 'এই দেখিস, বেশি দূর যাস না। শেষে তুইও আবার না হারাস।'

গল্প শুরু হয়ে গেল আবার। কেউ খেয়ালই করেনি গল্পের ফাঁকে ইলা কখন উঠে গিয়ে খাজাদ্বারের এক কোণে কী যেন খুঁজছে।

অনু প্রথম দেখতে পেল। 'এই ইলা, কী করছিস ওখানে?'

ইলা এল।

'কী খুঁজছিলি?'

'ওখানেই কোথায় একটা ছিল জানিস।'

'কী?'

'ওর সঙ্গে বিয়ের বছর দুয়েক পর যখন এসেছিলাম, তখন ও চাবির রিং দিয়ে এই জায়গাতেই দাগ দিয়েছিল। খুঁজেই পাচ্ছি না।' সবাই অবাক! ইলা বিশ বছর আগের স্মৃতি খুঁজছে!

লক্ষ্মী বলল, 'দুর পাগলি, এতদিন পরে দাগ থাকে নাকি!'

লজে ফেরার সময় চুপচাপ হাঁটতে থাকে ইলাকে কাছে টেনে নিয়ে মণি বলল, 'কী রে ইলা, অরুণের সঙ্গে আবার আসবি না কি?'

ইলা তাকাল মণির দিকে, তারপর হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'ধু-র।'

তিন

আরও দুটো দিন এই মঠ, সেই মন্দির, সমুদ্র দেখতে দেখতে কেটে গেল হুস-হুস করে। যাওয়ার আগের দিন দুপুর থেকেই আকাশের মুখ কালো।

বেলা দেড়টা নাগাদ হোটেলে খেতে বেরোবার সময় মণি বলল, 'বাপ রে—কী কালো হয়ে এসেছে। মনে হয় খুব ঢালবে।'

অনু আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল, 'হলে দারুণ হবে। বৃষ্টিতে সমুদ্র দেখার কত্তদিনের শখ।'

ঠিক তাই। বিকেলের দিকে আকাশ কুচকুচে কালো। তারপর সন্ধে হতে না হতেই নামল বৃষ্টি। ওদের লজটা সমুদ্রের খুব কাছে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে দেখা যায়। ইলা, মণি আর দুর্গা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি

দেখছিল। সমুদ্রের কী অসম্ভব গর্জন। মনে হচ্ছে যেন হাজার হাজার বাঘ এক সঙ্গে হুংকার দিচ্ছে। সামনের নিকষ অন্ধকার চিরে নেমে আসা বিদ্যুৎ মুহূর্তের জন্য ভয়ংকর সুন্দরকে মূর্ত করে তুলছে। পাহাড়ের মতো বিশাল এক-একটা ঢেউ আছড়ে পড়ছে বালিতে। মনে হচ্ছে আজই যেন প্রলয়ের দিন। বুকের ভেতর একটা প্রচণ্ড ভয় মেশানো আনন্দ। এমন একটা অনুভূতি ওদের স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলিয়ে দিচ্ছে।

'কী রে সব বাইরে কেন? ভেতরে আয় না।'

লক্ষ্মীর ডাকে সংবিত ফিরল ওদের। ঘরে এল, চোখে-মুখে তখনও ঘোর।

অনু বলল, 'বস না সবাই একসঙ্গে।'

এমন একটা পরিবেশে সন্ধ্যা আনন্দের চোটে চড়ুই পাখির মতো ছটফট করছে।

লক্ষ্মী বলল, 'হ্যাঁ রে দুর্গা, একটা গান কর না। কতদিন শুনিনি।'

দুর্গা প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'না-না, আর পারি না কি!'

'ঢং করিস না বাপু। না পারায় কী আছে?'

'ও মাসি করো না, করো না গো।' দুর্গার হাত চেপে ধরল সন্ধ্যা।

সবার চাপাচাপিতে দুর্গা বলল, 'ঠিক আছে করছি। কিন্তু হাসলে পরে ধরে ঠ্যাঙাবে বলে রাখলাম।'

'আচ্ছা বেশ, কর এখন।'

দুর্গা শুরু করল, প্রথমে রামকুমারের স্টাইলে 'বিধি দিল যদি বিচ্ছেদ যাতনা,' তারপর 'কিশোরীর কী শরীর হল।'

চড়ায় ওঠার সময় বার কয়েক হোঁচট খেল দুর্গা। কেউ কিছু বলল না।

ইলা বলল, 'সত্যি কী সুন্দর গলা তোর!'

মণি বলল, 'ওই গানটা একবার কর না। ওই যে—যে রাতে মোর।'

'সবটা মনে নেই বোধহয়।'

'ঠিক আছে, শুরু কর, আমি ধরিয়ে দেব।'

দুর্গা শুরু করল—'সব যে হয়ে গেল কালো' থেকে।

বাইরের প্রবল হাওয়া জানলা দিয়ে ঢুকে বেভকভার, ওদের মাঝবয়সের কাঁচাপাকা চুল, আঁচল এলোমেলো করে দিচ্ছে। সবাই চুপ। ধ্যানস্থ যেন। '...অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি' পর্যন্ত এসে থেমে পড়ল দুর্গা। 'আর পারছি না রে।'

দুর্গার চোখ-মুখ লাল। হাঁফাচ্ছে।

'ঠিক আছে থাক, থাক।'

এমন সময় সন্ধ্যা বলল, 'মাসি, আমি একটা গাইব?'

'তুই?—কী গান?'

'রবীন্দ্রনাথের।'

'অ্যাঁ, কোত্থেকে শিখলি?'

'ইস্কুলে, প্রার্থনার সময় গাইতাম।'

'বেশ, কর।'

সন্ধ্যা তক্ষুনি চোখ বুজে শুরু করে দিল, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে...'

'বা রে, বেশ সুন্দর গলা তো মেয়েটার!'

সন্ধ্যা গেয়ে চলল '...ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্বপানে...' হঠাৎ উঠে পড়ল দুর্গা। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল, অনুও এল ওর পেছনে।

'কী রে দুর্গা উঠে এলি?'

'এমনি।'

'এখনও গলাটা কী সুন্দর রেখেছিস। গানটা ছেড়ে দিলি কেন?'

দুর্গা একবার তাকাল অনুর দিকে। তারপর সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরিয়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'আমি আর ছাড়লাম কোথায়? সবাই তো আমাকেই ছেড়ে চলে গেল।'

ব্যালকনির রেলিংয়ের ওপর রাখা দুর্গার পঞ্চান্ন বছরে পুরোনো হাতের ওপর সমবয়সি আর একটা হাত এসে আলতোভাব ছুঁল। বন্ধুর হাত। বাইরে প্রবল বৃষ্টি। হাওয়া।

চার

আজ রাতে ফেরার ট্রেন। বেলা এগারোটায় সমুদ্রের ধারে বালির ওপর বসেছিল পাঁচজনে। সন্ধ্যা সমুদ্রে চান করছে। মাঝেমধ্যে ছুটে এসে ওদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিচ্ছে। আবার ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রে। আজকের সকালটাও একটু মেঘলা।

ইলা বলল, 'এ বছরই তো শেষ, এর পরে যোগাযোগ রাখবি তো সবাই, না কি?'

অনু বলল, 'মেয়েটা কত সরল না রে, অথচ কপালটা দেখ।'

দুর্গা বলল, 'সত্যিই খুব কষ্ট লাগছে। ছেলেটা যদি ওকে না নেয়, কী যে হবে! সরল মেয়েটা।'

ইলা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'যদি নাও নেয়, কিচ্ছু হবে না দেখিস। আর অমন হতচ্ছাড়া ছেলের কাছে না গেলেই ভালো। অল্প বয়স তো, ঠিক ভুলে যাবে এক সময়। দেখ না, এরই মধ্যে কেমন গেছোদের মতো হইহই শুরু করেছে।'

লক্ষ্মী যেন ইলার কথায় বেশ আশ্বস্ত হয়েই একগাল হেসে বলল, 'ওই বয়েসে তুইও কি কম হুল্লোড়বাজ ছিলি না কি।'

সন্ধ্যা আবার দৌড়ে এল ওদের কাছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে বালির ওপর ঝপাস করে বসে পড়ল। ভিজে শাড়ি ওর গোটা শরীরে লেপটে রয়েছে। আঁচল সরে যাওয়া ভারী বুক ওঠানামা করছে।

একটু দূরে বসে থাকা কয়েকটা মেয়েকে সন্ধ্যার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে মণি বলল, 'লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছিস না কি। ঠিক করে জড়া আঁচলটাকে।'

সন্ধ্যা আঁচলটাকে টেনে ভালো করে গাছকোমর করল।

দুর্গা বলল, 'কী রে সন্ধ্যা, বরের সঙ্গে আবার এখানে আসবি তো?'

'না-না।'

'সে কী রে, কেন?'

'আবার যদি হারিয়ে যায়।' বলে হি-হি করে হেসে সন্ধ্যা আবার ছুট লাগাল স্নান করতে।

ইলা বলল, 'সন্ধ্যার গড়নটা ঠিক অল্প বয়সে অনুর মতো, না রে লক্ষ্মী?'

অনু বলল, 'কেন তুই-ই বা কম কী ছিলি?

'অ্যাই থাম তো!'

আবার হাসি।

হাসতে হাসতে সমুদ্রের দিকে তাকাল ওরা। তাকিয়ে রইল। সন্ধ্যা স্নান করছে। ঢেউয়ের সঙ্গে লাফাচ্ছে, কখনও ডুবে যাচ্ছে। আবার উঠছে। সকলে অদ্ভুত চুপ। এক সময় মণি যেন নিজের খেয়ালেই বলে উঠল— 'আমরা বুড়ি হয়ে গেলাম না রে।'

উত্তর দিল না কেউ। শুধু তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্ষয়াটে আলোয় একসময় ওরা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল সন্ধ্যা নয়, অন্য একটি অল্পবয়েসি মেয়েকে। কবেকার পুরোনো অথচ বড় চেনা সেই মেয়ে সমুদ্রে স্নান করছে হইহই করে।

দেশ
মার্চ ২০০৪

চক্ষুদান

'কী? কীরকম?'

'দা-রুণ...ওহ্...খক খক... ওহ্!' 'দারুণ' শব্দটা শেষ করার আগেই গলায় থুতু আটকে খাবি-টাবি খেয়ে একশা হল শতাব্দী। ওর মাথায়-পিঠে থাবড়া মেরে-টেরে মোটামুটি পজিশনে নিয়ে আসতেই, বহুদিন পর বরুণকে ঝপাত করে ওর পেডি থেমে ম্যানি, টোটাল কিওর করা বডি নিয়ে জাপটে ধরল শতাব্দী। খুব সুন্দর হালকা একটা গন্ধ বেরোচ্ছে বরুণের সাঁইত্রিশ বছরের বউ শতাব্দীর শরীর থেকে। দুটো বেডরুম, কিচেন, টয়লেট সব ঘুরে-টুরে প্যারিস করা মসৃণ দেওয়ালে বার বার হাত বুলিয়ে আবার দৌড়ে এসে বরুণকে আস্ত একটা চুমু খেয়ে ফেলল শতাব্দী। এখন বোধহয় বরুণের মুখে গন্ধ নেই। তারপর রুমালে নিজের ঠোঁট মুছে জিগ্যেস করল, 'কেমন অ্যাডভান্স পড়ল?'

'ওটা তোমার জিগ্যেস করা বারণ।' আদুরে গলায় বলল বরুণ। পাক্কা পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছে দমদম মেট্রো স্টেশনের

ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিতে। পাঁচতলা ফ্ল্যাট। বরুণ নিয়েছে চারতলায়। বেডরুমে দক্ষিণ-পশ্চিমে বড় বড় জানলা, ছোট ব্যালকনি। মোট সাড়ে ছ-শো স্কোয়ার ফুট। অফিস কলিগ সঞ্জয় খোঁজ দিয়েছিল ফ্ল্যাটটার। ফ্ল্যাটের মালিক ওর চেনাশোনা। শতাব্দীকে কিছু না জানিয়ে প্রায় মাস খানেক ধরে সত্তর হাজার অ্যাডভান্স আর তিন হাজার টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটের মালিককে অনেক ঝুলোঝুলি করে পঞ্চাশ আর আড়াইতে নামিয়েছে বরুণ। অবশ্য এর কিছু কৃতিত্ব সঞ্জয়ের প্রাপ্য। বরুণ নিশ্চিত ছিল শতাব্দীর ফ্ল্যাটটা পছন্দ হবেই। একে তো হাঁটাপথে মেট্রো স্টেশন। মেট্রোয় এসপ্ল্যানেডে নেমে ওর স্কুল হাঁটাপথে, বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট। বরুণকে অবশ্য এক্সাইডে নেমে বাস ধরে মিন্টো পার্ক যেতে হবে। সেও তো একটুখানিই।

বরুণ একটি অটোমোবাইল কোম্পানির অ্যাকাউনট্যান্ট। শতাব্দী কলকাতার নাম করা একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের হিস্ট্রি টিচার। বরুণের চেয়ে মাসে হাজার চারেক বেশি পায়। বরুণ বাড়িতে সময় পেলে টিভি দেখে। ওই একটা মাত্র নেশা এযাবৎ টিকে আছে। শতাব্দীর নেশা বইয়ের। দর্শন, উপন্যাস, কবিতা থেকে শুরু করে চিত্রকলা, মনস্তত্ত্বের বইয়ে বাড়ি ঠাসা। একটা মানুষ এত বই কী করে পড়ে ভাবলে অবাক হয়ে যায় বরুণ। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হয়েছিল দুজনের। তখন শতাব্দীর চেয়ে বরুণের মাইনে ছিল বেশি।

'সামনেই একটা পার্ক আছে, নীলের অসুবিধা হবে না।'

'খেলার সময় পায় কোথায়?' গলায় একগাদা চিন্তা ঢেলে শতাব্দী বলল, 'কিন্তু হ্যাঁ-গো, ওর স্কুল, টিউশন?'

'স-ব ঠিক আছে।' বরুণ বরাভয়ের ভঙ্গি নিল, 'বি টি রোড দিয়ে ওদের স্কুলের বাস যায়। আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'বাব্বা, তুমি হঠাৎ...।' চোখেমুখে একরাশ মুগ্ধতা ঝাঁপিয়ে পড়ল শতাব্দী। বিয়ের প্রথম দিকে বছর খানেক যেমন ছিল। বরুণ ভাবল আর একটা চুমু জুটবে, হল না। ওর কাঁধে হাত রেখে নিজের জুতো খুলতে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল শতাব্দী।

নীল বরুণ-শতাব্দীর একমাত্র ছেলে। ভালো নাম অগ্নিদেব। বয়স ছয় বছর। শ্রীরামপুরে একটা ভালো স্কুলে ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। বরুণের পুরো নাম বরুণদেব। 'দেব'টা ব্যবহার করে না, লেখে বরুণ চ্যাটার্জি। ওর বাবার নাম ছিল বাসুদেব। এমন নয় যে ওদের নিজের বাড়ি নেই, অন্য কোথাও ভাড়া থাকে। রিষড়ার বাগপাড়ায় আট কাঠা জমির ওপর বরুণের পৈতৃক ভিটে। সিক্সটি ফোরে বাবা বানিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে আরও খানিক পিছনে গেলেই ধানখেত। ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ধানখেত পার হতে গিয়ে বহুবার সবুজের মধ্যে হারিয়ে গেছে বরুণ। লোকে রাত্তিরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। মায়ের ঠ্যাঙানি তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কৈশোরেও বন্ধুদের সঙ্গে খেতের আলে লুকিয়ে বিড়ি খেয়েছে, আড্ডা মেরেছে। তারপর ধীরে ধীরে যেমনটা হয়। চাকরি-বিয়ে-ছেলে-স্কুল। কয়েকটা জিনিস অবশ্য পালটায়নি। এখনও সে বাড়ি থেকে রোজ সাইকেল চালিয়ে রিষড়া স্টেশনে আসে। দোকানে সাইকেল রেখে লোকাল ট্রেনে হাওড়া, তারপর বাস। পনেরো বছর ধরে এই চলছে। বরুণ বের হয় সকাল ন'টা নাগাদ। শতাব্দী আটটায়, কখনও সাড়ে আটটায়। কখনও রিকশা ধরে, কখনও অটো, যেদিন যা জোটে। বরুণের তো আরও দুর্ভোগ। ভিড় ট্রেনে উঠে কোনওদিন ভাগ্যে বসার সিটের একেবারে ধারে ছ-ইঞ্চি জায়গা জুটে গেলে 'ও দাদা আর একটু চেপে বসুন না...আপনাকে বলছি...ও দাদা...' এইভাবেই জীবনটা স্রেফ অ্যাডজাস্টমেন্টে চলে গেল।

চাকরিজীবনের প্রথম দিকে রোজ ইস্ত্রি করা জামা, পালিশ করা জুতো পরত বরুণ। ক'দিন পরেই বুঝে গেছিল এসবের ভ্যালু নেই। ট্রেন-বাস উজিয়ে যখন অফিস টয়লেটে ঢুকে নিজেকে আয়নায় দেখত, তখন বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে যেত নিজেকে চিনতে। অন্যের গায়ের ঘামে-কাদায় মাখা কোঁচকানো জামা, মাড়িয়ে দেওয়া জুতো। শতাব্দীর অবস্থাও প্রায় তাই। তুলনামূলক ফাঁকা লেডিজ কম্পার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে বরুণ আগে

ভাবত মহিলা হওয়া সবচেয়ে সুখের। কী ফুরফুরে আরামে তেনারা আসেন-যান। বিয়ের পর শতাব্দীর কাছে শুনে বুঝেছে ওখানের অবস্থাও প্রায় একই।

'জানো, সালোয়ারের ওড়নাটা যদি কারও গায়ে একটু লেগে থাকে, এমনভাবে খ্যাঁক খ্যাঁক করে সরিয়ে নিতে বলে, যেন আমার ঘর মোছার ভিজে ন্যাতাটা ওর গায়ে ঠেকিয়েছি!' ঝগড়ার যে কত বিচিত্র বিষয় হতে পারে, তার কয়েকটা উদাহরণ শুনেই হাঁ হয়ে গিয়েছিল বরুণ।

হেদিয়ে পড়ছিল দুজনেই। প্রথম দিকে দুজনেরই রোজগার কম ছিল। সঙ্গে বয়সটাও কম ছিল বলে চালিয়ে গেছে। এখন শতাব্দী একটু ভারী হয়েছে। বরুণও প্যান্টের হুক তলপেটে আটকায়। আর পোষাচ্ছিল না এই ভাতে মরা রৌদ্রে পোড়া জীবন। কলকাতায় থাকার প্ল্যানটা মাস ছয়েক আগে শতাব্দীই একদিন দিয়েছিল। বরুণ প্রথমটায় আঁতকে উঠেছিল শুনে। ওদের বাড়িটা বিশাল। ইংরেজি এল শেপের। ঘরের লাগোয়া লাল সিমেন্টের বারান্দা। বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চে ন্যাড়া শুকনো তুলসীগাছ। মোট ন-টা বড় বড় ঘর। সবক'টা একেবারে তৈরি হয়নি। বরুণের জন্মের আগে পাঁচটা ছিল, চারটে ঘর বরুণ নিজের চোখে হতে দেখেছে। বাবা আগে থাকত পাইকপাড়ায়, ভাড়াবাড়িতে। মায়ের কাছে শুনেছে বাবার ভীষণ স্বপ্ন ছিল নিজের, একেবারে নিজের একখানা বাড়ির। রোজগার কম ছিল বলে কলকাতার দরে কুলোয়নি। তাই এই রিষড়ার বাগপাড়ার জমি কিনে পেল্লায় একখানা বাড়ি বানিয়ে বরুণকে দিয়ে গেছেন। বরুণের এখনও মনে পড়ে প্রতিবছর শীতকালে বাড়ির সামনে লরি থেকে ইট নামত, বালি পড়ত। সিমেন্টের ভ্যান আসত পরপর। বাবা দিনের পর দিন অফিস কামাই করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। নতুন ঘর উঠছে, কিংবা মস্ত মেরামত হচ্ছে। অনেক সময় নিজেই মিস্ত্রিদের সঙ্গে কাজে লেগে পড়তেন। বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই বাড়ি। দেওয়ালের প্রতিটি ইট কেমন সব মুখস্থ ছিল বাবার। এই পাড়াটার জমি নীচু। বর্ষায় একহাঁটু জল জমে যায়। যার ফলে বছর বছর জমিতে মাটি ফেলেও খুব একটা

সুবিধা করতে পারেননি বাবা। বাড়ির ভিত বসে যাচ্ছিল। লিংটেলে লম্বা ফাটা দাগ। কোনও রিপেয়ারিং বেশি দিন টিকত না। আজীবনের রোজগারের সিংহভাগ স্রেফ বাড়িটাকে খাইয়ে গেছেন বাবা। ইটে নোনা। চুন খসে পড়ে। ফাঁপা প্লাস্টার।

'ঘর হচ্ছে লক্ষ্মী, বুঝলি। এর জন্যে খরচ করলে সঞ্চয় কখনও কমে না, বাড়ে।' মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেও বিছানায় শুয়ে বরুণকে বুঝিয়েছিলেন বাবা। তখন রোগটা গোটা শরীর বিষিয়ে তুলেছে। হাড়ের ক্যানসার। সেই খরচের চাপেই বরুণ আর শতাব্দী জেরবার। তার মধ্যেই বাবা ডেকে বললেন, 'সামনের দিকে সবচেয়ে পুরোনো সুরকির গাঁথনিওলা ঘরটায় নোনা ধরে সিলিং, দেওয়াল থেকে প্লাস্টারের চাঙড় খসে পড়েছে। পুরো চটিয়ে আবার প্লাস্টার করতে হবে।' বরুণ বোঝাল কোনও লাভ নেই। এই পুরোনো বাড়ি, বছর ঘুরতে ঘুরতে আবার হবে। বাবা শিশুর মতো অভিমানী গলায় বলেছিলেন, 'লাভ নেই বললে হয়! তোরা তো জামাকাপড় কিনিস, পরিস, তো একটু সেলাই খুলে গেলে কি ফেলে দিস জামাটা, না সেলাই করে নিস?' বল?' বরুণ আর কথা বাড়ায়নি। রিপোয়ারিংও করেনি। কয়েক দিন পর মা বলতে এসেছিল বাবার হয়ে। 'হ্যাঁরে মানুষটা এতবার করে বলছে, একবার দে না করে। আর ক'টা দিনই বা...'

'দেখো মা, এই ভাঙা বাড়িতে টাকা ঢালার মতো ফালতু খরচ আর আমি করতে পরব না। এমনিতেই এত খরচ...' কথাটা শেষ করেনি বরুণ। মা-ও বুঝে চুপ করে গেছিল। বাবাও চুপ হয়ে গেছিলেন একেবারে। তার পর থেকে বরুণের সঙ্গে আর প্রায় কথাই বলতেন না। মাস কয়েক পর চুপ থাকতে থাকতেই একদিন চলে গেলেন বাবা— যাঁর কাছ থেকে বরুণ শিখেছিল জলছাদ কাকে বলে, ছাদ ঢালাইয়ের দিন কেন মিস্ত্রিদের মিষ্টি খাওয়াতে হয়, নতুন মেঝে হওয়ার পরের দিন কেন দরজায় মাটির বেড় দিয়ে ঘরে গোড়ালি-জল করে রাখতে হয়। আরও অনেক কিছু।

'মা জানে?'

'উঁহু।'

'বলোনি?'

'বলব, সময় হলে। চলো এবার।'

'আর একটু থাকি না?' আদুরে গলায় বলল শতাব্দী।

'আর ক'দিন পর থেকে পুরোটাই থাকতে হবে ম্যাডাম,' গর্বিত গলায় বলল বরুণ, 'চলো, চলো, আরও দেরি হলে নীল আবার চটে যাবে।'

আজ নবমী। নীলকে ঠাকুর দেখতে নিয়ে যেতে হবে। দুপুরে দুজনে মা আর নীলকে 'একটা কাজ আছে' বলে বেরিয়েছিল। নীলকে ইচ্ছে করে নেয়নি বরুণ। ও ব্যাটা বাড়ি ফিরে ঠামকে ঠিক বলে দেবে সব। মা শুনলেই তুমুল আপত্তি, কান্নাকাটি শুরু করবে। পুজোর এই ক'টা দিন ছুটির মধ্যে ফালতু অশান্তি পোহাতে ভালো লাগে না।

'ঘরটা যা সাজাব না! দেখবে হাঁ করে।'

'বেশ, দেখব।' হাসতে হাসতে বলল বরুণ।

'তোমাদের বাড়িটা সত্যিই বাইরে থেকে দেখলেই মনে হয় হরপ্পার সঙ্গে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।'

'তোমাদের বাড়ি'। বিয়ের পনেরো বছর পরেও এই শব্দটা ব্যবহার করে শতাব্দী। কেন, কে জানে! প্রত্যেক বারই ঝিনঝিন করে ওঠে বরুণের কান দুটো।

দুই

আজ একাদশী। অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠল। মাথাটা ভার হয়ে আছে। কাল দশমীর রাতে পাড়ার বন্ধুরা মিলে ক্লাবে চুটিয়ে আড্ডা মেরেছে। শ্যামল দুটো সেভেন ফিফটির ব্লু লেবেল এনেছিল। ছ'জন মিলে মটন চাপ দিয়ে মেরে অনভ্যাসের টাল খেতে খেতে অনেক রাত্রে কোনওমতে

বাড়ি ফিরেই বিছানায় ঝপাস। মাঝরাতে বমি করে বিছানা, ঘর ভাসিয়েছে বরুণ।

'অভ্যেস নেই যখন কী দরকার ওসব ছাইভস্ম খাওয়ার।' স্রেফ এইটুকু বলে শতাব্দী নিজে হাতে বমি সাফ করেছে। বরুণ জানে এর বেশি শতাব্দী এখন কিছুই বলবে না। বরুণের বহু দোষ হাসিমুখে বরণ করবে। নইলে ওই বমি বরুণকেই ন্যাতা-বালতি নিয়ে মুছতে হত। আজকে যদিও বরুণের অফিস খুলে গেছে, তবে ও যাবে না প্ল্যান করেই রেখেছিল। চার দিন টানা ছুটির পর যে একটা ছুটির রেশ জন্মায় সেটা কাটাতে আর একটা ছুটি লাগে।

'উঠেছ?' চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, শতাব্দী, 'ওদিকে শোনও তোমার ছেলের কথা।'

'কী হল সাতসকালে?'

'বাবু এবাড়ি ছেড়ে এক পাও অন্য কোথাও নড়বেন না বলেছেন। এখানকার বন্ধুরা না কি খুব ভালো। তারপর উত্তর মাঠটায় না কি পার্ক তৈরি হচ্ছে। আমি শিওর তোমার মা এসব শিখিয়ে দিয়েছে নীলকে।'

মাথা গরম হয়ে গেল বরুণের, 'তোমারই বা কী দরকার ছিল সক্কালেই ওদের এসব বলার! যা বলার আমিই বলতাম।'

'তুমি বলতে! তাহলেই হয়েছে। বছর গড়িয়ে যেত তোমার বলতে। মা চোখ পাকালে এখনও তো ফ্যাক করে কেঁদে ফেলবে।'

'ফালতু কথা বোলো না তো! নীলকে ডাকো।'

শতাব্দী বেরিয়ে গেল। একথা অবশ্য ঠিক, বাবা ছিল বরুণের বন্ধুর মতন। জীবনে মারধর তো দূরের কথা, কোনওদিন বকাঝকাও করেননি। পিটুনি, শাসানি সব মায়ের কাছ থেকে। সংসার চালানোর পুরো দায়িত্ব ছিল মায়ের। বাবা শুধু মাইনের টাকাটা মা-র হাতে তুলে দিয়েই খালাস। যার ফলে এই সংসারের ওপর মায়ের একটা অদৃশ্য কর্তৃত্ব চলে এসেছিল বরাবর। বরুণের বিয়ের পরপরও সেটা ছিল। শতাব্দী চাকরি করা আপডেটেড মেয়ে বলে এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। এমনিতে

শাশুড়ি-বউতে যেমন টক-ঝাল-মিষ্টি সম্পর্ক হয় তেমনই ছিল। 'তোমার মায়ের খুব বড্ড বেশি' কিংবা 'ভদ্রমহিলা নিজেকে যে কী ভাবেন?' এমন টুকটাক মন্তব্য ছাড়া বরুণকে বিশেষ আর কিছু পোহাতে হয়নি। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর কী এক অদ্ভুত কারণে মা ক্রমশ গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। নীল ছাড়া বরুণ আর শতাব্দীর সঙ্গে খুব বেশি একটা কথাবার্তা বলত না। ঠাকুরঘর আর নিজের ঘর নিয়েই ব্যস্ত থাকে সারাদিন। বরুণ রান্নার লোক রেখে দিয়েছিল বলে রান্নাঘরের দায়িত্বটা অনেকদিন আগেই মায়ের কাছ থেকে ছেড়ে গিয়েছিল।

নীল হুড়মুড় করে ঢুকেই ঘোষণা করল, 'আমি যাব না। কোথাও যাব না।' ক্লাস থ্রি-তে পড়া ছেলের আপ্রাণ বিদ্রোহ। বরুণও ওর বাবার মতো চেষ্টা করে ছেলেকে বকাঝকা ছাড়া মানুষ করতে। শাসকের ভূমিকাটা শতাব্দীর। অবশ্য নীল এক কথায় ভালো ছেলে। শুধু একটু একগুঁয়ে, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতো।

'এদিকে আয়, আমার পাশে বোস', বলে নীলকে দু-হাতে তুলে নিজের পাশে বসাল বরুণ।

নীল হাঁ করে বরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কাল রাত্তিরে তোমার ভমিটিং হয়েছিল?'

একটু চমকাল বরুণ, 'কে বলল? মা?'

'না, আমি দেখেছি।'

'সে কী রে, উঠে গেছিলি!'

'হুঁ। এখন আর করবে না তো?'

'না-না।' হেসে ফেলল বরুণ।

'জানো, বিড্ডুর বাবা রোজ রাত্তিরে তোমার মতো ভমিট করে।'

'অ্যাঁ, কে বলল?'

'বিড্ডুই বলেছে।'

নীলের বন্ধু বিড্ডুর বাবা অয়ন মুখার্জি, সিটিও। বউটা ব্যাপক দেখতে। লোকটা ঘুষখোর তা জানা, কিন্তু মালখোর জানা ছিল না। জেনে অদ্ভুত ভালো লাগল বরুণের।

'আর কিছু বলেছে?' জিগ্যেস করেই বরুণের মনে হল, ছি-ছি নিজের এইটুকু ছেলেকে এসব কী জিগ্যেস করছে!

'তোকে কী বলেছে মা?'

'আমরা এখান থেকে চলে যাব কলকাতায়। কিন্তু আমি যাব না বাবা, আমার বন্ধুরা সব এখানে। আমি যাবই না। তারপর উত্তর মাঠে...'

'শোন শোন, আমরা যেখানটায় যাব, সেখানে আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি ওখানে তোর প্রচুর বন্ধু হবে। সবাই খুব ভালো। আমি নিজে কথা বলেছি। আর ফ্ল্যাটটায়, মানে আমাদের নতুন বাড়িটার একদম সামনেই দারুণ একটা পার্ক। ছ-খানা বড় বড় দোলনা আছে, সুইমিং পুল আছে।'

নিজের ছয় বছরের ছেলেকে সাতসকালে বেমালুম ঢপ মেরে আড়চোখে তাকাল বরুণ। সোজাসুজি তাকাতে অস্বস্তি হচ্ছিল। বেগতিক পরিস্থিতি দেখলেই বরুণ চিরকাল এভাবেই কেস করে এসেছে। শতাব্দী রেগে গেলে বলে 'এসকেপিস্ট', অবশ্য এখন বেশ কিছু দিন বলবে না।

'কিন্তু আমাদের আমগাছ আর পেয়ারাগাছ দুটো?'

'ওগুলো অবশ্য...' থেমে গেল বরুণ। হিমসাগর আর পেয়ারাগাছ দুটো বাবার বসানো। সবক'টা গাছেরই ফলন বেশ ভালো, পেয়ারাগুলোর ভেতরটা লাল। বাবা লাগিয়েছিলেন। তখন বরুণ কলেজে পড়ে।

'তবে আমরা তো আর পুরোটা চলে যাচ্ছি না।'

'তবে?'

'এ মা! মা তোকে সবটা বলেনি?'

'না তো, কী?' ছেলের চোখে চিকচিক করে ওঠা আশা মাখানো কৌতূহল।

সেটাকে আরও চাগিয়ে দিয়ে বরুণ আয়েশ করে বলল, 'আমরা তো এই বাড়িটা পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছি না। এভরি উইকএন্ডে এখানে এসে থাকব।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। তাহলে তোর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হবে।'

'কিন্তু বাবা...'

'কী কিন্তু?'

'ঠাম কাঁদছে।' বিরক্ত লাগল বরুণের।

'কেন, কাঁদার কী হল?'

'আমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব শুনে।'

'যা গিয়ে বল তালে সবটা।' শুনেই বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে চলে যাচ্ছিল নীল, 'এই শোন, শোন।'

'কী?'

'এখনই বলিস না, একটু পরে বলিস।'

'কেন?'

'এমনি...আচ্ছা যা।'

বিছানার পাশে রাখা ঠান্ডা চায়ের কাপটা সুড়ৎ করে মেরে দিয়ে উঠল বরুণ। আজকে নীচের দিকে কোনও বেগ আসছে না। এমনিতেই কনস্টিপেশনের ধাত। তার ওপর কাল রাতে পেটে ওই জিনিস পড়ে বমি-ফমি হয়েছে। সুতরাং আজ হওয়ার নো চান্স। ভেবে বিষণ্ণ হয়ে উঠল মনটা। তবু নিয়মরক্ষার জন্য বসল গিয়ে।

বাজারে আজকে মটন কিনবে ভেবেছিল বরুণ। কিনল না। চিকেন কিনল। পেটের ভেতর ক্রমাগত ভুটভাট করছে। বাড়ি ফিরে বাজার রেখে নিজের ঘরে ঢুকতেই নীল দৌড়ে এল। আজ রান্নার মাসি আসেনি। শতাব্দী রান্না শুরু করে দিয়েছে। খুব উৎসাহ নিয়ে করছে। এখন মায়ের জন্য নিরামিষ পদ হচ্ছে। এরপর ওদেরটা। মা ছোঁয়াছুয়িতে অত কঠোর নয়, হয়তো বাধ্য হয়েই। ঠিক জানা নেই।

'ও বাবা ঠাম না গেলে আমিও যাব না।'

ভালো লাগছে না সকাল থেকে এক প্রসঙ্গ। বিরক্তিটা চেপে রেখে বরুণ বললে, 'কেন, কী হল?'

'ঠাম যাবে না বলেছে।'

'কেন যাবে না?'

বরুণ মনে মনে বলল, বড় হয়ে ন-দশ ঘণ্টা অফিসে গাধার খাটুনির পর রোজ রোজ স্ট্র্যান্ড রোডে এক ঘণ্টা ধরে বালতি বালতি কালো ধোঁয়া গিয়ে যখন এই ভাঙা বাড়িতে ফিরবে তখন আর এই কথা বলবে না চাঁদ।

'যা ঠামকে ডাক। আচ্ছা থাক, আমি যাচ্ছি। তুই যা নিজের ঘরে।'

'কী করব?'

'ছবি আঁক গিয়ে।'

'ওয়াল পেন্টিং করব!'

একটু থেমে বরুণ বলল, 'বেশ কর গিয়ে।' ছেলেটার অদ্ভুত শখ। কাগজে ছবি আঁকতেই চায় না। হয় মেঝেতে, না হয় দেওয়ালে বড় বড় ছবি আঁকবে। ওর নিজের ঘরের দেওয়ালটা তো প্যাস্টেল ঘষে প্রায় ভরিয়ে ফেলেছে। অন্যান্য ঘর-বারান্দাও রং পেনসিলের হাত থেকে খুব একটা রেহাই পাইনি। বাবা থাকতে বকা দিত খুব। এখন বকা দেওয়ার মতন তেমন কেউ নেই। শতাব্দী বলে নীল নাকি গতজন্মে ম্যুরালিস্ট ছিল। ম্যুরাল পেন্টিং করত। আঁকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে বরুণ। এখন বেশ ভালোই আঁকে। কিন্তু যত প্র্যাকটিস ওই দেওয়ালেই। চুনবালি-খসা এবড়োখেবড়ো দেওয়ালে মানুষ, পাহাড়, গাছ, নদী।

গুটিগুটি পায়ে মায়ের ঘরে ঢুকল বরুণ। মা ঘরের ঝুল ঝাড়ছিল।

'মা।'

থমকে দাঁড়াল মা। মুখটা ক্লান্ত, ভার। চোখ লাল। তাকাল বরুণের দিকে। ডান হাতে ঝুলঝাড়ু।

গলা খাঁকরে নিয়ে বরুণ বলল, 'কী ব্যাপার, নীল বলছে তুমি কান্নাকাটি করছ?' যতটা সম্ভব ক্যাজুয়ালি বলল বরুণ।

'নাহ্ কিছু হয়নি তো!' বলে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মা।

'শোনও, শোনও, আমি তোমাকে সব বলতামই। এই জাস্ট দু-দিন হল ঠিক করেছি। এখনও ফাইনাল কিছুই হয়নি। মানে...'

মা নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'কবে যাচ্ছিস তোরা?'

'তোরা মানে! তুমিও তো যাবে।'

'নাহ্।' অনেকদিন পর মায়ের গলায় সেই পুরোনো ঝাঁঝ, 'আমাকে ছেড়ে দে।'

'ছেড়ে দে বললেই হবে! এই বড় বাড়িতে তুমি একা একা কী করবে? তাছাড়া...'

'তাছাড়া কী?' চমকে উঠল মা, 'বিক্রি করে দিয়েছিস বাড়িটা?'

'ধুস, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি! খামোখা বিক্রি করতে যাব কেন?' একটা কথা অবশ্য কারও জানা নেই, বিক্রির চেষ্টা বরুণ করেছিল। প্রোমোটার এসে বাইরে থেকে দেখেও গেছিল বরুণের দাঁত খিঁচানো বাড়ি। দেখেশুনে যা দর দিয়েছিল তাতে বরুণ আর শতাব্দীর এক বছরের যাতায়াতের ভাড়াও উঠবে না।

'দাদা, এমনিতেই তো আপনার বাড়ি স্টেশন থেকে এত দূরে যে ফ্ল্যাট বানানো যাবে না। দু-নম্বর এবাড়ির যা হাল কোনও ভ্যালু নেই। আছে শুধু জমিটুকু। এখানে আর জমির দাম কত বলুন না? আমি তো ঠিক দামই বলেছি। ভেবে দেখুন।' দাঁত বার করে বলে গিয়েছিল প্রোমোটার।

বরুণ আশা করেছিল বাড়িটা ঠিকঠাক দামে বিক্রি হলে বাকি হোম লোন নিয়ে একটা ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। এসব অবশ্য শতাব্দীও জানে না। শুনলেই বলবে, 'দেখেছ তো, আমি বললে শুনতে খারাপ লাগে। যা ধ্যাড়ধেড়ে জায়গায় বাড়ি বানিয়েছিল তোমার বাবা।' এসব কথা বরুণ নিজে ভাবলেও অন্যের মুখ থেকে শুনতে খারাপ লাগে। যেখানেই হোক, যেমনই হোক, তবু একটা কিছু সম্পূর্ণ নিজের বানিয়েছিল মানুষটা। আপ্রাণ ভালোবেসে, নিজের স্বপ্নটুকু

সফল করতে পারা কি কম বিস্ময়ের। ক'জন পারে?

'শোনো, শোনো, আমার কথাটা শোনো,' বলতে বলতে এগিয়ে গেল বরুণ, 'এদিকে তাকাও, আমার দিকে', মা-র ফেরানো চিবুকে হাত রেখে বরুণ নিজের দিকে ফেরাতেই ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল মা। অনেক, অ-নে-ক দিন পর। বাবা মারা যাওয়ার দু-দিন পরে আলমারি থেকে বাবার ধুতি-পাঞ্জাবিগুলো বের করতে গিয়ে এভাবে কেঁদেছিল মা।

ভালো লাগছিল। অদ্ভুত ভালো লাগছিল বরুণের। মা-র মাথায় হাত রেখে বলল, 'মা, আমার, শতাব্দীর প্রবলেমটাও একটু বোঝো প্লিজ। সারাটা জীবন এই নৃশংস ডেলি প্যাসেঞ্জারি, ষাট বছরও টিকব না এভাবে চললে।'

'তোর বাবাও তো করেছে।'

'সেদিন আর এদিন এক হল। তখন পপুলেশন এত ছিল না। এখন লোকাল ট্রেনে ওঠা যায় না। অফিস টাইমে হাওড়া স্টেশনে দু-তিনটে লোকাল একসঙ্গে ঢুকলে সাবওয়ে পর্যন্ত পৌঁছোতে আধঘণ্টা লেগে যায়। লোকের চাপে বুকের খাঁচা ভেঙে যাওয়ার অবস্থা হয়। বছরের পর বছর এভাবে আর পারা যায়, বলো? তারপর ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের দুজনের রোজগার সব মিলিয়ে খারাপ নয়। একটু তো শখ হয় নিজেদের, বলো! মানে ঘরগুলো...একটা বাড়ি একটু মনের মতো সুন্দর করে সাজাই।'

বরুণ জানে একথার পরেই মা বলবে, কেন, এই বাড়িটা কি সাজাতে পারিস না? সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এ বাড়িটার যা অবস্থা, দেখেছ তো, বছর বছর সারিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। এত বড় বাড়ির অ্যানুয়াল মেনটেনেন্স যা তাতে...এই তো তোমার ঘরটাই দেখো। দেওয়ালের, ছাদের প্লাস্টার ফেঁপে গেছে, দুটো জোরে টোকা মারলে চাঙড় খসে পড়বে। সিলিংয়ের রডে জল ঢুকে ঝরঝরে হয়ে আছে, বিমটা লম্বা হয়ে দু-ভাগ। এমন সব ঘরে একটা ভালো ফার্নিচার পর্যন্ত শখ হলে কিনে সাজাতে পারি না। ভালো লাগে, বলো?'

মা চুপ করে অসহায়ের মতো শুধু তাকাল বরুণের দিকে, ফোঁপাচ্ছিল।

কেঁপে কেঁপে উঠছিল থিরথির করে। বরুণ বুঝতে পারছিল নীল এতক্ষণ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছিল এদেরকে। এইমাত্র সরে গেল। ওর নিজের ঘরের অরণ্যদেব আঁকা দরজা বন্ধ হল আলতো শব্দে। ও-ও কি কাঁদবে এখন?

'আর তাছাড়া প্রত্যেক শনি আর রবিবার তো আমরা এবাড়িতে এসেই থাকব।' মা জানে, বরুণও ভালোভাবে জানে এই প্ল্যানটায় আয়ু ক'দিনের।

'কবে যাবি?'

'দেখি, লক্ষ্মীপুজোটা যাক। ঠাকুরমশাইকে জিগ্যেস করে একটা ভালো দিন জেনে রেখো তো! আর কিন্তু কান্নাকাটি করবে না। ঠিক আছে?'

মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বরুণ নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় শতাব্দী রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'রাজি হল?'

উত্তর দিল না বরুণ।

বরুণ ছোট থেকে দেখে আসছে ওদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয় খুব ঘটা করে। বাবা বাজারে গিয়ে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা ধরে খুঁজে সবচেয়ে সুন্দর দেখতে ঠাকুরটা নিয়ে আসতেন। বরুণও সঙ্গে যেত। অধৈর্য হয়ে উঠত শেষের দিকটায়। ঠাকুর কেনার পর শুরু হত পুজোর জিনিসপত্র, সবজি বাজার। একটু বড় হওয়ার পর বরুণ বুঝেছে বাবা খরচের দিক দিয়ে অন্যান্য সব ব্যাপারে খুব হিসেবি হলেও, এই পুজোটায় কোনও হিসেব করতেন না। দু-হাতে দেদার খরচ করতেন। নিজেই পুজোয় বসতেন বাবা। সেদিন বরুণদের বাড়িটা টুনি লাইটের চেন দিয়ে সাজানো হত। বাবা বলতেন লক্ষ্মী ঠাকুর অন্ধকার একদম পছন্দ করেন না। তিনি আলোয় আসেন। বরুণ ছোটবেলায় একবার নিজের কানে শুনেছে বাবা পুজোর আগের দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে মাকে বলেছিলেন, 'আমার এই গৃহে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আছেন। আমি বুঝতে পারি।'

বরুণ পারে না। অনেক চেষ্টা করেও পারে না। চোখ মেলে

ভাঙাচোরা বাড়িটার দিকে তাকালেই কেমন শ্রীহীন মনে হয়। বাবা চলে যাওয়ার বছরটায় অশৌচের জন্য পুজো বন্ধ ছিল। তার পরের বছর বরুণও বাবার মতোই সুন্দর করে গুছিয়ে পুজো করার চেষ্টা করেছে। ঠাকুর কেনা থেকে শুরু করে বাজার করা, দশকর্মা, লাইট দিয়ে বাড়ি সাজানো, সব। ছোটবেলায় বরুণ আলপনা দিত। বারান্দা থেকে লক্ষ্মীঠাকুরের হেঁটে আসা পায়ে চিহ্ন ঠাকুরঘরে পাতা আসন পর্যন্ত আঁকত। এখন নীল আঁকে। বরুণের চেয়ে ভালোই আঁকে।

পুজো কাল। আজকে অফিস থেকে একটু বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়েছিল বরুণ। স্টেশন বাজার ঘুরে অনেক ঘেঁটেঘুঁটে একটা মূর্তি কিনল। ভালোই দেখতে, বেশ বড় সাইজ। এ বাড়িতে এবছরই শেষ পুজো। দু-ব্যাগ ভর্তি সবজি বাজার, ফল, মিষ্টি, দশকর্মা, গামছা অমুক-তমুক সব কিনে রিকশায় চেপে রাত্রে বাড়ির সামনে এসে থামতেই চমকে উঠল বরুণ। বৃদ্ধ, বুকের পাঁজর বার করা শীর্ণ বাড়িটার গায়ে ঝলমলে আলোর চাদর ঢাকা দেওয়া। ইলেকট্রিশিয়ান টুনি বাল্‌বের চেন লাগিয়ে দিয়ে গেছে। মারা যাওয়ার ঠিক ক'দিন আগে, বাবা যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন, হঠাৎ একদিন বরুণের ইচ্ছে হয়েছিল বাবাকে নিজে হাতে সাজাতে। আলমারি খুলে বাবার সবচেয়ে প্রিয় গরদের পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড় ধুতিটা বার করে বাবাকে শোয়ানো অবস্থাতেই পরিয়ে দিয়েছিল। বিছানায় প্রায় মিশে যাওয়া স্রেফ চামড়ায় মোড়া কঙ্কাল শরীরটায় ঝকঝকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাবাকে সেদিন ঠিক এই বাড়িটার মতোই দেখতে লাগছিল!

'ভাড়াটা দেবেন?'

'রিকশাওলার ডাকে সংবিৎ ফিরল বরুণের। ভাড়া মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকল। নীল আর মা দুজন মিলে ঠাকুরের সিংহাসনে রাখা সব ছোট ছোট ঠাকুর-দেবতার ফটোগুলো জল-ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছে। বরুণদের বাড়িতে কোনও দেওয়ালে বাবার ফটো ঝোলানো নেই। শুধু একটাই ছোট্ট ফটো ঠাকুরের আসনে রাখা। বাবা নিজেই, তখনও রোগটা অত জেঁকে বসেনি, একদিন বলেছিলেন, 'আমি

যদি চলে যাই, দেওয়াল লটকে রাখিস না যেন। ওতে আমারও কষ্ট, দেওয়ালেরও কষ্ট।' বাবার এই ফটোতে কপালে রোজ পুজোর সময়ে চন্দনের টিপ দেয় মা। শতাব্দী ঘরদোর গুচোচ্ছে। মালপত্রগুলো ব্যাগ থেকে বের করতে করতে মাকে জিগ্যেস করল, 'মূর্তি কেমন হয়েছে মা?'

'ভালো। বেদিতে বসিয়ে দে। দাঁড়া শাঁখটা নিই।'

কাঠের জলচৌকির ওপর লাল আসন পাতা বেদিতে মূর্তি বসানোর পরেই আবার কেঁদে ফেলল মা।

'কী হল আবার? আরে, কাঁদছ কেন?'

'ও ঠাম...ঠাম...' নীলের গলাতেও সঙ্গে সঙ্গে...

'না, এমনি', চোখ মুছতে মুছতে বলল মা।

'না, বলো কেন কাঁদছ?' এগিয়ে গেল বরুণ, 'অ্যাই নীল, ঘরে যা তো!'

'আজকে ওই মানুষটা বেঁচে থাকলে তুই এই বাড়ি ছাড়তে পারতি?' চিবুক কাঁপিয়ে প্রশ্ন করল মা।

'আহ্ মা, থাক না এসব কথা। তোমাকে আর কতবার বোঝাব বলো তো? বাড়ি কি আমি বেচে দিয়েছি? আমাদেরই তো থাকবে।'

আজ সারাদিন ধরে সবাই পুজোর জোগাড়ে ব্যস্ত। মা ঠাকুরঘরে। শতাব্দী রান্নায়। নীল পিটুলিগোলা আর তুলো নিয়ে এন্তার যেখানে পারছে আলপনা দিচ্ছে। আর বরুণের প্র্যাকটিকালি কোনও কাজই নেই। শুধু বার বার এঘর ওঘর করছে। দুবার মুদির দোকানে গেছে। কাজ না থাকলেও ব্যস্ত থাকার ভীষণ চেষ্টা করছে। এই বাড়িটায় এটাই শেষ লক্ষ্মীপুজো। পুজোটা যেন খুব সুন্দর আর সুষ্ঠভাবে হয়, তার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল বরুণ। বার কয়েক মায়ের ঘরে গেল। বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো ঘর দুটোয় একটায় একটা কালো কাঠের উঁচু খাটটাতেই

ছোটবেলায় বরুণ বাবা-মা-র মাঝখানে শুত, এখন মা একা শোয়। টানটান চাদর পাতা। চারটে দেওয়ালেই নোনা। সেজন্য অনেকদিন হল আর রং করা হয় না ঘরটায়। পুরোনো চুন খসে প্লাস্টার বেরিয়ে গিয়ে কোথাও রবীন্দ্রনাথ, কোথাও কেশরওয়ালা সিংহের ছবি। মা একা থাকলেও এ ঘরটায় এখনও বড্ড বেশি বাবা বাবা গন্ধ। বরুণ বাইরে বেরিয়ে এল। অস্থির লাগছে শরীরটা। উপোসের জন্য কি না কে জানে। খালি পেটে থাকা খুব কঠিন। ঠাকুরঘরের তাক থেকে পুরোহিত দর্পণ খুলে লক্ষ্মীপুজোটায় বেশ কয়েকবার চোখ বোলাল, টিভি দেখল। দুপুরে অল্প সাবু খেয়ে খানিকটা ঘুমোল।

সন্ধে হল। পুজো করার জন্য বাবার এক সেট গরদের ধুতি আর উত্তরীয় ছিল। ওই ধুতিটা পরে উত্তরীয় গায়ে দিয়ে ঠাকুরঘরে পাতা পুজোর আসনে গিয়ে বসল বরুণ। শতাব্দী রান্না সেরে গা ধুয়ে সুন্দর একটা শাড়ি পরে এসে বসেছে। ভালো লাগছে ওকে দেখতে। নীল ঠামের গা ঘেঁষে চুপ করে বসে। দেখে বেশ অবাক হল বরুণ। কোনওবার পুজোর সময়টায় ওকে ঠাকুরঘরে বসে থাকতে দেখা যায় না তো! পুরোহিত দর্পণটা বাঁ-থাইয়ের ওপর খুলে রেখে পুজো শুরু করল বরুণ। আচমন, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি পরপর এগোতে এগোতে পঞ্চদেবতা, পঞ্চপোচারে। শতাব্দী সময়মতো শাঁখ বাজাচ্ছে। এবাড়ি ওবাড়ি থেকেও শাঁখের শব্দ আসছে। মা স্থানুর মতো বসে।...'ইহ গচ্ছ ইহ গচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর চক্ষুদান। নীল এই প্রথম পুজো দেখছে। 'এটা কী, ওটা কেন?' জিগ্যেস করে শতাব্দীর মাথা খাচ্ছিল।

বরুণ বলে উঠল, 'পুজোর সময় কথা বলতে নেই। এখন দেখে রাখো, পরে জিগ্যেস করবে।'

দেবীর চক্ষুদানের জন্য বেলপাতায় ঘি মাখিয়ে প্রদীপের শিখার ওপর ধরে রেখে কাজল বানাতে হয়। ধৈর্য নিয়ে ধরে রাখতে হয় বেশ কিছুক্ষণ। ছোট্ট থেকে বরুণ দেখেছে এই কাজটা মা-ই করে এসেছে। বরুণও মা-র দিকে বেলপাতা বাড়িয়ে দিয়ে ইশারায় ঘিরের শিশিটা

দেখাল। পুজো করতে করতে বরুণ একবারের জন্যও বাবার ফটোটার দিকে তাকায়নি। প্রচণ্ড অস্তস্থি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তাকালেই...ঠিক কী যে মনে হচ্ছিল। পুজোতে যতটা মন দেবে ভেবেছিল সারাদিনে, তার সিকি আনাও মন লাগছিল না। খালি মনে হচ্ছে কতক্ষণে শেষ হবে, আর ঠাকুরঘর ছেড়ে উঠে পালাবে। অন্য দিকে তাকিয়েও মনে হচ্ছিল বাবা যেন ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন একদৃষ্টে। মায়ের ধরে রাখা প্রদীপের শিসের ওপর ঘি মাখানো বেলপাতায় কাজল জমে উঠেছে। ওই কাজলেই বেলপাতার বোঁটা ঠেকিয়ে দেবীর বীজমন্ত্র বলে প্রথমে বাম চক্ষু তারপর ডান চক্ষু স্পর্শ করিয়ে চক্ষুদান করতে হবে। কাজল জমে উঠতে মা বোঁটা আর পাতাটা দু-হাতে এমনভাবে বরুণের চোখের সামনে এগিয়ে দিতে থাকল যেন...।

'অত উঁচু করে বাড়াচ্ছ কেন?' আচমকা প্রায় অকারণে মাকে আলতো ধমকে উঠল বরুণ। তার পরেই কষ্ট করে হেসে বলল, 'আমার চোখে ঠেকাবে না কি?' প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গায় চিৎকার করে বলে ওঠা কথাটা যেন গমগম করে উঠল এমনি এমনিই।

শরীরটা ভালো লাগছিল না। সোফাতে গা এলিয়ে জোরে টিভি চালিয়ে মনটা হালকা করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল বরুণ। শতাব্দী এসে সোফাতে বসল।

'ওহ্, এত জোরে টিভি চালিয়েছ কেন? আস্তে করো।' বলে রিমোটটা নিয়ে নিজেই মিউট করে দিল।

'বাবা বাবা, ঠাম বেলপাতা পুড়িয়ে কী করল?' নীল দৌড়ে ঘরে ঢুকেই জিগ্যেস করল। বরুণ অসহায়ের মতো শতাব্দীর দিকে তাকাল।

'বেলপাতার কালি দিয়ে মা লক্ষ্মীকে চোখ দেওয়া হয় বাবা।' বলেই শতাব্দী বরুণের দিকে বেশ উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বলল, 'জান, এক ধরনের সাঁওতাল পট আছে সেগুলোর নাম চক্ষুদান পট।'

'সাঁওতাল পট কী মা?' নীলের চটপট প্রশ্ন।

'সাঁওতালরা এক রকমের ছবি আঁকে যেগুলোকে সাঁওতাল পট বলে।' নীলকে স্কুল টিচারের কায়দায় বুঝিয়ে শতাব্দী আবার বরুণকে নিয়ে পড়ল, 'জানো, এই চক্ষুদান ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। লোকচিত্রের ওপর একটা বইতে পড়ছিলাম। শুনছ?...বাব্বা, আমিও তো সারাদিন খেটেছি, তোমার মতো এত এলিয়ে যাইনি তো!'

'না-না, শুনছি, বলো না।'

'সাঁওতালদের ফ্যামিলিতে যদি কেউ মারা যায় তখন তাদের পটুয়া, মানে পট আঁকিয়েরা সেই মৃত মানুষটার একটা ছবি আঁকে। হুবহু দেখতে হয় না, প্রতীকী আর কি। পুরো ফিগারটা আঁকে। শুধু মানুষটার চোখের তারা দুটো আঁকে না। তারপর সেই ছবি নিয়ে তারা সটান হাজির হয় মৃত লোকটার বাড়িতে। ওখানে গিয়ে তার আত্মীয়স্বজনকে বলে ওই মৃত ব্যক্তি দৃষ্টিহীন অবস্থায় পরলোকে ঘুরে ঘুরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। এখন তারা কিছু ভুজ্জি পেয়ে ওই ছবিতে চোখের মণি দুটো এঁকে দিলে তবে মৃত ব্যক্তি দৃষ্টি পাবে। এই বলে বেশ টু-পাইস কামিয়ে নিয়ে চোখের তারা দুটো এঁকে দেয়। ভাবো রোজগারের কী বিচিত্র ধরন!' বলে হাসল শতাব্দী।

বরুণ বলল, 'হুঁ।'

নীল পুরোটা শুনল হাঁ হয়ে। তারপর সাঁই করে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে বিছানায় শুয়েছিল বরুণ। দুনিয়ার যত হাবিজাবি চিন্তা মাথায় গিজগিজ করছিল। শতাব্দী বাথরুমে গেছে।

'বাবা, ও বাবা।' ঘরে ঢুকল নীল।

'কী?'

'একবার এসো আমার ঘরে।'

'কেন?'

'এসো না!'

'এখন না, কালকে যাব।'

'না, এখনই চলো।'

জেদটা আরও বাড়বে। অগত্যা উঠল বরুণ। নীলের ঘুরে ঢুকে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখে সদ্য আঁকা একটা মানুষের ছবি। পাশে তিরচিহ্ন দিয়ে লেখা দাদান। চোখ দুটোয় তারা নেই।

'ও বাবা, দাদান কিন্তু স্বর্গে খুব কষ্ট পাচ্ছে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। আমি যা চাইব যদি দাও, তাহলে চোখ এঁকে দেব।'

মাথাটা চড়াৎ করে গরম হয়ে গেল বরুণের। ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এসব হাবিজাবি কী করছ এখন? চুপচাপ শোও।'

'তুমি এবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না বলো...ও বাবা, তাহলে দাদানের চোখ এঁকে দেব। বলো যাবে না? দিই চোখ এঁকে?

'হা-রা-ম-জা-দা, কী ভেবেছিস শালা! সবাই মিলে আমাকে...' থমকে গেল বরুণ।

বরুণের ছ'বছরের জেদি ছেলে পেনসিল ধরা হাতটা দেওয়ালে আঁকা বাবার ছবির চোখের দিকে এগোতেই বরুণ গুটিয়ে কেন্নোর মতো হয়ে গেল।

'আঁকিস না...চোখ দিস না...নীল প্লিজ...আমি পারব না...আমি পারব না...পারব না...' বলতে বলতে ঘর ছেড়ে টলমল করতে করতে ছিটকে বারান্দায় বেরিয়ে এল বরুণ। গোটা পৃথিবীতে কোজাগরী আলো উপচে পড়ছে। বারান্দার মেঝেতে চোখ পড়ল। নীলের আঁকা আলপনায় মা লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন জ্যোৎস্নার আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে বারান্দা থেকে এই ভাঙা বাড়িটার ভেতর চলে গেছে।

দেশ মার্চ
২০০৯

ডানাওলা মানুষ

'সত্যি কথা বল তো, তুই কি আমাদের মতো জীবন চাস না?' প্রায় পনেরো বছর পরে চন্দ্রশেখরকে প্রশ্নটা করে ফেলল ভানু। আমরা তখন মানেভঞ্জন থেকে ট্রেক করে চিত্রার দিকে এগোচ্ছি। এই দু-কিলোমিটার পথ অসম্ভব খাড়াই। তার ওপর পিঠে রুকস্যাকের বোঝা। আমি, ভানু, গৌর সবাই এই ঠান্ডাতেও ঘেমে স্নান করে উঠেছি। ফোঁস-ফোঁস করে দম ফেলছি। গায়ের জ্যাকেট কোমরে বাঁধা। চন্দ্রশেখর আমাদের থেকে অনেক কম ক্লান্ত। আসলে ওর অভ্যাস আছে। পুরো জীবনটাই তো ব্যাটার টো টো কোম্পানি।

ট্রেকিংয়ের প্রস্তাবটা এনেছিল গৌরের স্ত্রী দেবলীনা। এক কথায় সবাই রাজি, অনেক দিন পর দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। শুধু ভানু কিছুটা পিছিয়ে এসেছিল, 'হ্যাঁ রে এই চেহারা নিয়ে পারব তো!'

কথাটা অবশ্যি সত্যি। ঘুষের পয়সায় মাল খেয়ে শালা এমন বেঢপ চেহারা বানিয়েছে যে নিজের পুরোনো ছবি দেখলে ডেফিনিট সুইসাইড

করবে। ভানুর বউ অঞ্জলি সাহস জুগিয়েছিল। 'আরে সত্তর বছরের বুড়োবুড়ি পারছে আর তুমি পারবে না।'

আসলে বিজয়া দশমীর পর ক'দিন কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায় তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল গৌরের বাড়িতে। দীঘা, ডুয়ার্স, অযোধ্যা পাহাড় ক্যানসেল করে সবশেষে ঠিক হল সান্দাককু।

'তোমাদের বন্ধুকে বলবে না?' প্রশ্নটা করেছিল আমার বউ লীনা।

'আমাদের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, চন্দ্রশেখর।'

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর গৌর ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে বলে দেখব। তবে যাবে না ডেফিনিট।'

রাত্রে বিছানায় লীনাকে বললাম, 'তুমি হঠাৎ চন্দ্রর কথা বললে?' লীনা ঠেস মেরে বলেছিল, 'তোমাদের তো জানি, তিন মাথা একসঙ্গে হয়ে শুধু অফিসের গল্প করবে আর ছাইপাঁশগুলো গিলবে। বরং ওই ছেলেটা সঙ্গে গেলে তবু আমরা ঘুরতে-টুরতে পারব।'

বেশ অবাক হয়েছিলাম আমি। শুধু এর জন্যই...! সেই কতদিন আগে লীনার সঙ্গে কথা হয়েছিল চন্দ্রের। অথচ?...আশ্চর্য! তবে চন্দ্র যে যাবে না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকে সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বেলিয়াতোড়ে চন্দ্রের গ্রামের বাড়িতে খবর পাঠাতেই চন্দ্র রাজি হয়ে গেছিল। একেবারে এক কথায় রাজি হয়ে গেছিল। গৌর শুনে বলেছিল, 'সে কী রে, ব্যাটা রাজি হয়ে গেল! টাকার জোগাড় করবে কোত্থেকে?' যদিও একটা সময় আমি, ভানু, গৌর আর চন্দ্রশেখর শুধু যে একগ্রামের বন্ধু ছিলাম তা নয়, বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে সেই স্কুলজীবন থেকে পরস্পরের হাতে হাত রেখে বড় হয়েছি। তারপর সেখান থেকে সোজা বউবাজারের মেসে থেকে সারাদিন চুটিয়ে টিউশন আর সিটি নাইটে পড়াশোনা। চন্দ্র কর্মাস নিয়ে পড়তে চায়নি। স্রেফ বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে আর আমাদের জোরাজুরিতে কমার্স নিয়েছিল। গ্রাম ছেড়ে কলকাতা আসার পরেই আমাদের ডানাগুলো আরও দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। কফি হাউস

থেকে নন্দন কিংবা কুমোরটুলি থেকে বাঁশবেড়িয়া সব জায়গায় একসঙ্গে উড়ে বেরিয়েছি আমরা। চুটিয়ে আড্ডার মধ্যে সার্ত্র কিংবা বর্হেস থেকে পিকাসো, বার্গম্যান, বড়ে গুলাম সবাই আসত। অবশ্য শুধু পরচর্চা নয়, আমার বাঁশি, ভানুর বরীন্দ্রসংগীত আর গৌরের ভরাট গলার আবৃত্তি ছিল আমাদের জীবন জুড়ে। চারজনের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রশেখরই ছিল প্রতিভায় নির্বাক। ও দেখত, শুনত, প্রচুর পড়ত কিন্তু বলত কখনও-সখনও। হয়তো চন্দ্র একজন কবি ছিল। তবে ওকে কোনওদিন দু-কলম লিখতে দেখিনি কেউ। তবে ও মাঝেমধ্যে বিলিভ অর নট বিলিভ ধরনের কথা বলত। যেমন একবার আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনায় ও হঠাৎ বলে উঠেছিল—আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে মানুষ পাথরের অস্ত্র নিয়ে ব্রেন অপারেশন করত। আর একবার রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা নিয়ে কথা হচ্ছিল। চন্দ্র বলছিল, আদিম যুগের মানুষ মৃত ব্যক্তিকে সযত্নে কবর দিত এবং কবরের ওপর জীবনের প্রতীক হিসেবে লাল রঙের ফুল ছড়িয়ে দিত। এইসব হাজার হাজার পুরোনো কথায় ও কী আনন্দ পেত জানি না। কিন্তু দেখতাম প্রাচীন ইতিহাসের কথা বলার সময় ওর চোখ চিকচিক করছে। ঠোঁটের পাশে লালা জমে উঠেছে। চন্দ্র কি ইতিহাসপ্রেমী ছিল? আদিম ইতিহাসপ্রেমী? জানি না, তবে ও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের মতো ছিল। মোটকথা আমাদের চারজনেরই একটা চুপিচুপি প্রতিজ্ঞা ছিল, দিন আনি দিন খাই জীবন নয়, আমাদের জীবনটা হবে ফুলের মতো। রোজ ভোরে জন্মে রাত্রে মরে যাব। এক-একটা দিন হবে এক-একরকম নতুন।

তারপর সবার প্রথমে চাকরি পেলাম আমি এসবিআই-তে। ভানু সেলস ট্যাক্সে। গৌর একটা ভালো এমএনসি-তে চান্স পেয়ে ঢুকে গেল। চন্দ্র শুধু হাত জড়ো করে বসে রইল। আমরা তিনজনে বহুবার খুঁচিয়েছি ওকে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীপুজো করার পুরুতের মতো সেই টিউশনকেই আঁকড়ে থাকল। হয়তো এর বেশি ওর দ্বারা আর কিছু হতও না। চাকরি পাওয়ার পর আমরা তিনজনেই কলকাতায়

সেটল করে গেলাম। ফিরে গেল শুধু চন্দ্রশেখর।

তারপর ধীরে ধীরে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের উন্নতি...ঘর-সংসার...আরও উন্নতি...আমরা তিনজন এবং চন্দ্রশেখর। নতুন দলটা তৈরি হয়েছিল এভাবে চন্দ্র কখনও-সখনও এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করত। হালকা গল্পগুজব। আগের সেই উষ্ণতা আর পেতাম না। সম্ভবত ও-ও না। ইতিহাস জড়িয়ে থাকা এই মানুষটা আমাদের কাছে অনেক ফিকে হয়ে গেলেও যেন নিঃশব্দে আমাদের বউ-বাচ্চাদের ভেতর সেঁধিয়ে গেছিল। ও আসলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত সবক'টা মিলে। আমরা পুরোনো তিনজন হয়তো তখন একটু ভুরু কুঁচকেই দেখতাম চন্দ্রর নতুন বন্ধুদের। শেষবার চন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয় প্রায় মাস আষ্টেক আগে। হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছিল গৌরের বাড়িতে। তখন চেহারাটা আরও ধসে গেছে। রোদে পোড়া তামাটে রং, চওড়া কাঁধ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে, লালচে নোংরা দাড়ি-গোঁফ, চাঁদিতে হালকা টাক। শুধু চোখ দুটো ছিল সেই আগের মতো ভাসিয়ে দেওয়া। বেশ খারাপ লেগেছিল ওকে দেখে। এমন দশার কারণ জিগ্যেস করায় হেসে উত্তর দিয়েছিল, ও না কি ঝাড়গ্রামের কোন মিগ উপজাতির সঙ্গে প্রায় মাস তিনেক কাটিয়ে এসেছে। পাগলের খেয়াল আর কাকে বলে! সারাজীবন একভাবে থেকে যায় শুধু জড় পদার্থ আর পাগলরা। এই ফিলোজফিটাই আমরা বিশ্বাস করতে শিখে নিয়েছিলাম। শুধু চন্দ্র সেই আগের মতো উড়ত একা একা। কলেজ জীবনের পুরোনো ব্রাত্য ধারণাগুলো নিয়ে এলোমেলো উড়ে বেড়াত। ও কি বুঝত না আমরা ওকে অনেক ছাড়িয়ে চলে গেছি। তবে কেন আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছিল?

যাই হোক তবু অনেকদিন পর আবার চারজন। সঙ্গে আরও তিনজন মহিলা আর দুটো বাচ্চা। আমার ছেলে নীল ক্লাস ফোর। ভানুর মেয়েটা থ্রিতে পড়ে। গৌরের ঝিমলিও ক্লাস ফোরে। হোস্টেলে থাকে, পুজোর পরেই হোস্টেল খুলে গেছে বলে আসতে পারেনি।

ট্রেনে আমরা যখন শেয়ার মার্কেট, সেলসট্যাক্সের অন্দর মহল

কিংবা গৌরের বসের লেডিস সেক্রেটারি প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম তখন চন্দ্র এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল, যেন ও অদ্ভুত তিনটে প্রাণী দেখছে। অসহ্য তাকানো। ভানু তখন গলায় ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলেছিল 'কী রে চন্দ্র তোর সেই মিগদের গল্প আমাদের বউদের একটু শোনা।'

বউগুলোর 'পরে শুনব' গোছের কিছু একটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবক'টা মিলে হামলে পড়ল। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ চন্দ্রদা, শোনান না কিছু।'

যাহ্ শাল্লাহ্!

চন্দ্র একগাল হেসে বলেছিল 'কী বলব, ওদের তো কোনও ভাষা নেই।'

'মানে?'

'আসলে ওরা ভাষায় বড় গরিব। মাত্র গোটা পাঁচেক বিশেষণ আর খুব প্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়া ওদের অভিধানে আর কিছু নেই।

লীনা বলে উঠেছিল, 'ওমা তাই, দারুণ ইন্টারেস্টিং তো! বলুন না ওদের কথা।'

চন্দ্রশেখর বলেছিল মিগদের গল্প। সত্যিই একটা উদ্ভট হাস্যকর গল্প। এমন একটা জাতি, যাদের সম্বল মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা শব্দ। বাকিটা কাজ চালায় শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দিয়ে। আনন্দ বা প্রশংসা জানায় হাততালি দিয়ে। নিন্দে, অপছন্দ বোঝায় কপালে হাত রেখে। ক্ষোভ দেখায় ঋজুভাবে হেঁটে। আর শান্তভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে বুঝিয়ে দেয় সুখে-শান্তিতে আছে। আশ্চর্য!

ভানু টিপ্পনি কেটেছিল, 'বলিস কী রে! তালে লাভারকে আই লাভ ইউ বলে কী করে?'

চন্দ্র হেসে বলেছিল, 'নিঃশব্দতা দিয়ে।'

ভানু যেন গালে একটা সপাটে ঘুষি খেয়ে চুপ করে গেছিল।

চন্দ্র আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'মজাটা কী জানিস অচিন্ত্য, ভাব

প্রকাশের জন্য সভ্য জাতিদের মতো ওদের অজস্র ভাষা না থাকলেও ওরা অদ্ভুত সৎ, শান্ত, ওরা দারিদ্রসীমার নীচে কিন্তু কখনও চুরি করে না, লড়াই করে না, অন্যকে ঠকায় না।'

চন্দ্র কী ইঙ্গিত করছিল? বড্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। শেষে নীল বাঁচাল।

'চন্দ্রকাকু, আদিম মানুষদের কথা বলতে হবে কিন্তু।'

পটু বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ কাকু বলবে কিন্তু।'

চন্দ্রটা পারেও। যত অবসোলেট ব্যাপার নিয়ে ওর কারবার। ভানু একবার অবশ্য বলেছিল যারা বাস্তব জীবনে তেমন কিছু করতে পারে না, তারাই নীতি, অতীত এসবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে মুক্তি খোঁজে, সান্ত্বনা খোঁজে।

বাচ্চা দুটো চন্দ্রর হাত ধরে একটু এগিয়ে হাঁটছিল। বাকিরা একসঙ্গে পেছনে। ভানু হঠাৎ গৌর আর আমাকে ইশারা করে চন্দ্রর কাছে যেতে বলল, গেলাম। তারপর বাচ্চা দুটোকে ধমকাল, 'অ্যাই অত ছুটোছুটি করে না। মায়েদের সঙ্গে থাক।'

ছেলেমেয়ে দুটো ব্যাজার মুখ করে পিছিয়ে এল। চন্দ্র আমাদের দিকে তাকাল। বোধহয় আন্দাজ করেছিল ভানু কিছু বলবে, তখন ভানু এগিয়ে এসে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'সত্যি কথা বলত, তুই কি আমাদের মতো জীবন চাস না।'

চন্দ্র হালকা হেসে উত্তর দিল, 'আমি জীবন চাই না।'

'কী চাস তবে?'

'প্রাণ চাই, প্রাণ। জীবনটা তো একটা গোদা অভ্যেসের ব্যাপার। কী হবে ওই নিয়ে।'

গৌর হঠাৎ দুম করে বলে ফেলল, 'তুই কি মনে করিস আমরা অসুখী?'

দুই

টুংলুতে এক রাত্রি থেকে সেখান থেকে কালিপোখরি। পরদিন বেলা দেড়টা নাগাদ সান্দাকফু পৌঁছোলাম। সত্যি কথা বলতে একেবারে জান বেরিয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। ট্রেকিংয়ের রিস্কটা না নিলেও হত। শালা এত হাঁটা গোটা জীবনে হাঁটিনি। ভানুর হাঁটু ফুলে ঢোল। বারে বারে চাইনিজ বাম লাগাচ্ছে আর অনর্গল খিস্তি ছোটাচ্ছে। টুংলুতে পৌঁছেই একবার ভেবেছিলাম ট্রেকার ভাড়া করে নেব। কিন্তু ব্যাটা চন্দ্রটা...এমন পাহাড়ি ছাগলের মতো ছোটে যে স্রেফ নিজের বউ-বাচ্চাদের কাছে হেয় হওয়ার ভয়ে ঘাড় গুজে হেঁটে গেছি। ফলত চন্দ্রর ওপর ক্ষোভটা আরও বেড়েছে। আমাদের ছেলেমেয়ে আর বউ তিনটে এরমধ্যে কেমন নির্লজ্জের মতো চন্দ্রর ন্যাওটা হয়ে গেছে। চন্দ্র কি ভুলে গেছে আমরা স্রেফ পুরোনো বন্ধু বলে করুণা করে নিয়ে এসেছি। শুধু করুণা করে। পুটু আর নীল সবসময় চন্দ্রর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে রয়েছে। বার কয়েক বারণ করেছি, শোনেনি। শেষে ভানু একবার পুটুকে ধমক দিতে উলটে নিজেই বউয়ের কাছে ঠেলা খেয়েছে। 'রয়েছে থাকুক না, তোমাদের তো কোনও অসুবিধে করছে না।' এরা কে মাইরি! আমাদের বউ-বাচ্চা না অন্য কারও?

হোটেল সানরাইজে দুটো রুম বুকিং ছিল, ব্যবস্থা দারুণ। সবক'টা মিলে বিছানায় সটান ধপাস। ঘুরে বেড়াবার সব ইচ্ছে বেলুনের মতো ফেটে গেছে। মনে হচ্ছে বাকি দিন দুটো এইভাবে শুয়ে থেকে কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি। গৌর বলল, 'শালা এই শেষ, আর জন্মে হাঁটার রিস্ক নিচ্ছি না।'

অঞ্জলি বলল, 'সত্যিই কী অবস্থা তোমাদের! আমরা মেয়ে হয়ে পার করে দিলাম আর তোমরা...'

পুটু বলল, 'আমরাও পেরেছি। বাবা তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, হি-হি।'

'অ্যাই চোপ'।

'হি-হি-হি'।

'আ-হ্' ঝাঁঝিয়ে উঠল ভানু।

চন্দ্র রুকস্যাক থেকে ওর জিনিসপত্র বার করতে করতে আমাকে বলল, 'হ্যাঁ রে তোদের টুথপেস্টটা একটু দিস, আমারটা শেষ।'

'সে কী রে, এরমধ্যেই শেষ। ক'টা দাঁত তোর?'

'খেয়ে দিস নাকি?' ভানু টোন কাটল।

লীনা বলল, 'তোমাদের না খালি ইয়ার্কি'।

'চন্দ্রকাকু ওই পাহাড়টা দেখো কী সুন্দর। ওটায় যাবে গো?' পুটু আবদার করল।

চন্দ্র পুবদিকের কাচের জানলাটা দিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাল। 'কালকে যাব।'

গৌর বলল, 'একা-একা একদম এদিক-ওদিক যাবে না।'

পরিশ্রমের উত্তাপটা গা থেকে উবে যেতেই ঠান্ডা যেন কামড়ে বসল।

সবাই মিলে লেপের তলায় চাপাচাপি দিয়ে শুলাম। দুটো রুমে মোটা আটটা বেড, পুটু ওর মা-র সঙ্গে শুল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর দেবলীনা বলল 'আরে পেট তো চুঁইচুঁই করছে।'

আমার বউ বলল, 'সত্যি, এই ওঠানামা করতে করতে দু-দিনে পেটটাও রাক্ষসের মতো হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'হবে না কেন, দমদমের লোহা গোলা জল তো নয় যে এক বেলা খেলে অন্য বেলা শুধু ঢেঁকুর তুলে কেটে যাবে।'

চন্দ্র বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বলল। 'তোমরা রেস্ট নাও। আমি দেখছি।'

'হ্যাঁ ভাই দেখ একটু। আর উঠতে পারছি না।'

'কুঁড়ের হদ্দ সব' লীনা হেসে বলল।

ভানু উত্তর দিল, 'কেন বাবা, তোমরাই বা কী কোদাল চালাচ্ছ এখন।'

বাড়িতে হলে বোধহয় টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। কিন্তু ট্যালট্যালে বিস্বাদ খিচুড়ি, পাতলা ওমলেট আর খানিকটা চাটনি দিয়ে দুপুরের খাওয়াটা যেন অমৃত লাগল। স্থানমাহাত্ম্য বোধহয়। খাওয়ার পর একটা চূড়ান্ত ঘুমের ইচ্ছে ছিল। ওদের জন্য হল না। সান্দাকফু থেকে যে রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে ফালুটের দিকে চলে গেছে সেদিকে খানিকটা এগিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসলাম। রোদ্দুর অনেক নরম হয়ে এসেছে। খুব ঠান্ডা হাওয়া, চারদিকে শুধু সবুজ আর নীল, দূরের পাহাড়গুলো সবুজ আর আকাশের রঙে মিশে একাকার।

লীনা বলল, 'ওহ্ জীবনে একটা এক্সপিরিয়েন্স হল, কোনওদিন ভুলব না।'

'ও বাবা জানো আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের সবচেয়ে বড় লোক,' পুটু বলল।

'ধ্যাৎ' ভানু ভুরু কুঁচকাল।

'বা রে আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলের সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছি না।'

চন্দ্র মিটিমিটি হাসছিল। বুঝতে পারলাম, বড়লোকের নতুন কনসেপ্টটা ওরই বানানো। বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। ভালোই লাগছিল। হঠাৎ খেয়াল হল বাচ্চা দুটো সেই চন্দ্রর গা ঘেঁষে বসে আছে। পিত্তি জ্বলে গেল দেখে। নীলকে অকারণ ধমক দিলাম। 'একদম ধারে যাবে না। বড়দের সঙ্গে থাকবে।' এমনভাবে তাকাল ছেলেটা...অবজ্ঞা না কি?...নিজের বাপকে! শালা দু-বেলা খাইয়ে পড়িয়ে বড় করছি...।

'এবার খুব ভালো সময়ে এসেছি রে।' চন্দ্র বলল।

'কেন?'

'রাত্তিরে দেখবি।'

গৌর বলল, 'যা ভালো করেছিস মা, আর ভালোতে কাজ নাই।'

'তোমার তো খালি বুড়োটেপনা।' দেবলীনা খোঁচা দিল। তার পরেই বলল, 'অ্যাই চলো না এই রাস্তাটা দিয়ে একটু হাঁটি।'

সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো বউ রাজি। আমরা কেউ উঠলাম না। চন্দ্রও না। আমাদের সঙ্গে বসে রইল। সৌজন্যবোধ না কি?

'ও চন্দ্রকাকু এসো না আমাদের সঙ্গে।'

'আজকে তোমরা যাও। আমি কাল সকালে যাব।'

কলকল করতে করতে ওরা হাঁটা লাগাল। সামনের পাহাড়টার বাঁকে যেতেই অদৃশ্য। সব চুপ, ভীষণ চুপ।

ভানু বলল, 'উহ্! কী চুপচাপ রে মাইরি। কান ফাটিয়ে দিচ্ছে।' সত্যিই। নিস্তব্ধতা যে এমন প্রচণ্ড হতে পারে কোনওদিন ভাবিনি! খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম 'হ্যাঁ রে চন্দ্র এখনও টিউশনিই চালাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।' দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে দাঁত বের হল।

'কোচিং করেছিস?'

'নাহ্, বাড়ি গিয়ে পড়াই।'

'ধুস শালা, এবার কোচিং খোল, এ লাইনে এখন দারুণ পয়সা।'

চন্দ্র হাসল।

'এই জন্য তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। সারাজীবন দাঁত কেলিয়েই গেলি।' কথায় কথা বাড়ছিল। হঠাৎ গৌর বলল, 'এ তো সন্ধে হয়ে আসছে গুরু। তেনারা সব গেলেন কোথায়?

ভানু বলল, 'তাই তো, খেয়ালই হয়নি। একবার দেখবি না কি এগিয়ে।' চন্দ্র গায়ের শাল ঠিক করতে করতে হালকাভাবে বলল, 'ও চিন্তার কিছু নেই, চলে আসবে এরমধ্যে।'

'হুঁহ্, তোমার আর কী। বিয়ে-থা তো করনি। বউ-বাচ্চার জন্য টেনশন কী বুঝবে' বলতে বলতে ভানু উঠল।

আমরাও উঠতে যাচ্ছি। তখনই পাহাড়ের বাঁকের ওদিক থেকে কিচমিচ শব্দ। ওরা ফিরছে।

রাত্তির সাড়ে আটটা। গরমগরম রুটি আর বাঁধাকপির তরকারি খেয়ে সবে যে যার বিছানায় চাপাচুপি দিয়ে শুয়েছি। এমন সময় চন্দ্র হন্তদন্ত হয়ে বাইরে থেকে এসে বলল, 'শিগগির একবার দেখবি আয়।'

'কোথায়?'

'বাইরে।'

'এখন! তোর কি মাথা খারাপ!'

'আয় না একবার। তোদেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

নীল মায়ের পেটের কাছে লেপের ভেতর সেঁধিয়ে ছিল। মুখ বার করে দারুণ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'কী গো চন্দ্রকাকু?'

'চাঁদ।'

ভানু বলল, 'অ, চাঁদ উঠেছে, খুব ভালো। তুই আজ দেখে নে, আমরা কাল সকালে দেখব।'

'কী বলছিস ভানু, যার জন্য এসময় আসা হল সেটাই দেখবি না!'

গৌর বলল, 'বলল তো আমরা কাল দেখব।'

'পাগল না কি! কাল হয়তো দেখবি বৃষ্টি হয়ে কিচ্ছু দেখাই যাবে না।'

দেবলীনা বলল, 'চলো না, এতদূর এসেছি আর এইটুকু বেরোতে পারব না।' অগত্যা বিছানা ছেড়ে লেপকম্বল সব গায়ে ঢাকা দিয়ে বেরোনো হল।

পৃথিবীর প্রথম কবিতা কি চাঁদকে নিয়ে লেখা হয়েছিল? কে সেই আদিমতম পুরুষ যে প্রথম চাঁদের প্রেমে পড়েছিল? এত রূপ...এত রূপ!

চারদিকটায় উজ্জ্বল পারদে মাখামাখি, আর ওপরে ঝকঝকে কালচে নীল এক সমুদ্রের স্থির গভীরে একটি নিটোল মুক্তোর মতো রূপসী বসে রয়েছে। হয়তো আমাদের দিকেই তাকিয়ে; পাহাড়ের নীচে নরম সাদা

লেপের মতো মেঘ জমে আছে। মুহূর্তের মধ্যে আমরা সবাই যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। শুধু মুগ্ধতা নয়, এত সুন্দরের সামনে কেমন যেন ভয় লাগতে শুরু করেছিল। পুটু শুধু বলে উঠল, 'উহ্ কী সুন্দর!'

চন্দ্র ফিসফিস করে বলল 'কোজাগর'।

একটা তীব্র কনকনে হাওয়া দিল। ভেতরের হাড়গুলো যেন কেঁপে উঠল। 'ওরে বাবা রে' বলে ভানু দৌড় লাগাল ঘরের দিকে।

চন্দ্র খাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখ নীচেটা। ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে।'

আমি হেসে বললাম, 'দে ঝাঁপ।'

'আহ্, কী যে বলো না! আর চন্দ্রদা অত ধারে গেছেন কেন, এদিকে আসুন।'

আমার বউ ধমক দিল।

চন্দ্র একগাল হেসে সরে এল, দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে সাদা ঝকঝকে দাঁত।

তিন

'দিস ইজ টু মাচ চন্দ্র, তোরা গেছিস যা, বাচ্চাগুলোকে টেনে নিয়ে গিলি কেন?' ঘরে ঢুকতেই ফুঁসে উঠল ভানু। হঠাৎ এমন একটা আক্রমণে থতমত খেয়ে গেল চন্দ্রশেখর। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'আসলে...মানে এমন সুন্দর...।'

'আরে ধোর, সুন্দরের নিকুচি করেছে। ওদের শরীর খারাপ হলে তুই দেখবি?'

'এভাবে বলছ কেন? আমরা সবাই তো গেছি।' অঞ্জলি বলল।

'তোমাকে ওর হয়ে দালালি করতে হবে না।'

'এসব কী বলছ! ভাষা ঠিক করো।'

'আর ভাষা শিখিও না। বাচ্চাটা অসুস্থ হলে এখানে কোনও ডাক্তার নেই।'

'হঠাৎ পুটুর জন্য তোমার দরদ উথলে উঠছে কেন? বাড়িতে তো মেয়েটার দিকে একবার ফিরেও তাকাও না।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল অঞ্জলি।

'নাহ্ এমনি এমনি হাওয়ায় বড় হচ্ছে তো।'

'আহ্ ভানু চুপ করবি। সাতসকালে...' ধমক লাগাল গৌর।

ভানু হনহন করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

'সারাটা জীবন আমার শেষ করে দিল, একটা ইতর।'

'অঞ্জলি প্লিজ, যা হওয়ার হয়ে গেছে, একটু শান্ত হ' আমার বউ গিয়ে ওঁর কাঁধে হাত রাখল।

'তুই কিছু জানিস না লীনা...!'

'আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ছাড় ওসব।'

অঞ্জলি গিয়ে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পুরো সকালটাই মাটি, আসলে সবাই সানরাইজ দেখতে গেছিলাম। বাচ্চা দুটোও গেছিল, ভানু যায়নি, ঘুম থেকে তোলা যায়নি, ফিরে আসার পরেই এই অ্যাকশন।

সবাই ঘরের মধ্যেই চুপচাপ ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছি। দেবলীনা ইশারা করে আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল, সুড়সুড় করে সবাই বেরিয়ে এলাম। 'ধু-স শালা, পুরো সকালটাই ঝাড়। গৌর বলল, 'মাল নিজে যাবে না আর আমাদের ওপর টেম্পার দেখাচ্ছে।'

চন্দ্র এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার মিনমিন করে বলল, 'বাচ্চা দুটোকে বোধহয় নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি।'

এমনিতেই চন্দ্রর ওপর মাথাটা টং হয়েছিল। আমি খেঁকিয়ে উঠলাম। 'বুঝেছিস যখন এবার চুপ থাক।'

চন্দ্র চুপ করে গেল। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের কাছ থেকে চলে গেল।

গৌর চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, 'চন্দ্রটাকে আনাই ভুল হয়েছে।'

সত্যিই সারাদিন পুরো নষ্ট। অনেক বোঝানোর পরেও অঞ্জলি বিছানা ছেড়ে এক পাও নড়েনি। ভানু একবার আমাদের কথায় বউকে পটাতে গেছিল। ঝাঁঝানি খেয়ে ফিরে এসে বলল, 'ধু-র চলত, নিজেরাই ঘুরব। এত তেল মারা পোষায় না।'

বউগুলোর একটাও কেউ গেল না। ডেফিনিট ইচ্ছে ছিল। স্রেফ কার্টসির জন্য যেতে পারল না। বাচ্চা দুটোও থেকে গেল। আমরা তিনজন এদিক-ওদিক একটু ঘুরলাম। দুপুরের দিকে হোটেলে ফেরার সময় গৌর বলল, 'চন্দ্রটা কোথায়?' তাই তো খেয়ালই হয়নি। গেল কোথায়? আমি বললাম 'আবার রাগু রাগু করে একা ফিরে গেল না তো?'

'গেলে আপদ যাবে। শালার মুখ দেখতে আর ইচ্ছে করছে না।' ভানু গজগজ করল। 'দেখ হয়তো ফিরে দেখব ওদের সঙ্গে গল্প মারাচ্ছে।'

ঠিক তাই। হোটেলে ফিরতেই ছাইচাপা মেজাজটা আবার ভুস করে উঠল। দেবলীনা, চন্দ্র আর লীনা মেঝেতে বসে গল্প করছে। বাচ্চা দুটো চন্দ্রের কোল ঘেঁষে ক্যাচরম্যাচর করছে। অঞ্জলিও আর পাশ ফিরে শুয়ে নেই। বালিশে ঠেস দিয়ে বসা, হয়তো একটু আগে খানিক হেসেও ছিল। আমাদের দেখে গম্ভীর হয়ে উঠলেও ঠোঁটের কোণে একটু আগের হাসির রেশ লেগে রয়েছে।

'ও বাবা জানো মিশরীয়দের আগে কারা মমি বানাতে জানত?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'জানি না।'

লীনা কি ইচ্ছে করেই চন্দ্রর একটু বেশি কাছে বসেছে!

চন্দ্র আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন দিকে ছিলিস তোরা? খুঁজে পেলাম না।'

'তাই না কি, খুঁজতে গেছিলি? কোথায়?'

বাইরে বেরিয়ে এসে ভানু বলল, 'চন্দ্রটা বোকা না ন্যাকা বোঝা যায় না!'

গৌর বলল, 'বাদ দে, কাল লাস্ট দিন। রাত্রে তেড়ে মাল খেতে হবে।'

ভানু মুখ বিকৃতি করে বলল, 'ওটাকেও গেলাতে হবে তো।'

আমি বললাম, 'খাবে না বোধ হয়।'

'ঠিক খাবে। পরের পয়সায় মাল...'

সত্যি কথা বলতে আমরা নিজেরাও ঠিক জানি না চন্দ্রর আসল দোষটা কী? অথচ ওর প্রতি একটা অসহ্য ক্রোধ কিংবা অন্য কিছু সবসময় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। ভানু সেলস ট্যাক্সের সি টি ও। দু-হাতে ঘুষ নেয় আর মাল খায়। গৌর এখন ওর কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার। সঙ্গে সুন্দরী সেক্রেটারি। মাসে দুটো প্লেজার ট্রিপ মারে কাজের নাম করে। ওদের তুলনায় আমার ডানা অনেক ছোট। বাধা ধরা সরকারি মাসমাইনে। তাই জন্য বুকের ভেতর একটু জ্বলন আছে। কিন্তু তবু আমরা তিনজনেই চন্দ্রর থেকে অনেক অনেক এগিয়ে। ওকে আমরা সঙ্গে এনেছি, সেজন্য ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু কেন আমাদের বউ-বাচ্চাগুলো সবসময় ওই ভ্যাগাবন্ডটার সঙ্গে লেপটে রয়েছে? কী জাদুতে? এত অপমান করি, তার জন্য মাঝেমধ্যে খারাপও লাগে, তবু শালা কেন যে এঁটুলির মতো লেগে রয়েছে। ওইরকম চুপ থেকে ও কী...কী অস্বীকার করতে চায়...?

চার

দু-পেগের পরই চন্দ্র বলল, 'আর দিস না।'

'কেন রে, আগে তো গলা পর্যন্ত টানতিস।'

'সহ্য হয় না এখন।'

'কী সহ্য হয় না। মাল, না আমাদের?' গৌর নিজের গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বাঁকা হাসি হেসে বলল।

চন্দ্র হাসল। ওর এই চুপচাপ হাসিটায় কেন যে এত পিত্তি জ্বলে যায়!

ভানু বলল, 'বুঝলি চন্দ্র এভাবে জীবন চলে না। পালটা, এবার নিজেকে পালটা। সারাজীবন পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আর অন্যের বউ-বাচ্চার কাছে হিরো সেজে চলবে না।'

এই রে, ভানুর বোধহয় চড়তে শুরু করেছে। অলরেডি তিনটে বড় পেগ কমপ্লিট। এতক্ষণ হালকাভাবে চন্দ্রকে দিচ্ছিল, এবার সরাসরি বোম ছুঁড়তে শুরু করেছে।

চন্দ্র চুপ থাকল।

'চুপ কেন? বল কিছু।'

'আমি তোদের বিরক্ত করতে চাইনি।'

লীনা চন্দ্রর ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গল্প করছে। ছবিটা হঠাৎ চোখের সামনে আসতেই মাথাটা আমার দপ করে উঠল। গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ কুঁচকে জিগ্যেস করলাম 'তবে কী করতে চেয়েছিলি?'

'আসলে অনেকদিন পর একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার লোভটা ছাড়তে পারিনি।'

গৌর বলল, 'শুধু আমাদের সঙ্গে কেন, আমাদের বউদের সঙ্গেও বল।'

চন্দ্র আলতো হেসে বলল, 'পুটু আর নীল তো দুটো ফুল।'

'হুঁহ্ ফুল!' ভানু ব্যাঁকা হাসল। তারপর টেনে টেনে বলল, 'দেখ চন্দ্র আই অ্যাম ভেরি সরি টু সে, অ্যাকচুয়ালি তুই এখানে এসেছিস স্রেফ অন্য কারণে।...যদিও ইউ হ্যাভ ফেইলড্ টু ডু সো। যতই ক্যারদানি দেখাস আমার বউ আমার মেয়ে আমার...ইয়েস আমার পয়সায় খায় সুতরাং আমার বগলের তলায় থেকেই বাড়ি ফিরবে।'

ভানু ফুল পিক আপে। মাথাটা আমারও ঝিমঝিম করছিল, চোখের সামনে সব কিছু থিরথির করে কাঁপছে। বেশ আরাম লাগছে ভানুর কথায়। এতদিন তিনজনেই ভেতর ভেতর জ্বলে এসেছি। কেউ কারও

কাছে সরাসরি প্রকাশ করতে পারিনি।

'ওভাবে বলিস না ভানু।' চন্দ্রর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

এই তো এবার ব্যাটার ঘা লেগেছে।

গৌর বলল, 'তাহলে কী ভাবে বলবে?...শাল্লাহ তোর আস্পর্দা আসে কোত্থেকে আমাদের ঘেন্না করার। হু আর ইউ?'

'আমি ঘেন্না করি না।'

'তবে কী করিস?...করুণা...অ্যাঁ করুণা!' ভানু চেঁচিয়ে উঠল। 'তোর করুণায় আমি পেচ্ছাপ করি।...শালা বিবেকের পাঠ মারাতে এসেছিস।'

চন্দ্র আর কিছু বলল না। চুপচাপ উঠে চলে গেল।

'যাচ্ছিস কোথায়, শুনে যা...' ভানু গলা নামাল। 'অবশ্য বাইরের লোককে আর কী বলব, নিজের বাড়িতেই সব বেইমান পুষছি।'

গৌর কাঁপা হাতে নিজের গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল, 'বাদ দে, ভুলে যা ওসব।'

'ভুলে যাব মানে! আমরা কোনদিক থেকে কমতি রে!'

লীনা চন্দ্রর আরও কাছে এসে বসেছে...আরও চন্দ্রর গরম নিশ্বাস পড়ছে লীনার ঘাড়ে...গলায়। আমার একটা হেঁচকি উঠল। তারপর হড়হড় করে সব উগরে দিলাম। শরীরটা অবশ হয়ে এল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বুঝে বসে রইলাম। আবার একটা ছবি এল, চন্দ্র নীলের হাত ধরে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।...অসহ্য!

ভানু বলল, 'এ্যাহ্ ঘর ভাসিয়ে দিলি পুরো।'

'সহ্য হয়নি।'

'তো খাস কেন?'

গৌর বিড়বিড় করে বলল, 'তবু চন্দ্র মাইরি...কোথায়, কোথায় যে একটা, ধ্যার...'

'গেল কোথায় মালটা?'

ভানুর কথায় খেয়াল হল, সত্যিই তো গেল কোথায়?

'দেখ হয়তো আমাদের কারও বউয়ের কোলে বসে ক্ষীর খাচ্ছে।

আমার কথায় ভানু দপ করে জ্বলে উঠল। 'শুয়োরের বাচ্চা...চল তো, অনেক সহ্য করেছি।...আজকে...'

কী করে যেন তিনজনেই টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। একতলার ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম একটু দূরে খাদের পাশে চন্দ্র একা দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কাঞ্চনজঙঘা। চাঁদের আলোয় একটা প্রকাণ্ড স্থির মেঘের মতো মনে হচ্ছে। আহ্...গা শিরশির করে উঠল। আমরা তিনজন যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চন্দ্রর পিছনে এসে দাঁড়ালাম। চন্দ্র আমাদের খেয়াল করল না। স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল।

'চন্দ্র'।

ভানুর ডাকে চন্দ্রশেখর পেছন ফিরল। অদ্ভুত শান্ত অসহ্য সেই দৃষ্টি।

'তোর একটা বিচার হওয়ার দরকার।' গৌর টেনে টেনে বলল।

'বেসিক্যালি ইউ আর ওয়ার্থলেস, অথচ...অথচ নিজেকে মহান ভাবিস। সব জাদু করে দিবি। আসলে তোর দ্বারা কিস্যু হওয়ার নয়। তুই পুরোপুরি ফেলিওর অ্যান্ড ভেরি মাচ জেলাস টু...তোকে প্রয়োজন নেই...সো...সো...সো...' আমরা তিনজন অবশভাবে চন্দ্রের দিকে এগোচ্ছিলাম।

চন্দ্র খাদের ধারে দাঁড়িয়ে। হাওয়াতে চন্দ্রর গায়ের শাল সাদা ডানার মতো ঝাপটাচ্ছিল।

'তুই চলে যা' বলে চন্দ্রকে হঠাৎ ধাক্কা দিল ভানু। ধাক্কায় চন্দ্র খাদের আরও কাছে চলে এল। চোখে তবু সেই শান্ত দৃষ্টি। ভেতরটায় মুহূর্তে কেমন করে উঠল। তিনজনেই ওকে ঠেলতে থাকলাম খাদের দিকে।

গৌর চিৎকার করে উঠল। তোকে ফেলে দিচ্ছি...ভয় পা...চন্দ্র ভয় পা...প্লিজ...।'

খাদের একেবারে কিনারে এসে ভানু বলল 'তুই যা।' তিনজনে সজোরে ধাক্কা দিলাম ওকে। নীচে তাকিয়ে দেখলাম খাদে জমে থাকা সাদা থোকা থোকা মেঘের মধ্যে ডানার মতো একা একা উড়তে উড়তে

মিলিয়ে গেল একটু পরে। আবার বমি পাচ্ছিল আমার।

'শেষ...আ...হ্'। হা হা করে হেসে উঠল ভানু। 'হা হা হা' প্রচণ্ড চিৎকার করে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। আমরা সবাই তীব্রভাবে হাসতে চাইছিলাম...।

ঠিক সেই সময় পুটু আর নীল কী যেন বলতে এসে ডাইনিং রুমের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। আর অবাক হয়ে দেখছিল ঘরের ভেতর ওদের বাবা-কাকারা কেউ আধবসা কেউ শুয়ে বমিতে মাখামাখি হয়ে চোখ বন্ধ করে পাগলের মতো হাসছে, কাঁদছে আর সামনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে মিছিমিছি কী যেন ঠেলছে!

শারদীয়া দেশ
২০০৫

জন্ম ১৯৭৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি হুগলির কোন্নগরে। আজও থাকেন সেই মফস্‌সলেই। বাণিজ্যে স্নাতক হওয়ার পর এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন জীবন কেটেছে দীর্ঘকাল। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। দেশ পত্রিকায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে সাড়া পড়েছিল গল্পটি নিয়ে। অনেক গল্প অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হয়েছে বেশ কিছু গল্প।

প্রথম গল্পগ্রন্থ ডানাওলা মানুষ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিল ২০১১ সালে সাহিত্য অকাদেমি যুব পুরস্কার। এরপর ২০১৪ সালে পেয়েছেন বাংলা অকাদেমির সোমেন চন্দ স্মৃতি পুরস্কার। ভালোবাসেন ঘুরে বেড়াতে।

ছবি, নাটক দেখতে।

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের প্রথম উপন্যাস 'মাঝরাস্তায় কয়েকজন'।

প্রচ্ছদ **গৌতম দাশ**

প্রথম সাহিত্য অকাদেমি যুবা পুরস্কারে সম্মানীত

ডানাওলা মানুষ

আনন্দবাজার পত্রিকা

নতুন শতকে নবীন যে কথাকারেরা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে বিনোদ সাহসী, প্রচলিত গদ্যের বাইরে বেরিয়ে এসে বিষয়আঙ্গিককে টেনে নিয়ে যান নতুন নতুন নিরীক্ষায়।...ডানাওলা মানুষ গল্পগ্রন্থটি তার প্রমাণ।

সংবাদ প্রতিদিন

এই বইয়ের গল্পগুলির গদ্য যেমন নির্মেদ ভাবনা তেমনই নির্মম। বিষয় বৈচিত্র্য পাঠককে চমকিত করে।

সাপ্তাহিক বর্তমান

চেনা সমাজের পরিচিত মানুষগুলোর অপরিচিত মুখকে পাঠকের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন লেখক।

সমরেশ মজুমদার

বিনোদের গল্পে বাস্তবের সঙ্গে পরাবাস্তবের এমন চমৎকার মিশ্রণ বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বিনোদ ঘোষাল এই সময়কার একজন শক্তিশালী গল্পকার। ডানাওলা মানুষ-এর গল্পগুলি নিঃসন্দেহে পাঠকদের আকর্ষণ করবে।

জয় গোস্বামী

এই বইয়ের গল্পগুলো পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। লেখকের আগামী সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।